অধ্যাপক ডক্টর ধীরেন্দ্র নাথ নন্দীর
ভূমিকা সম্বলিত

শিশুমনের বিকাশ ও বিকার



ডক্টর অমরেন্দ্র নাথ বসু

শ্রীমতী বন্দনা দাশগুপ্তাকে
প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ।
— অমরেন্দ্রনাথ বসু। ২০/২/৮৫

শিশুমনের বিকাশ ও বিকার

অমরেন্দ্রনাথ বসু

এম. এ., পি-এইচ. ডি.,
ডিপ্. ইন বেসিক এডুকেশন,
ডিপ্. ইন সাইকো-এ্যানালিসিস,
এম. আই. পি. এ., এম. আই. পি. এস.,
মনঃসমীক্ষক।

: ভূমিকা :

অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ নন্দী

এম. এস-সি., পি-এইচ. ডি, এম. বি. বি. এস.,
ডি. পি. এম. (স্কট), এফ. আর. সি. সাইক্ (লণ্ডন),
এফ. আর. সি. পি. (এডিন), এফ. এ. পি. এ. (ইউ. এস. এ.),
ডিপ্. ইন সাইকো-এ্যানালিসিস, এম. আই. পি. এ.,
এম. আই. পি. এস., মনঃসমীক্ষক।
ভূতপূর্ব অধ্যাপক, আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ।
ভূতপূর্ব অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান, মানসিক
রোগ চিকিৎসা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
সভাপতি, ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি।

—: পরিবেশক :—

ভারত স্টেশনার্স

১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—৭০০০৭৩।

শিশুমনের বিকাশ ও বিকার

অমরেন্দ্রনাথ বসু

এম. এ., পি-এইচ. ডি.,
ডিপ্. ইন বেসিক এডুকেশন,
ডিপ্. ইন সাইকো-এ্যানালিসিস,
এম. আই. পি. এ., এম. আই. পি. এস.,
মনঃসমীক্ষক।

ঃ ভূমিকা ঃ

অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ নন্দী

এম. এস-সি., পি-এইচ. ডি, এম. বি. বি. এস.,
ডি. পি. এম. (স্কট), এফ. আর. সি. সাইক্ (লণ্ডন),
এফ. আর. সি. পি. (এডিন), এফ. এ. পি. এ. (ইউ. এস. এ.),
ডিপ্. ইন সাইকো-এ্যানালিসিস, এম. আই. পি. এ.,
এম. আই. পি. এস., মনঃসমীক্ষক।
ভূতপূর্ব অধ্যাপক, আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ।
ভূতপূর্ব অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান, মানসিক রোগ চিকিৎসা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
সভাপতি, ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি।

—ঃ পরিবেশক ঃ—

ভারত স্টেশনার্স

১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—৭০০০৭৩।

SHISHUMANER BIKASH O BIKAR
by Dr. Amarendranath Basu

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ১৯৮৫

প্রকাশক ঃ
শ্রীমতী দীপালি বসু।
১১৫, সেলিমপুর রোড,
কলিকাতা—৭০০০৩১।

প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ
অধ্যাপক মৃণালকান্তি রায়।
গভর্ণমেণ্ট কলেজ অব্ আর্ট এণ্ড ক্র্যাফ্ট্।
কলিকাতা।

মূল্য ঃ কুড়ি টাকা

মুদ্রাকর ঃ
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ,
ঘোষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
৪নং জাষ্টিস মন্মথ মুখার্জী রো,
কলিকাতা—৭০০০০৯

উৎসর্গ

মা ও বাবা
স্বর্গতা সুভাষিণী বসু
ও
স্বর্গত ক্ষিতীশচন্দ্র বসু-র
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

সূচী

ভূমিকা

আজকের শিশু আগামী দিনের নাগরিক। যে শিশুর মুখে এখনও কথা ফোটেনি; অস্ফুট শব্দ, কান্না-হাসি ও হাত-পা নাড়া-চাড়ার মধ্য দিয়েই যে তার মনের সহজ আনন্দ-বেদনার অভিব্যক্তি ঘটায়, সে-ই একদিন নানা জটিল চিন্তাধারার অধিকারী হবে এবং নানা মাধ্যমের সাহায্যে সেগুলির মূর্ত্ত রূপ দেবে। যে শিশু আজ পুতুল বা নানা টুকিটাকি জিনিসকে তার অমূল্য সামগ্রী রূপে আগলে রাখছে ও যত্ন করছে, সে-ই একদিন পরিবারের ও সমাজের সম্পদ ব্যবহারের ও রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। আজ যে-সকল কিশোর-কিশোরীর উদ্দাম জীবন-বেগ পড়াশোনা, খেলা-ধূলা ও নানা স্বতঃস্ফূর্ত কর্মচঞ্চলতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে, তারাই একদিন কলে-কারখানায়, অফিসে-আদালতে, রাজনীতি, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প ইত্যাদি সামাজিক ও সৃজন মূলক ক্ষেত্র সমূহে নিজেদের স্বাক্ষর রাখবে ও মানব সভ্যতার অগ্রগমনে সাহায্য করবে। এই শিশুই আগামী দিনের সম্পদ। আজকের শিশুকে গড়ে তোলার উপরই নির্ভর করছে আগামী দিনের সমাজ চিত্র। বীজের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মহীরুহের সম্ভাবনা।

খুবই সুখের ব্যাপার যে আজকাল প্রায় সকল শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই শিশুদের সম্বন্ধে একটা ভাবনা-চিন্তার উন্মেষ হয়েছে। শিশু-মনের গতিপ্রকৃতি আমরা সকলেই অল্পবিস্তর জানতে চাই, বুঝতে চাই। আর আমাদের সামাজিক লক্ষ্য অনুযায়ী শিশুকে গড়ে তুলতে হলে শিশুকে একান্ত ভাবে বোঝা দরকার—শিশুর ভাবনা-চিন্তা, তার আবেগ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কল্পনা, পরিবেশের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি আমাদের বুঝতে হবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বিজ্ঞানের, বিশেষ করে পদার্থ ও জীবন-বিজ্ঞানের, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুগান্তকারী আবিষ্কার সমূহ যেমন মানুষের জীবন ও চিন্তাধারায় বিপ্লব এনেছে, তেমনি মনোবিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিশু পালন, ও মানসিক রোগ সম্বন্ধে ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রেও প্রাচীন ধ্যান-ধারণা ও সংস্কারের মূলে আঘাত করেছে। তথাপি বলতে হবে যে অপরাপর বিজ্ঞানের তুলনায় মানুষের মনের বিজ্ঞানের অগ্রগতি এখনও যথেষ্ট নয়।—বলা চলে শৈশব পর্য্যায় অতিক্রম করতে পারে নি। তাই বলে আমাদের চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। বর্তমান জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সম্বল করে কাজে নামতে হবে। চলতে গেলেই জ্ঞানের নতুন দিগন্ত আমাদের কাছে উন্মোচিত হবে।

মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ফ্রয়েডের (Freud) আবিষ্কার পদার্থবিদ্যায় আইনস্টাইনের (Einstein) আবিষ্কারের মতই যুগান্তকারী ও বিপ্লবাত্মক। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের দ্বারা আজ একথা সহজে বোধগম্য হয়েছে যে মানুষের জীবনের শৈশব কালই হলো সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ সময়। শৈশব কালের অভিজ্ঞতাই মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের ব্যক্তিত্ব বিকাশের ভিত্তিভূমি।

শিশু-মন হৃদয়ঙ্গমের ব্যাপারে আমাদের প্রথমেই একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।—শিশুরা বড়দের ক্ষুদ্র সংস্করণ নয়, শিশুরা শিশুই। শিশুদের বুঝতে হলে বড়দের ধ্যান-ধারণার নিরিখে তাদের বোঝা যাবে না। জন্ম-মুহূর্ত থেকেই শিশুমন নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে অসংখ্য প্রভাব সংগ্রহ করতে করতে নানা ভাবে নিজেকে পরিপুষ্ট ও বিকশিত করতে থাকে। বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে এই বিকশিত মনই পরিণত মানুষের মনে পরিবর্তিত হয়। তাই পরিণত মানুষের মনের সূত্র দিয়ে শিশুমনের বিচার করতে গেলে আমাদের হিসাবে গরমিল হবেই। ক্ষুদ্র চারা গাছের পরিচর্যা ও পরিণত বৃক্ষের পরিচর্যা এক নয়। এই কারণে

মনোবিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা শিশু-মনোবিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে। যেমন শিশুর শারীরিক রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ চিকিৎসা-ধারার ও শিশু-রোগ বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন, তেমনি শিশু-পরিচর্যার এবং শিশুর মানসিক ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিবিধানের জন্য শিশু-মনোবিজ্ঞান ও শিশু-মনোবিজ্ঞানীর প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এ-ব্যাপারে এখনও যথেষ্ট সচেতনতা দেখা দেয় নি। শিশুর শারীরিক বিকাশের দিকে আমরা যথেষ্ট সচেতন হয়েছি। তার জন্য সুসমঞ্জস খাদ্য, খেলাধূলা প্রভৃতির দিকে প্রচুর নজর দেওয়া হচ্ছে। আজকাল বিদ্যালয়ে শারীর-শিক্ষার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু শিশুর সুষ্ঠু মানসিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গঠন ও পরিচর্যার দিকে আমরা এখনও তেমন গুরুত্ব আরোপ করতে পারিনি। এর অন্যতম কারণ শিশুমন সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা।

মানব-শিশুর ক্রমবিকাশের সাথে অন্যান্য মানুষ্যেতর জীব-শাবকদের একটা খুব বড় রকমের তফাৎ রয়েছে। মানব-শিশুর পক্ষে পরিণত ও স্বাবলম্বী জীবন লাভ করা দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ। অর্থাৎ মানব-শিশুর বড় হয়ে ওঠার জন্য বহু বছর নির্ভর করে থাকতে হয় মাতাপিতা বা অভিভাবকদের উপর। তাই বলা চলে মানুষের শৈশবকাল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ স্থায়ী। ফলে মানব শিশুকে দীর্ঘ দিন ধরে শৈশব ও কৈশোর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিচরণ করে পরিণত জীবনে পৌঁছাতে হয়। এই দীর্ঘ শৈশব জীবনের (কৈশোর জীবন সমেত) অভিজ্ঞতার প্রভাব পরবর্তী জীবনে অপরিসীম। মনোবিজ্ঞানীদের, বিশেষ করে মনঃসমীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের মতে শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচ বা ছয় বৎসরের অভিজ্ঞতাই তার পরবর্তী জীবনের বৈশিষ্ট্যকে নির্ধারণ করে। শিশুমনের ক্রমবিকাশ যেমন একদিকে তার শারীরিক গঠন এবং বয়সের পরিপক্কতার (Maturity) উপর নির্ভর করে, তেমনি অপর

বাদ দিয়ে অপর কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা হয়ে থাকে। যেমন চোষার আচরণের পরিসমাপ্তি দুধের বোতল বা চুষিকাঠির মধ্য দিয়ে ঘটানো হয়। আঁকড়ে থাকার আচরণটিকে বালিশ জড়িয়ে থাকার মধ্যে পরিচালিত করা হয়। আবার হয়ত এমন হতে পারে যে এক একটা প্রবণতার পরিতৃপ্তি এক এক জনের মারফত ঘটেছে। যেমন শিশু তার প্রকৃত (natural) মায়ের বুকের মাই খাচ্ছে; কিন্তু সারা দিনই তাকে আয়ার নজরের মধ্যে থাকতে হচ্ছে (যে সকল মা চাকুরী বা অন্য কাজের জন্য বেশীর ভাগ সময়ই বাড়ীতে অনুপস্থিত থাকেন তাঁদের শিশুর ক্ষেত্রে)। কিন্তু শিশুর বিভিন্ন মানসিক প্রবণতার পরিতৃপ্তির উৎস-বিন্দুকে যতই আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করাই না কেন, তার বেশির ভাগ প্রবণতা সমূহের পরিতৃপ্তি ঘটে মায়ের মধ্য দিয়ে। এই কারণেই শিশুর জীবনে মা কেন্দ্রবিন্দু। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের জন্য মায়ের সাথে মিথস্ক্রিয়ার (interaction) মধ্য দিয়েই সকল প্রবণতা সমূহের পরিতৃপ্তি ঘটা বাঞ্ছনীয়। কেন্দ্র-বিন্দু যতই বিভিন্ন হবে শিশুর ব্যক্তিত্বের সংহতি ততই বিনষ্ট হবে; কেবল মাত্র মাকে কেন্দ্র করে সকল প্রবৃত্তিমূলক আচরণ সমূহের পরিসমাপ্তির মধ্যেই শিশুর ব্যক্তিত্বের সংহতি নির্ভর করে। মায়ের স্থান এদিক থেকে অদ্বিতীয়। এর দ্বারা যেন এরকম মনে না করা হয় যে শিশু অপর কারুর সংস্পর্শে যাবে না। সকলের সাথেই তার যথাযোগ্য সংস্পর্শ থাকবে এবং গড়ে উঠবে। কিন্তু জীবনের কেন্দ্র-বিন্দু থাকবে মা; এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে ধীরে ধীরে মায়ের প্রতি এই কেন্দ্রাভিমুখিতা শিথিল হতে থাকবে। শিশু-পালনের ক্ষেত্রে এরূপ ব্যবস্থাই করতে হবে। তবে এও মনে রাখতে হবে যে তীব্র মাতৃ-কেন্দ্রাভিমুখিতা যদি শিশুর বয়োবৃদ্ধির সাথেও শিথিল না হয়, তাহলে তা পরবর্তী জীবনে মানসিক স্বাস্থ্যে বিপর্যয় ঘটাতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে জন্মের পর শিশুর সাথে

মায়ের নাড়ীর যোগ ছিন্ন হলেও শিশুর কতগুলি প্রবৃত্তিমূলক আচরণ ও মাতৃনির্ভরতার মধ্য দিয়ে উভয়ের মধ্যে একটা মানসিক যোগ গড়ে ওঠে। লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানবশিশু প্রকৃতির কাছ থেকে এ'সকল আচরণগুলি হাতিয়ার হিসাবে পেয়েছে। এভাবে মা ও শিশুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উভয়ের মধ্যে ধীরে ধীরে একটা আবেগ সঞ্চিত হয় এবং একটা মানসিক বন্ধন স্থাপিত হয়। শিশুর তিন-চার বছরের সময় এই যোগ তীব্রতম হয়। এই যোগ শিশুর কিশোর জীবন পর্যন্ত কিছুটা থাকে। তারপর ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে যায়। কিন্তু মাতৃমূর্তির প্রতি আবেগ মানব-মনে সমগ্র জীবন ধরেই প্রবাহিত হতে থাকে। সভ্যতা ধর্ম ও সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে আমরা তা দেখতে পাই। এদিক থেকে মায়ের সাথে শিশুর যোগ অবিচ্ছেদ্য।

(বিঃ দ্রঃ—এই প্রবন্ধে 'মা' বলতে প্রকৃত মা (natural mother), বিকল্প মা (substitute mother) বা মাতৃস্থানীয়া যে কোনো ব্যক্তিকেই বোঝাবে।)

দিকে পারিপার্শিক অবস্থার প্রভাবও তার ক্রমবিকাশশীল মনের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুর জীবন শুরু হয় গৃহে মা-বাবা ও অন্যান্য ঘনিষ্ঠ আপনজনদের নিয়ে। অর্থাৎ একটি শিশুর প্রাথমিক জীবনের পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন এঁরা। ধীরে ধীরে এই পরিবেশের বিস্তৃতি ঘটে। বড় হয়ে ওঠার সাথে সাথে শিশুর জীবন বৃহত্তর সমাজ জীবনে বিস্তৃত হয়। ক্রমে তার খেলার সাথী, প্রতিবেশী, বিদ্যালয়ের সহপাঠী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রভৃতি সকলেই তার পরিবেশের অংশীদার হয়ে ওঠেন। তবে মনে রাখতে হবে শিশুর জীবনে প্রথম থেকেই মায়ের (অথবা মায়ের অবর্তমানে মাতৃস্থানীয়া ব্যক্তির) প্রভাবই সর্বাধিক। প্রথমতঃ মাকে ঘিরেই তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার জীবন গড়ে উঠতে থাকে।—তার ভালবাসা, ক্রোধ, ঘৃণা, ভয়, ঈর্ষা, কল্পনা প্রভৃতি মাকে ঘিরেই আবর্তিত ও নির্দিষ্ট হতে থাকে। ধীরে ধীরে এই কেন্দ্র-বিন্দুতে বাবারও অনুপ্রবেশ ঘটে। একটি শিশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মানসিক গঠন ও স্বাস্থ্য তার এই পরিবেশ, বিশেষ করে তার প্রাথমিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই একদিকে যেমন তার মানসিক সুস্থতা এই পরিবেশের প্রভাবের উপর নির্ভরশীল, তেমনি অপর দিকে এই পরিবেশের দ্বারাই নির্ধারিত হতে পারে তার মানসিক বিকৃতির স্বরূপ—অপরাধ প্রবণতা, অসংযত আচরণ, নানা রকমের মানসিক অস্বভাবিতা। বিভিন্ন স্তরের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে নানা রকমের হানিকর জীবন-ধারার প্রতি আসক্তি ও নেশার সামগ্রীর প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি অনেক কিছুই এই শৈশবের পরিবেশ সঞ্জাত অভিজ্ঞতার দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে।

এখানে শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার (Interaction) আর একটি বিস্ময়কর দিকের প্রতি সকলের অবহিত হওয়া দরকার। শিশুরাই যে কেবল বড়দের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তা নয়। বড়রাও শিশুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। শিশুদের প্রভাবে বড়দের চরিত্রের

বিস্ময়কর পরির্তন হতে দেখা গেছে। ক্রোধী, নিষ্ঠুর ও অপরাধ প্রবণ মানুষ শিশুর প্রভাবে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে শান্ত, ধার্মিক ও সমাজের কল্যাণকারী ব্যক্তিতে পর্যবসিত হয়েছে—এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। স্নেহ-ভালবাসার মধ্য দিয়ে শিশুর সাথে বড়দের সংস্পর্শ বড়দের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে যে অপরিসীম হিতকারী তার প্রমাণ প্রত্যেক মানুষই নিজের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে উপলব্ধি করতে পারবেন। এ-প্রসঙ্গে অস্‌কার ওয়াইল্‌ড্‌-এর (Oscarwild) 'স্বার্থপর দৈত্য' (Selfish Giant) গল্পটি বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসু বর্তমান পুস্তকখানিতে শিশু-জীবনের নানাদিক নিয়ে—শিশু-মানসের মূল ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, শিশুর মানসিক বিকাশের ধারা, তার মানসিক সমস্যাবলী ও তার প্রতিকার ইত্যাদি—আলোচনা করেছেন। প্রতিটি পিতামাতার এবং যাঁরা বিভিন্ন স্থানে শিশুর লালন-পালন ও শিক্ষাদান কার্যে নিযুক্ত রয়েছেন তাঁদের সকলেরই এ-সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার। শিশু-মনের সাধারণ জ্ঞান ও তার সমস্যাবলী সম্বন্ধে ধারণা শিশু-পরিচর্যার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই বিশেষ সহায়ক। এ-বিষয়ে শ্রীবসুর আলোচনা সকল দিক থেকেই উপযোগী হয়েছে। বাংলা ভাষায় এরূপ একখানি পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বর্তমান পুস্তকখানি সে অভাব দূর করবে আশা করি।

শ্রীবসু একজন অভিজ্ঞ মনঃসমীক্ষক ও শিক্ষক। মানসিক রোগ চিকিৎসা ও প্রাক্-প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে পরবর্তী বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাধারা সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই পুস্তকের প্রতিটি প্রবন্ধই তাঁর বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ফল। বাঙালী পাঠক এ-দ্বারা উপকৃত হলে শ্রীবসুর শ্রম সার্থক হবে।

ধীরেন্দ্রনাথ নন্দী

পি-৫৩৫, রাজা বসন্ত রায় রোড,
কলিকাতা—২৯,
২৪শে ~~আগস্ট~~ সেপ্টেম্বর (মহালয়া), ১৯৮৪।

লেখকের নিবেদন

কয়েক বছর আগে, ১৯৭৯ সালে, ইউ. এন. ও-র উদ্যোগে সারা পৃথিবী জুড়ে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ পালিত হলো। আবার বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার এ-বছরের ধ্বনি : শিশুর স্বাস্থ্য—আগামী দিনের সম্পদ (Children's Health : Tomorrow's Wealth) ; উদ্দেশ্য সকল মানুষকে শিশুদের সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত করা। শিশুর সমস্যাকে জানা ও বোঝা মানব সমাজের পক্ষে একটি জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু এই কাজ একটি মাত্র বছরের কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই প্রচেষ্টা আমাদের নিরন্তর চালিয়ে যেতে হবে। আবার শিশুর জীবনের সমস্যাবলীর মধ্যে তার মানসিক সমস্যাবলী বা মানসিক স্বাস্থ্যই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিশুমন আকাশের মতই সীমাহীন। তাই শিশুমনকে বোঝার প্রচেষ্টা একটি সর্বকালের অনুধ্যান।

বর্তমান যন্ত্রশিল্পভিত্তিক ও শহরকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার যুগে জটিল আবর্তে পড়ে মানুষের জীবন আজ সমস্যাকীর্ণ। এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ শিশুদের জীবনেও দেখা দিয়েছে বিচিত্র সমস্যা। ঘরে মা-বাবা এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিশুদের নানা সমস্যা নিয়ে আজ ভাবিত। তাই শিশুমন, তার বিকাশ ও বিকার সম্বন্ধে অবহিত হওয়া এই মুহূর্তের একটি জরুরী কাজ।

শিশুমনকে জানা একদিকে যেমন জরুরী, অপর দিকে তেমনই দুরূহ। তাই শিশুমনের কথা বলার ব্যাপারে আমার যোগ্যতা যথাযথই সন্দেহযোগ্য। কিন্তু প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে অযোগ্যতা সত্ত্বেও এরূপ দুষ্কর কাজে হাত দিয়েছি। সফলতা অবশ্যই পাঠকগণ বিচার করবেন।

এখানে বলে রাখা দরকার, এই পুস্তকের শিরোনামের 'শিশু' শব্দটির ব্যক্তার্থ (denotation) একটু ব্যাপকভাবেই ধরা হয়েছে। তাই এখানে কেবল কোলের শিশুদেরই নয়, বালক-বালিকা এবং কিশোর-কিশোরীদের কথাও বলা হয়েছে।

এই পুস্তকের একটি বিশেষ আকর্ষণ স্বনামধন্য বিশিষ্ট মনোরোগ চিকিৎসক শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ নন্দীর লেখা ভূমিকাটি। এই ভূমিকায় শিশুমন জানার কাজের গুরুত্ব এবং শিশুমনের স্বরূপ অত্যন্ত প্রাঞ্জলতার সাথে ব্যক্ত হয়েছে। এই ভূমিকাটি পুস্তকের মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছে। এছাড়া বর্তমান পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে অধ্যাপক নন্দীর উৎসাহ ও সাহায্য এবং পুস্তকের বিষয় বিন্যাসে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও উপদেশ পেয়ে আমার কাজ সহজ হয়েছে। তাই বলা চলে এই পুস্তক পাঠে পাঠকগণ যদি কিছুমাত্র উপকৃত হন তা অধ্যাপক নন্দীর কার্যাবলীর জন্যই হবেন। তিনি পাণ্ডুলিপির কিছু কিছু অংশ দেখে দিয়েছেন এবং বিষয়বস্তু সংশোধন করে দিয়েছেন। বইটির নামকরণও তিনি করেছেন। তা সত্ত্বেও এরূপ একটি পুস্তকে কিছু কিছু ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। এ'সকল ত্রুটি স্বভাবতঃই আমার অযোগ্যতাজনিত।

এই পুস্তকের অধিকাংশ প্রবন্ধই বিভিন্ন সময় ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতির ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'চিত্ত'-তে প্রকাশিত হয়েছিল। একটি প্রবন্ধ—'শিশু—পরিচর্যার দৃষ্টিভঙ্গী'—মেদিনীপুরের তমলুক থেকে 'পূর্বাদ্রী' নামক পত্রিকায় অন্য নামে প্রকাশিত হয়েছিল। 'শিশুমনের বিকাশধারা', 'শিশুমনের বিকার বা রোগ' এবং 'চিকিৎসা ও প্রতিকার'—শীর্ষক প্রবন্ধ তিনটি বর্তমান পুস্তকের জন্য প্রথম লেখা হয়। 'চিত্ত'-র সম্পাদক ডক্টর তরুণচন্দ্র সিংহ এবং 'পূর্বাদ্রী'-র সম্পাদক শ্রীইন্দু অধিকারী তাঁদের পত্রিকায় প্রকাশিত আমার প্রবন্ধগুলি বর্তমান পুস্তকে পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন।

শিশুর মানসিক সমস্যা বুঝতে গেলে শিশুরোগী সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দরকার। এ কাজ সম্পন্ন হয়েছে বিখ্যাত মনোরোগ চিকিৎসক ডাঃ জি. সি. বড়াল-এর সহায়তায়। তিনি তাঁর 'হারমনিতে (একটি মানসিক রোগের চিকিৎসা কেন্দ্র, কলিকাতা) শিশুরোগী পর্যবেক্ষণ করতে দিয়ে আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছেন।

এই পুস্তক প্রকাশ সম্ভবই হতো না যদি না 'ভারত স্টেসনার্স'-এর শ্রদ্ধেয় শ্রীস্বরাজকান্তি সরকারের সহায়তার হস্ত আমার দিকে প্রসারিত হতো। পুস্তক মুদ্রণ, প্রকাশ এবং আনুষঙ্গিক সকল কাজ তাঁর বিচক্ষণ পরামর্শ, পরিকল্পনা ও কর্মদক্ষতার ফলে সুসম্পন্ন হয়েছে।

পুস্তকের ভাষাগত ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের জন্য শ্রদ্ধাভাজন লেখক শ্রীসুধাময় মুখোপাধ্যায় (বালিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়, কলিকাতা) সমগ্র পাণ্ডুলিপিটি দেখে দিয়েছেন। এরূপ শুষ্ক ও একঘেয়ে কাজ যথেষ্ট ধৈর্য্যসাপেক্ষ। তাঁর এই আন্তরিক সহায়তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

পুস্তকের পাণ্ডুলিপি তৈরী করার কাজ সহজতর হয়েছে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী কল্যাণীয়া শ্রীমতী সোনালীর সহায়তায়। সে তার পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে যথেষ্ট কষ্ট করে একাজ করেছে।

এ-জাতীয় একটি পুস্তক লেখার জন্য কিছু ভাল সহায়ক পুস্তকের প্রয়োজন। সে' সকল জুগিয়ে সাহায্য করেছেন শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা সংস্থার (Bureau of Educational and Psychological Research; বর্তমানে S. C. E. R. T.) গ্রন্থাগারিক ও কর্মী শ্রীশশাঙ্ক বাগচী, শ্রীমতী অনিতা মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী বন্দনা দাশগুপ্তা।

আমার লেখাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের ধারণা ও উৎসাহ প্রথমে আসে আমার ছাত্র কল্যাণীয় শ্রীমান শুভ বসুর কাছ থেকে।

পুস্তকের প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন খ্যাতিমান শিল্পী অধ্যাপক

শ্রীমৃণালকান্তি রায়। তাঁর ব্যস্ত কর্মসূচীর মধ্যে তিনি এ-কাজের জন্য তাঁর অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন। পুস্তকের মনোরম অঙ্গসৌষ্ঠবের মধ্যে তাঁর অবদান প্রতিফলিত হয়েছে।

আমার স্ত্রী শ্রীমতী দীপালিকে এই পুস্তক প্রকাশের জন্য তাঁর নিজস্ব সময় ও স্বার্থ বহুল পরিমাণে ত্যাগ করতে হয়েছে। তাঁর একটি লেখা এই পুস্তকের মূল্যবৃদ্ধি করেছে। সব কিছুর অন্তরালে থেকে তাঁর সহায়তা এই পুস্তক প্রকাশকে সম্ভব করে তুলেছে।

সর্বোপরি এই পুস্তকের বিষয়গত উপাদান জুগিয়েছে বুবুন, কুশল, বাবুন, ডাব্‌লু, তোতন, ঝিংকু, উজল, বিপাশা, বাবুয়া, টিংকু, ঝুমকি, বাবুই এবং আমার বহুসংখ্যক শিশুছাত্র, কিছু অনাথ ও কিছু সমস্যা জর্জরিত শিশু। এদের সংস্পর্শের মধ্য দিয়েই আমি শিশুমনের আঙ্গিনায় কিছুমাত্র বিচরণ করতে সক্ষম হয়েছি।

এই পুস্তকপাঠে পাঠকগণ কিছুমাত্র উপকৃত হলে আমাদের সকলের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম সার্থক হবে।

অমরেন্দ্রনাথ বসু

১১৫, সেলিমপুর রোড,
কলিকাতা-৩১,
৪ঠা অক্টোবর (বিজয়া দশমী), ১৯৮৪।

মা ও শিশু

কথায় বলে 'নাড়ীর টান' ; মায়ের সাথে শিশুর নাড়ীর যোগ। এ যোগ ছিন্ন হবার নয়। সত্যই কি তাই? গর্ভাবস্থায় শিশু মায়ের শরীরের অংশ হিসাবেই থাকে। তাকে বেঁচে থাকার জন্য আলাদা ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হয় না ; মায়ের শ্বাস-প্রশ্বাসই তার শ্বাস-প্রশ্বাস। আলাদা ভাবে আহার করতে হয় না। মায়ের আহারই তার আহার। বেঁচে থাকার জন্য তার কোন প্রচেষ্টা নেই ; মায়ের প্রচেষ্টাই তার প্রচেষ্টা। গর্ভাবস্থায় শিশু এইভাবে মাতৃ-দেহে বসে পরিপুষ্ট হতে থাকে। তাই এই সময় মায়ের শরীরের সুখেই তার সুখ ; মায়ের অসুস্থতা তার আরামের বিঘ্ন।

কিন্তু জন্ম মূহূর্ত থেকেই এ যোগ বিচ্ছিন্ন। এই মুহূর্ত থেকেই সে মাতৃ-শরীর থেকে পৃথক ; শারীরিক একত্বের পরিসমাপ্তি ; নাড়ীর যোগ ছিন্ন। তবুও নিজে নিজে বেঁচে থাকার মত ক্ষমতা শিশুর এই সময়ও কিছুই থাকে না। তাই মায়ের শরীরের থেকে আলাদা হয়ে গেলেও মায়ের উপর নির্ভরশীল তাকে থাকতেই হয়। যে নির্ভরতা শারীরিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, তাকেই উন্নীত করতে হয় মানসিক বন্ধনে। প্রকৃতি শিশু ও মায়ের প্রবণতা ও আচার-আচরণের মধ্যে এমন কতগুলি ব্যবস্থা করে রেখেছে যার মধ্য দিয়ে উভয়ের মধ্যে এই মানসিক বন্ধন এবং শিশুর বেঁচে থাকার সর্তাবলী পরিপূর্ণ হয়। এ সকল প্রবণতা ও আচার-আচরণ একেবারে প্রবৃত্তিগত। মায়ের সাথে শিশুর নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন হওয়ার পর থেকে নতুন বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। কারণ এ বন্ধন ছাড়া শিশু বাঁচতে পারে না। তাই এদিক থেকে যে-সকল প্রবণতা ও আচার-

আচরণ এই বন্ধন প্রতিষ্ঠায় শিশুকে সাহায্য করে সেগুলির একটা উদ্বর্তন মূল্য (Survival value) রয়েছে।

মনুষ্যেতর অনেক প্রাণীর শাবকদের মধ্যে এরকম কতগুলি নির্দিষ্ট আচরণ পরিলক্ষিত হয় যার প্রতিবেদনে মা-প্রাণীটির মধ্যে কতগুলি নির্দ্দিষ্ট আচরণ উদ্দীপিত হয় এবং যার ফলে মা-প্রাণী ও শাবকের মধ্যে বন্ধন দৃঢ়তর হয় ও ফলে শাবকের বেঁচে থাকার সর্ত সমূহ পরিপূর্ণ হতে থাকে। এরকম ঘটনা প্রায় সকলেই দেখেছেন যে বাড়ীর গ্যারেজে বা দালানের আনাচে-কানাচে কয়েক দিনের কুকুর ছানাগুলো কুঁ কুঁ করে যখন আওয়াজ তোলে তখন মা-কুকুর দূরে থাকলে শুনতে পেয়ে দৌড়ে এসে ছানাগুলোকে আগলে ধরে ও মাই খাওয়ার সুযোগ করে দেয়। যাঁরা গ্রামে থেকেছেন তাঁরা পাখীর বাসায়ও অনুরূপ দৃশ্য লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই। এই জাতীয় শব্দ করাকে আমরা কান্না নাম দিয়ে থাকি। এই কান্না মায়ের মনকে আকর্ষণ করে এবং তার মনে একটা বিশেষ ভাবের সৃষ্টি করে যার ফলে সে কতগুলি বিশেষ আচরণ করে থাকে, অর্থাৎ কান্না মায়ের ঐ সকল আচরণের উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। মায়ের কতগুলি নির্দ্দিষ্ট আচরণের ফলে, শাবকের মধ্যে যে অস্বস্তিকর ভাবের উদ্রেক হয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং ফলে কান্নারও পরিসমাপ্তি হয়ে একটা সাম্য অবস্থা ফিরে আসে। এই শাবক ও মায়ের আচরণ একই সূত্রে বাধা। আর এই বন্ধনের মূল উদ্দেশ্য আমরা দেখতে পাই অস্তিত্ব রক্ষা বা উদ্বর্তন। প্রাকৃতিক পরিবেশে যাঁরা বানর ও বানর-শাবককে দেখেছেন তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন যে শাবকটি মা-বানরের বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে থাকে। মা-বানরটিও বাচ্চাটিকে ধরে রাখে। মা-বানরকে জীবন সংগ্রামের তাগিদে গাছ থেকে গাছে খুব দ্রুত ছুটে চলতে হয়। সে অবস্থায় এই ধরে থাকার ও ধরে রাখার সহজাত ক্ষমতাটি ও ইচ্ছাটি চাই। শাবকের দিক থেকে এই আঁকড়ে থাকার প্রবণতার পরিতৃপ্তির অভাবে তার নিরাপত্তাবোধ ক্ষুন্ন হতে পারে। তাই শাবকের এই আচরণ মা-

শিশু-মনের বিকাশ ধারা

মাতৃ-গর্ভে শিশু একটা সমভাবাপন্ন ও সুরক্ষিত অবস্থার মধ্যে বাস করে। সেখানে তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-উষ্ণ, আলো-অন্ধকার, কোমল-কঠিন, সরব-নীরব প্রভৃতি উদ্দীপক সমূহের দ্বারা উত্তেজিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ মাতৃ জঠরের দশ মাস অবস্থান কাল একটা একটানা পরিবর্তনহীন অবস্থা। এ একটা সুরক্ষিত ঘুমের রাজ্য। এখানে বেঁচে থাকার জন্য শিশুকে নিজের থেকে কোনও প্রচেষ্টা করতে হয় না। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে শিশুকে নানা প্রতিকূল অবস্থা ও উদ্দীপনার সম্মুখীন হতে হয়; অথচ এগুলির সাথে মোকাবিলা করার মত তার শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা নেই। এই নতুন অবস্থায় সে উত্তেজিত ও অভিভূত হয়ে পড়ে। তাই মাতৃ-গর্ভ থেকে বিচ্যুত হয়ে বাইরের জগতে আগমন মুহূর্তটি তার কাছে অত্যন্ত বেদনা দায়ক ও পীড়ন (Tension)-মূলক। অতএব জন্ম-মুহূর্ত থেকেই এই বেদনা দায়ক ও পীড়নমূলক অবস্থা থেকে আত্মরক্ষা করার সংগ্রাম শুরু হয়। কিন্তু নবজাত শিশুর নিজস্ব কোনও ক্ষমতা না থাকায় মা তার হয়ে সংগ্রাম করেন, অর্থাৎ তার কষ্ট ও পীড়ন দূর করে তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। মাতৃ-স্নেহই অসহায় শিশুর রক্ষা কবচ।

একটি নবজাত শিশুকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে তার জীবন প্রধানতঃ দু' ভাগে বিভক্ত—জাগরণ ও নিদ্রা। যখন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, উষ্ণ ইত্যাদি উদ্দীপক (Stimulus) সমূহ তাকে উদ্দীপিত করে তখন সে পীড়িত বা উত্তেজিত হয়ে জাগ্রত হয়। আবার এই উদ্দীপনার যখন সন্তোষজনক নিবৃত্তি হয় তখন সে ঘুমিয়ে পড়ে, অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বের পীড়নহীন অবস্থায় ফিরে যায়। ঘুমের

অবস্থায় শিশু চেতনাহীন থাকে, বাইরের জগতের প্রতি তার কোনও বোধ বা চেতনা থাকে না।

অতএব, আমরা দেখতে পাই যে শিশুর জীবন প্রথম অবস্থায় শরীরের বাইরের (যেমন ঠাণ্ডা, গরম, স্পর্শ, শব্দ ইত্যাদি) এবং শরীরের অভ্যন্তরবর্তী (যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি) উদ্দীপনা দ্বারা নিদ্রায় ব্যঘাত সৃষ্টিকারী জাগ্রত জীবন এবং উদ্দীপনা হীন, (সুতরাং চেতনা হীন) নিদ্রাময় জীবনের মধ্যে বিভক্ত বা দোদুল্যমান। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-উষ্ণ ইত্যাদি দ্বারা উদ্দীপিত জাগ্রত জীবনই তাকে বহির্জগতের সাথে যুক্ত করে এবং আকৃষ্ট করে। মা তার অস্বস্তিকর উদ্দীপনা সমূহের নিবৃত্তি ঘটায়, তার জীবনে স্বস্তি আনে, তাই ধীরে ধীরে শিশু মায়ের প্রতি সচেতন হয়, মায়ের প্রতি' আসক্ত হয়। ক্রমে সে বাইরের জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়, বস্তু-জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়। বাইরের বস্তু ও ব্যক্তির সাথে তার সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। একেই বলে বস্তু-সম্পর্ক (Object-relation)। তখন শিশুর কাছে জাগ্রত জীবনের অস্তিত্ব ও আকর্ষণই মুখ্য হয়ে ওঠে। এইভাবে বস্তু-জগতের সাথে সম্পর্কের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে শিশুর অহং (Ego) *-বোধ। —ক্ষুধা-তৃষ্ণা ইত্যাদির বোধ—এই সকল উদ্দীপনার উপশমকারী মাতৃস্তনের বা মায়ের (অথবা মাতৃস্থানীয়া ব্যক্তির) বোধ—এরপর অন্যান্য ব্যক্তি ও বস্তুর বোধ, এইভাবে ধাপে ধাপে শিশুর অহং-বোধ গড়ে ওঠে। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে তার 'আমি' ও 'আমার' বোধের বিস্তৃতি ঘটতে থাকে ; এর সাথে সাথে অহং-বোধেরও বিস্তৃতি

---

* অহং (Ego) : মনঃসমীক্ষা-বিজ্ঞান অনুযায়ী অহং হ'লো মানব মনের সেই অংশের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া যার সাহায্যে মানুষ বাস্তব জগতের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে ও বাস্তবানুগ হয়। এই ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত থাকে তার বিচার-বিবেচনা ও যুক্তি-বুদ্ধি।

মা ও শিশু

কথায় বলে 'নাড়ীর টান' ; মায়ের সাথে শিশুর নাড়ীর যোগ। এ যোগ ছিন্ন হবার নয়। সত্যই কি তাই ? গর্ভাবস্থায় শিশু মায়ের শরীরের অংশ হিসাবেই থাকে। তাকে বেঁচে থাকার জন্য আলাদা ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হয় না ; মায়ের শ্বাস-প্রশ্বাসই তার শ্বাস-প্রশ্বাস। আলাদা ভাবে আহার করতে হয় না। মায়ের আহারই তার আহার। বেঁচে থাকার জন্য তার কোন প্রচেষ্টা নেই ; মায়ের প্রচেষ্টাই তার প্রচেষ্টা। গর্ভাবস্থায় শিশু এইভাবে মাতৃ-দেহে বসে পরিপুষ্ট হতে থাকে। তাই এই সময় মায়ের শরীরের সুখেই তার সুখ ; মায়ের অসুস্থতা তার আরামের বিঘ্ন।

কিন্তু জন্ম মূহূর্ত থেকেই এ যোগ বিচ্ছিন্ন। এই মুহূর্ত থেকেই সে মাতৃ-শরীর থেকে পৃথক ; শারীরিক একত্বের পরিসমাপ্তি ; নাড়ীর যোগ ছিন্ন। তবুও নিজে নিজে বেঁচে থাকার মত ক্ষমতা শিশুর এই সময়ও কিছুই থাকে না। তাই মায়ের শরীরের থেকে আলাদা হয়ে গেলেও মায়ের উপর নির্ভরশীল তাকে থাকতেই হয়। যে নির্ভরতা শারীরিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, তাকেই উন্নীত করতে হয় মানসিক বন্ধনে। প্রকৃতি শিশু ও মায়ের প্রবণতা ও আচার-আচরণের মধ্যে এমন কতগুলি ব্যবস্থা করে রেখেছে যার মধ্য দিয়ে উভয়ের মধ্যে এই মানসিক বন্ধন এবং শিশুর বেঁচে থাকার সর্তাবলী পরিপূর্ণ হয়। এ সকল প্রবণতা ও আচার-আচরণ একেবারে প্রবৃত্তিগত। মায়ের সাথে শিশুর নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন হওয়ার পর থেকে নতুন বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। কারণ এ বন্ধন ছাড়া শিশু বাঁচতে পারে না। তাই এদিক থেকে যে-সকল প্রবণতা ও আচার-

আচরণ এই বন্ধন প্রতিষ্ঠায় শিশুকে সাহায্য করে সেগুলির একটা উদ্‌বর্তন মূল্য (Survival value) রয়েছে।

মনুষ্যেতর অনেক প্রাণীর শাবকদের মধ্যে এরকম কতগুলি নির্দিষ্ট আচরণ পরিলক্ষিত হয় যার প্রতিবেদনে মা-প্রাণীটির মধ্যে কতগুলি নির্দ্দিষ্ট আচরণ উদ্দীপিত হয় এবং যার ফলে মা-প্রাণী ও শাবকের মধ্যে বন্ধন দৃঢ়তর হয় ও ফলে শাবকের বেঁচে থাকার সর্ত সমূহ পরিপূর্ণ হতে থাকে। এরকম ঘটনা প্রায় সকলেই দেখেছেন যে বাড়ীর গ্যারেজে বা দালানের আনাচে-কানাচে কয়েক দিনের কুকুর ছানাগুলো কুঁ কুঁ করে যখন আওয়াজ তোলে তখন মা-কুকুর দূরে থাকলে শুনতে পেয়ে দৌড়ে এসে ছানাগুলোকে আগলে ধরে ও মাই খাওয়ার সুযোগ করে দেয়। যাঁরা গ্রামে থেকেছেন তাঁরা পাখীর বাসায়ও অনুরূপ দৃশ্য লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই। এই জাতীয় শব্দ করাকে আমরা কান্না নাম দিয়ে থাকি। এই কান্না মায়ের মনকে আকর্ষণ করে এবং তার মনে একটা বিশেষ ভাবের সৃষ্টি করে যার ফলে সে কতগুলি বিশেষ আচরণ করে থাকে, অর্থাৎ কান্না মায়ের ঐ সকল আচরণের উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। মায়ের কতগুলি নির্দ্দিষ্ট আচরণের ফলে, শাবকের মধ্যে যে অস্বস্তিকর ভাবের উদ্রেক হয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং ফলে কান্নারও পরিসমাপ্তি হয়ে একটা সাম্য অবস্থা ফিরে আসে। এই শাবক ও মায়ের আচরণ একই সূত্রে বাধা। আর এই বন্ধনের মূল উদ্দেশ্য আমরা দেখতে পাই অস্তিত্ব রক্ষা বা উদ্‌বর্তন। প্রাকৃতিক পরিবেশে যাঁরা বানর ও বানর-শাবককে দেখেছেন তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন যে শাবকটি মা-বানরের বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে থাকে। মা-বানরটিও বাচ্চাটিকে ধরে রাখে। মা-বানরকে জীবন সংগ্রামের তাগিদে গাছ থেকে গাছে খুব দ্রুত ছুটে চলতে হয়। সে অবস্থায় এই ধরে থাকার ও ধরে রাখার সহজাত ক্ষমতাটি ও ইচ্ছাটি চাই। শাবকের দিক থেকে এই আঁকড়ে থাকার প্রবণতার পরিতৃপ্তির অভাবে তার নিরাপত্তাবোধ ক্ষুন্ন হতে পারে। তাই শাবকের এই আচরণ মা-

বানরের মধ্যে কতগুলি নির্দিষ্ট আচরণকে উদ্দীপিত করে। শিম্পাঞ্জি জাতীয় প্রাণীদের শাবকদের মধ্যে এই আঁকড়ে থাকার বৃত্তিটি সমধিক চোখে পড়ে। এমন কি প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌দের মতে এই সকল শ্রেণীর শাবকেরা মায়ের মাই চোষার ক্ষমতা লাভ করার আগেই মায়ের দেহ আঁকড়ে থাকার ক্ষমতাটি লাভ করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন শ্রেণীর শাবকেরা বিভিন্ন ধরণের কতগুলি প্রবৃত্তিমূলক আচরণ ও প্রতিবেদন (instinctive behaviour and response) নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। শাবকদের আচরণের প্রতিবেদনে মা কতগুলি আচরণ করে থাকে, মায়ের আচরণের প্রতিবেদনে শাবকেরা কতগুলি আচরণ করে বা পূর্ব আচরণের পরিসমাপ্তি ঘটায়। যেমন মানব-শিশুর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক সময় পর্যন্ত মায়েব অদর্শনে শিশু কাঁদছে, মা এসে তাকে আদর করল, কোলে তুলে নিল ; তখন তার প্রতিবেদন হিসাবে শিশু কান্না থামিয়ে মুখ দিয়ে নানা রকম খুশির আওয়াজ করতে লাগল। মা তাকে আরো নানা ভাবে আদর করতে লাগল। কাজেই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন প্রাণীর শাবকেরা যে সকল প্রবৃত্তিমূলক আচরণ ও প্রতিবেদন করে থাকে (যার উদ্দেশ্য আমরা দেখতে পাই বেঁচে থাকার পথ সুগম করা), তার প্রতিবেদনে মা-প্রাণীরা কতগুলি আচরণ করে থাকে। এই ভাবে এই সকল আচরণকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে কতগুলি মানস-বৃত্তিও গড়ে উঠতে থাকে। এই ভাবেই মা ও শিশুর বন্ধন দৃঢ় হতে থাকে।

মানব শিশুর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার প্রথম আচরণ কান্না। জন্ম লগ্নে কান্নার মধ্য দিয়েই শুরু হয় তার জীবনস্পন্দন। যে অস্বস্তিবোধ তার কান্না উদ্দীপিত করে, সেই কান্নাই তার ফুসফুস-যন্ত্রের স্পন্দন ঘটায়, তার প্রতি মায়ের (বা মাতৃস্থানীয়ার) দৃষ্টি আকর্ষণ করায়। কাজেই মানব শিশুর ক্ষেত্রে কান্নাকেই মা-শিশু সম্পর্কের প্রথম আচরণ বলতে পারি। শিশু অস্বস্তি বোধ করলে বা যন্ত্রণা বোধ করলে কাঁদে, খিদে বোধ করলে

কাঁদে। মায়ের স্তনের অনুভূতি, তার গায়ের স্পর্শ, গলার স্বর, এমন কি কেবল মাত্র তার উপস্থিতিই শিশুর কান্নার পরিসমাপ্তি ঘটাবার উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। এই কান্নার মধ্য দিয়েই শিশুর অসহায় অবস্থা, তার নির্ভরশীলতা প্রকাশিত হয়। এই কান্না মায়ের মনে কতগুলি ভাবের উদ্রেক করে এবং মাকে কতগুলি আচরণে উদ্দীপিত করে।

এর পরই আসে চোষার (sucking) আচরণ। মায়ের বুকের মাই চোষার মধ্য দিয়ে এর পরিতৃপ্তি। এর মধ্য দিয়ে শিশুর ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, তার সুখানুভূতি হয়। তবে চোষার প্রবণতার পরিতৃপ্তি বোতলের দুধ খাইয়ে, চুষিকাঠি প্রভৃতি দিয়েও ঘটান সম্ভব। কিন্তু মায়ের মাই খাওয়ার মধ্যে যে চোষার পরিতৃপ্তি তা কৃত্রিম উপায়ে ঘটান সম্ভব কিনা তা পরীক্ষা সাপেক্ষ।

তৃতীয়তঃ আমরা দেখতে পাই আঁকড়ে (cling) থাকার প্রবণতা। শরীর তত্ত্ববিদ্‌দের পরীক্ষায় জানা যায় যে জন্মের পর থেকেই মানব শিশুর নিজের হাত দিয়ে কিছু আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা থাকে। শিশু যখন মায়ের কাছে শুয়ে থাকে তখন সে মায়ের কোলের মধ্যে আঁকড়ে থাকতে চায়, মায়ের আঁচল ধরে থাকে। কোনও শিশু অনেকক্ষণ ধরে তার মাকে পাচ্ছে না, তারপর যখন তাকে পায় তখন আর ছাড়তে চায় না, আঁকড়ে ধরে। মা-দের অনেক সময় শিশুকে লক্ষ্য করে বলতে শোনা যায় (বিশেষ করে যখন কাজ-কর্মের তাড়া থাকে), "সব সময় পায় পায় ঘুরছে, গায়ের সঙ্গে এঁটে থাকবে, কোন কাজ করার উপায় নেই।" খুব ছোট্ট শিশু ঘুম ভাঙ্গার পর যখন মাকে দেখতে না পেয়ে কান্না জুড়ে দেয়, তখন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে হাত দু'খানা উপরে তুলে কাঁদছে। আমরা এর অর্থ করে নেই— কোলে উঠতে চায়। মা ছুটে এসে কোলে তুলে নেয়। শিশু আর একটু বড় হলে কোলে ওঠার জন্য আরও স্পষ্ট ভাবে দু'হাত তুলে দেয়। আঁকড়ে থাকার প্রবণতারই পরিণতি এই কোলে ওঠার আচরণ।

বানরের মধ্যে কতগুলি নির্দিষ্ট আচরণকে উদ্দীপিত করে। শিম্পাঞ্জি জাতীয় প্রাণীদের শাবকদের মধ্যে এই আঁকড়ে থাকার বৃত্তিটি সমধিক চোখে পড়ে। এমন কি প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌দের মতে এই সকল শ্রেণীর শাবকেরা মায়ের মাই চোষার ক্ষমতা লাভ করার আগেই মায়ের দেহ আঁকড়ে থাকার ক্ষমতাটি লাভ করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন শ্রেণীর শাবকেরা বিভিন্ন ধরণের কতগুলি প্রবৃত্তিমূলক আচরণ ও প্রতিবেদন (instinctive behaviour and response) নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। শাবকদের আচরণের প্রতিবেদনে মা কতগুলি আচরণ করে থাকে, মায়ের আচরণের প্রতিবেদনে শাবকেরা কতগুলি আচরণ করে বা পূর্ব আচরণের পরিসমাপ্তি ঘটায়। যেমন মানব-শিশুর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক সময় পর্যন্ত মায়েব অদর্শনে শিশু কাঁদছে, মা এসে তাকে আদর করল, কোলে তুলে নিল ; তখন তার প্রতিবেদন হিসাবে শিশু কান্না থামিয়ে মুখ দিয়ে নানা রকম খুশির আওয়াজ করতে লাগল। মা তাকে আরো নানা ভাবে আদর করতে লাগল। কাজেই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন প্রাণীর শাবকেরা যে সকল প্রবৃত্তিমূলক আচরণ ও প্রতিবেদন করে থাকে (যার উদ্দেশ্য আমরা দেখতে পাই বেঁচে থাকার পথ সুগম করা), তার প্রতিবেদনে মা-প্রাণীরা কতগুলি আচরণ করে থাকে। এই ভাবে এই সকল আচরণকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে কতগুলি মানস-বৃত্তিও গড়ে উঠতে থাকে। এই ভাবেই মা ও শিশুর বন্ধন দৃঢ় হতে থাকে।

মানব শিশুর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার প্রথম আচরণ কান্না। জন্ম লগ্নে কান্নার মধ্য দিয়েই শুরু হয় তার জীবনস্পন্দন। যে অস্বস্তিবোধ তার কান্না উদ্দীপিত করে, সেই কান্নাই তার ফুস্‌ফুস্‌-যন্ত্রের স্পন্দন ঘটায়, তার প্রতি মায়ের (বা মাতৃস্থানীয়ার) দৃষ্টি আকর্ষণ করায়। কাজেই মানব শিশুর ক্ষেত্রে কান্নাকেই মা-শিশু সম্পর্কের প্রথম আচরণ বলতে পারি। শিশু অস্বস্তি বোধ করলে বা যন্ত্রণা বোধ করলে কাঁদে, খিদে বোধ করলে

কাঁদে। মায়ের স্তনের অনুভূতি, তার গায়ের স্পর্শ, গলার স্বর, এমন কি কেবল মাত্র তার উপস্থিতিই শিশুর কান্নার পরিসমাপ্তি ঘটাবার উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। এই কান্নার মধ্য দিয়েই শিশুর অসহায় অবস্থা, তার নির্ভরশীলতা প্রকাশিত হয়। এই কান্না মায়ের মনে কতগুলি ভাবের উদ্রেক করে এবং মাকে কতগুলি আচরণে উদ্দীপিত করে।

এর পরই আসে চোষার (sucking) আচরণ। মায়ের বুকের মাই চোষার মধ্য দিয়ে এর পরিতৃপ্তি। এর মধ্য দিয়ে শিশুর ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, তার সুখানুভূতি হয়। তবে চোষার প্রবণতার পরিতৃপ্তি বোতলের দুধ খাইয়ে, চুষিকাঠি প্রভৃতি দিয়েও ঘটান সম্ভব। কিন্তু মায়ের মাই খাওয়ার মধ্যে যে চোষার পরিতৃপ্তি তা কৃত্রিম উপায়ে ঘটান সম্ভব কিনা তা পরীক্ষা সাপেক্ষ।

তৃতীয়তঃ আমরা দেখতে পাই আঁকড়ে (cling) থাকার প্রবণতা। শরীর তত্ত্ববিদ্‌দের পরীক্ষায় জানা যায় যে জন্মের পর থেকেই মানব শিশুর নিজের হাত দিয়ে কিছু আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা থাকে। শিশু যখন মায়ের কাছে শুয়ে থাকে তখন সে মায়ের কোলের মধ্যে আঁকড়ে থাকতে চায়, মায়ের আঁচল ধরে থাকে। কোনও শিশু অনেকক্ষণ ধরে তার মাকে পাচ্ছে না, তারপর যখন তাকে পায় তখন আর ছাড়তে চায় না, আঁকড়ে ধরে। মা-দের অনেক সময় শিশুকে লক্ষ্য করে বলতে শোনা যায় (বিশেষ করে যখন কাজ-কর্মের তাড়া থাকে), "সব সময় পায় পায় ঘুরছে, গায়ের সঙ্গে এঁটে থাকবে, কোন কাজ করার উপায় নেই।" খুব ছোট্ট শিশু ঘুম ভাঙ্গার পর যখন মাকে দেখতে না পেয়ে কান্না জুড়ে দেয়, তখন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে হাত দু'খানা উপরে তুলে কাঁদছে। আমরা এর অর্থ করে নেই— কোলে উঠতে চায়। মা ছুটে এসে কোলে তুলে নেয়। শিশু আর একটু বড় হলে কোলে ওঠার জন্য আরও স্পষ্ট ভাবে দু'হাত তুলে দেয়। আঁকড়ে থাকার প্রবণতারই পরিণতি এই কোলে ওঠার আচরণ।

শিশু যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ক্ষুধার্ত হয়, কোন ব্যথা পায় এবং ভয় পায় তখনই শিশুর মধ্যে এই আঁকড়ে ধরার প্রবণতা প্রবল হয়ে ওঠে। মায়ের কোলে নেওয়ার মধ্য দিয়ে এই প্রবণতার পরিতৃপ্তি ঘটে।

এসকল ছাড়া মানব শিশুর মধ্যে আরও দু'একটি বিশেষ ধরণের প্রবৃত্তিমূলক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়; যেমন শিশুর হাসি, অপরের উপস্থিতি নজর করা ও অপরের নজরের মধ্যে থাকার চেষ্টা করা। এ সকল আচরণগুলির মধ্য দিয়েও মা ও শিশুর বন্ধন দৃঢ় হয়। ছ'সাত সপ্তাহ বয়স থেকেই শিশু মৃদু হাসতে পারে। মাকে আবদ্ধ করে রাখার এমন শক্তিশালী ক্ষমতা আর কী আছে! শিশু খুশিতে মৃদু হাসছে; মাও ঝুঁকে পড়ে তার প্রত্যুত্তর জানাচ্ছে, আদর করছে। উভয়ই উভয়ের প্রতি মুগ্ধ। এমন অবস্থার মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে যে কোনও মায়েরই সুখ। শিশুর এই হাসির বিনিময়ে মা নিজেকে শিশুর ক্রীতদাসীতেও পরিণত করতে রাজী। ঐটুকু শিশুর কী অসীম ক্ষমতা! প্রকৃতি বেঁচে থাকার জন্য শিশুকে কী শক্তিশালী হাতিয়ার দিয়ে পাঠিয়েছে।

তিন-চার মাস বয়স থেকেই শিশু শুয়ে শুয়ে তার আশে-পাশের লোকদের চলাফেরার ও উপস্থিতির প্রতি খুব অল্পক্ষণের জন্য নজর রাখতে আরম্ভ করে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই ক্ষমতা বাড়ে। শিশুর কাছ থেকে সরে গেলে সে বুঝতে পারে। তাকে একা রাখলে বুঝতে পারে। তখনই সে অপর কারুর উপস্থিতি চায়; কারুর নজরের মধ্যে আসতে চায়। শিশু যখন ভয় পায়, অস্বস্তি বোধ করে, ক্ষুধার্ত হয় তখনই সে অপরকে অনুসন্ধান করতে থাকে। অনেক সময় দেখা গেছে যে কেবলমাত্র মায়ের উপস্থিতিই তাকে শান্ত করে। এমন কি যদি সে মাকে দেখতে নাও পায়, কিন্তু তার কথা শুনতে পাচ্ছে, গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, তাহলেই শিশু পরিতৃপ্ত হয়। শিশুর মায়ের নজরে থাকার এই প্রবণতার কতটা পরিতৃপ্তি ঘটল বা না ঘটল, তার সাথে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে মানসিক উদ্বেগ বোধ

করা বা না করার কিছু যোগ থাকতে পারে বলে অনেক মনোবিজ্ঞানী অনুমান করে থাকেন। নজর পাওয়ার এই ইচ্ছা চরিতার্থ না হওয়ার প্রতিক্রিয়া মানসিক অসুস্থতার মধ্য দিয়ে দেখা দিতে পারে।

উপরে শিশুর যে সকল প্রবণতা ও প্রবৃত্তিমূলক আচরণের কথা উল্লেখ করা হ'লো, সেগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তার প্রত্যেকটিই শিশুর জীবনে কোনও না কোনও সময়ে শুরু হচ্ছে, আস্তে আস্তে তীব্রতর হচ্ছে, আবার বয়স বাড়ার সাথে সাথে সেগুলির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। মা ও শিশুর পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগুলি পরিতৃপ্তি ও পরিসমাপ্তির পথে এগিয়ে যেতে থাকে। এভাবে এগুলির উদ্বর্তনের প্রয়োজনীতাও কমে যেতে থাকে। কিন্তু যথা সময়ে মা বা মাতৃস্থানীয়া কারুর মধ্য দিয়ে যদি এগুলির পরিতৃপ্তি ও পরিসমাপ্তি না ঘটে তা'হলে শিশুর মানসিকতায় নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, যার ফলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যে হানি ঘটা কিছু অসম্ভব নয়। শিশু প্রকৃতিদত্ত এই হাতিয়ারগুলি তার প্রয়োজনের তাগিদে অর্থাৎ উদ্বর্তনের তাগিদে ব্যবহার করে। কিন্তু তাই বলে উদ্বর্তনের প্রয়োজনের শেষে এ'সকল হাতিয়ারের অর্থাৎ প্রবণতা ও আচরণ সমূহের অবলুপ্তি ঘটে না। বয়স্কদের মধ্যেও এ'গুলি যেন কোষ-বদ্ধ অবস্থায় বা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। প্রিয়জনের বিচ্ছেদ ব্যথায় আমরা কি কাঁদি না? দারুণ শোকে বিহ্বল হয়ে আমরা কি পরস্পর পরস্পরকে আঁকড়ে ধরি না? নিদারুণ একাকীত্ববোধের মধ্যে আমরা কি চাই না যে প্রিয়জন ও বন্ধুজন আমাদের ঘিরে থাকুক? আবার আলিঙ্গনাবদ্ধ প্রেমিক-যুগলের আচরণের মধ্যেও এই সুপ্ত আচরণগুলির প্রকাশ সুখানুভূতিকে সার্থকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

শিশুর জীবনে এই সকল প্রবৃত্তিমূলক আচরণসমূহ প্রধানতঃ যাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সে. হ'লো মা অথবা মাতৃস্থানীয়া কোন ব্যক্তি। কিন্তু অনেক সময় আমরা দেখতে পাই যে এ'সকল আচরণসমূহ মাকে

মায়ের ভালবাসা অনুভব করে। মায়ের দুধ ছোট শিশুর কাছে সমগ্র মাতৃসত্তার সমতুল্য। কাজেই বুকের দুধ ছাড়ান তার কাছে হয়ে দাঁড়ায় মাকে ছাড়ান ; তার মনে হয় যেন তাকে মাকেই ছেড়ে দিতে হচ্ছে। সে যেন মায়ের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে। এই ভাবে দুধ ছাড়ানোর সময় শিশু প্রত্যাখ্যানের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে।

১৯। শিশুরা অনেক সময় মল-মূত্র ত্যাগ সম্বন্ধেও ভীত হয়ে পড়ে। মল-মূত্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, নিয়মিত মল ত্যাগ হচ্ছে না, বেশি খেলে পেটের অসুখ করতে পারে—এই সকল ভাবনা শিশুকে অনেক সময় ভাবিয়ে তোলে। এই জাতীয় ভয় সকল, প্রধানতঃ মল-মূত্র ত্যাগ সম্বন্ধে, মা-বাবার উদ্বেগ থেকেই শিশুর মনে সঞ্চারিত হয়।

২০। নিজের ভাবমূর্তি হারাবার ভয়। প্রত্যেক শিশুর নিজের সম্বন্ধে কতগুলি ধারণা থাকে, তার নিজের ক্ষমতা, নিজের গুণ, নিজের রূপ ইত্যাদি সম্বন্ধে। এই ধারণাগুলি বাড়ীর পরিবেশ থেকে শিশুর মনে গড়ে ওঠে। কিন্তু এই ধারণাগুলি যদি বাস্তবসম্মত না হয় তাহলে শিশু যখন বাস্তবের সংস্পর্শে আসে তখন তার নিজের সম্বন্ধে নিজের ধারণা আঘাত পায়। এই আঘাত সে সহ্য করতে পারে না। ফলে পূর্ব থেকেই সে আঘাতের ভয়ে ভীত হয়। এই কারণেই অনেক শিশু বিদ্যালয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে, পরীক্ষার সম্মুখীন হতে ভয় পায়—পাছে তার নিজের সম্বন্ধে নিজের ধারণা ধুলিসাৎ হয়ে যায়, অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হলে মা-বাবার কাছে বা অপরের কাছে তার মূল্য কমে যায়। আসলে মা-বাবা ও নিকট পরিবেশের লোক-জনের কথাবার্তা ও আলোচনার মধ্য দিয়ে এরা নিজের সম্বন্ধে এমন অবাস্তব ধারণার সৌধ গড়ে তোলে যে প্রতি মুহূর্তেই বাস্তবের সংঘাতে সেই সৌধ ভেঙ্গে যাওয়ার ভয়ে ভীত হয়ে থাকে।

অনেক সময় দেখা গেছে যে শিশুরা এমন অনেক জিনিস বা ব্যক্তিকে ভয় পায় যেগুলি অন্য ভীতিপ্রদ কিছুর সাথে সম্বন্ধিত বা যুক্ত ছিল বলেই তা শিশুর মনে ভয়ের সঞ্চার করে। একটি

শিশু বেড়ালকে ভয় পায়। তারপর দেখা গেল বেড়ালের লোম এবং গোঁফের মত কিছু তাকে দেখালেই সে ভয় পায়। যেমন সে তুলো দেখলে ভয় পায়। একটি শিশু মেঘ দেখলে কোনদিন ভয় পেত না। কিন্তু একদিন মেঘ করে ঝড়-বৃষ্টি হল এবং তার সাথে সজোরে বাজ পড়ার শব্দে সে ভয় পেল। তারপর থেকে সে মেঘ করতে দেখলেই ভয় পেত।

২২। শিশু বড় হওয়ার সাথে সাথে নানা দিকে তার কর্ম ক্ষমতা বাড়ে। তার কোন কাজ ও খেলাধূলা মা-বাবা ও বড়দের (বিদ্যালয়ে শিক্ষকের) পছন্দমাফিক হয় না। কিন্তু সেগুলির প্রতি প্রবণতা একদিনেই চলে যায় না। তাই শিশু এ'সকল কাজ বা খেলাধূলা করে ও মা বাবার কাছ থেকে শাস্তি পাবার অথবা তাদের স্নেহ-ভালবাসা হারাবার ভয় পায়। এই ভাবে শিশু ধীরে ধীরে মা-বাবা এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে ভয় পেতে শেখে।

২৩। উঁচু জায়গা থেকে পড়ে যাওয়ার ভয়। অবলম্বনের (support) অভাববোধ করলে খুব ছোট শিশুরাও ভয় পায়। অনেক মনোবিজ্ঞানীর মতে এটি একটি শিশুর মৌলিক ভয়। অনেক শিশুকে উঁচু জায়গায় দাঁড় করালে বা বসালে ভয় পায়।

যে সকল পরিস্থিতিতে শিশুদের মনে ভয়ের উদ্রেক হয় তা সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে আলোচনা করা হলো। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে সকল শিশুই এই সকল পরিস্থিতিতে ভয় পাবে, এমন কোন কথা নেই। বিভিন্ন শিশু বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভয় পায়। কে কোন্ পরিস্থিতিতে ভয় পাবে তা বহুলাংশেই নির্ভর করে সে কিভাবে লালিত-পালিত হচ্ছে, কোন্ পরিবেশের মধ্যে সে বড় হচ্ছে, তার মানসিক বিকাশ কি ভাবে হচ্ছে, ইত্যাদির উপর। তবে মৌলিক ভয়গুলি সব শিশুর মধ্যে কিছু কিছু থাকবেই এবং থাকাটাই স্বাভাবিক। শিশুর মনে কোন কিছু সম্বন্ধে ভয় দেখা দিলেই তাকে অযৌক্তিক এবং অস্বাভাবিক মনে করার কোন কারণ নেই। এ ব্যাপারে বয়স্কদের

ঘটে। প্রথমে থাকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-উষ্ণ ইত্যাদির সচেতনতা, তারপর নিজের দেহের, এবং তারপর মা প্রভৃতি বাইরের ব্যক্তি ও বস্তুর সচেতনতা দেখা দেয়। এইভাবে অহং-এর বিস্তৃতি ও বহির্জগতের বা বাস্তব জগতের বোধের বিস্তৃতি পাশাপাশি ঘটতে থাকে। এই অহং-এর শুরু নিজের শরীরের বোধ থেকে এবং এর পরিণতি বাইরের জগতের ব্যাপক বস্তু ও ভাব সমূহের সাথে একাত্মানুভূতির (Identification) মধ্যে। শিশুর ক্ষুদ্র অহংই যথাযথভাবে পরিণত হলে দেশ ও কালকে অতিক্রম করে একটি সর্বব্যাপী রূপ পরিগ্রহ করে।

নবজাত শিশুর বহির্বস্তু-সম্পর্কহীন শরীর-অনুভূতি-সর্বস্ব বোধকে আমরা আত্মপ্রেমের (Narcissism) অবস্থা বলতে পারি। এই সময় বাইরের জগতের সাথে তার নিজের পার্থক্যের বা পৃথক অস্তিত্বের বোধ না থাকায় তার মধ্যে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও সর্বশক্তি-মানতার বোধ থাকা স্বাভাবিক। শিশু বড় হওয়ার সাথে সাথে তার শরীরের বিচলন ক্রিয়া (Motor activity) সমূহের (যেমন নড়াচড়া, হাটা ইত্যাদি) এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয়স্থান (Sense organ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, জিহ্বা) সমূহের বিকাশ ঘটায় সে বহির্জগতের পৃথক অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে বহির্জগতের উপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তারের মধ্য দিয়ে নিজের শরীর-মনের অভাব সমূহের নিবৃত্তি ঘটাবার ক্ষমতা আয়ত্ব করতে থাকে।

প্রাণী-জগতে একমাত্র মানব শিশুকেই বেঁচে থাকার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক দিন ধরে অপরের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়। অর্থাৎ মানব শিশুর অসহায়তা বা শৈশবকাল দীর্ঘতম। এই সময় বাইরের এবং নিজের দেহের অভ্যন্তরবর্তী উদ্দীপনা সমূহের উপর তার কোনও নিয়ন্ত্রণ না থাকায় শিশু অত্যন্ত অসহায় বোধ করে এবং গভীর পীড়ন (Tension) অনুভব করে। কাজেই মানব শিশু প্রথম অবস্থায় থাকে উদ্বেগাকুল। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে তার

ক্রিয়াজ (Motor) এবং ইন্দ্রিয় ক্ষমতার, বিশেষ করে কথা বলার ক্ষমতার, বিকাশের ফলে বাস্তব বোধের পরিবৃদ্ধি ঘটে ও তার সহজাত উদ্বেগ নিয়ন্ত্রণে আসে। তাই হাটতে পারা ও কথা বলতে পারা শিশুর মানসিক বিকাশের পথে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কথা বলার মধ্য দিয়ে তার চিন্তা ও কল্পনা শক্তির বিকাশ ঘটে, ফলে বস্তু-জগতের সাথে তার সম্পর্ক দৃঢ়তর ও নতুনতর হয়।

শিশু বিভিন্ন উদ্দীপনার দ্বারা উত্তেজিত হয় এবং এই উত্তেজনা প্রশমনের জন্য তার মধ্যে নানা ক্রিয়ার তাগিদ (Impulse to action) ওঠে। যেমন ক্ষুধা পেলে মাতৃ-স্তনের অনুসন্ধান করে বা আঙ্গুল চোষে। অভ্যন্তরবর্তী উদ্দীপনা সমূহই প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন তাগিদের কারণ। বিশেষ বিশেষ শারীরিক অবস্থায় শিশুমনে বিভিন্ন তাগিদের (Impulse) আবির্ভাব ঘটে। এই তাগিদগুলিকেই প্রবৃত্তি (Instinct) বলা চলে। প্রবৃত্তি শিশুর শরীর-মনের যৌথ উৎপাদন। প্রবৃত্তি শরীর ও মনের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করে।

প্রবৃত্তির আবির্ভাবের সাথেই যুক্ত রয়েছে তার প্রশমনের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তির নিরসন প্রক্রিয়া। এই নিরসন নির্ভর করে, বিভিন্ন ধরণের প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন নির্দিষ্ট শারীরিক প্রক্রিয়ার উপর। যেমন ক্ষুধার প্রবৃত্তির অবসান হয় খাওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। প্রবৃত্তির নিরসনে পীড়নের (Tension) অবসান ও আরামের আবির্ভাব। যেহেতু প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে ক্রিয়া-উৎপাদিকা শক্তি রয়েছে, তাই এগুলিকে এক কথায় মানস-শক্তি বলা চলে। আবার এই মানসশক্তির বহিঃপ্রকাশে শরীর-মনে আরাম বোধ হয়, অর্থাৎ এই আরামের সাথে সুখ বোধ রয়েছে (ব্যাপক অর্থে যৌন সুখ), তাই এই মানস-শক্তিকে ব্যাপক অর্থে মনঃসমীক্ষার ভাষায় লিবিডো (Libido) বা কাম-শক্তি বলা হয়। এই কাম-শক্তির প্রকাশ শিশুর জীবনে এক এক সময় এক এক ভাবে হয়ে থাকে। কাম-শক্তিই শিশুর জীবনে পরম

চালিকা-শক্তি। এই চালিকা-শক্তিই শিশুর অহংকে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করিয়ে পরিণতির (Maturity) দিকে নিয়ে যায়। বিশেষভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে এই কাম-শক্তি সর্বব্যাপক। মনঃসমীক্ষার এই কাম-শক্তির ধারণা যেন ভারতীয় দর্শনের একটি ভাবধারার বৈজ্ঞানিক প্রতিধ্বনি। বৈষ্ণব দর্শনে দেখতে পাই :

"আনন্দ-চিন্ময়-রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলিতন্ স্মরতাম্ উপেত্য।
লীলায়িতেন ভুবণানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দম্ আদিপুরুষং তম্ অহং ভজামি॥"

অর্থাৎ, আনন্দ, চিৎ ও রসের আত্মা-স্বরূপ বলিয়া যিনি 'স্মরতা' অর্থাৎ কামভাব আশ্রয়-পূর্বক সমস্ত প্রাণিগণের চিত্তে আপনাকে প্রতিফলিত করিয়া, আপনার এই লীলা দ্বারা অজস্র-ভাবে সমগ্র ভুবনসমূহে বিজয়ী হইয়া আছেন, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" (অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কৃত অনুবাদ ; 'পশ্চিমের যাত্রী' পুস্তকের অন্তর্গত।)

শিশুর জীবনে এই কাম-শক্তির প্রথম বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় তার মুখের সুখের মধ্যে। শিশু ক্ষুধা অনুভব করে ; ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় মাতৃ-স্তন্য পানের মধ্য দিয়ে। স্তন্য-পানের সাথে যুক্ত রয়েছে স্তন চোষার ক্রিয়া। সমস্ত ব্যাপারটিই শিশুর কাছে সুখকর। কাজেই বহির্বস্তুর সাথে শিশুর প্রথম পরিচয় মুখের সুখের অনুভূতির মধ্য দিয়ে। এই অনুভূতিকে আশ্রয় করেই শিশুর প্রাথমিক অহং-এর যাত্রা শুরু হয়। অতএব বহির্জগতের সাথে এই প্রাথমিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ শিশুর মাতৃ-স্তন্য পান এবং মুখের সুখ আহরণের ব্যাপারে যদি কিছুমাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে তাহলে তা যে পরবর্তী জীবনে প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। শিশুর আঙ্গুল চোষাও মুখের সুখ লাভের একটি উপায়। পর্যবেক্ষণ

করলে দেখা যাবে যে প্রায় ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই শিশুর মধ্যে আঙ্গুল চোষার প্রবৃত্তি দেখা যায়। এটি একটি প্রতিবর্ত (Reflex) মূলক ক্রিয়া হিসাবেই শিশুর মধ্যে দেখা দেয় এবং এতে শিশুর মুখ-গহ্বরের আরাম (Oral pleasure) বোধ জড়িত আছে। মাতৃ-স্তন বা বোতল চোষায়ও শিশুর অনুরূপ আরামবোধ আছে। এই কারণেই শিশুর মাতৃ-স্তন বা বোতল ছাড়ানোর কাজটি খুব সন্তর্পণে করতে হবে। শিশুর মানসিক বিকাশ ধারার এই প্রথম পর্যায়কে বক্ত্রীয় কামের (Oral Libido) স্তর বলা হয়ে থাকে। শিশুর জীবনের প্রথম বছরেই এটি চরম পরিণতি লাভ করে।

শিশুর সুখ-বোধ বা কাম-শক্তি বিকাশের দ্বিতীয় স্তরে দেখা যায় তার পায়ু-স্থানই (Anus) সুখের মুখ্য কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে। মল-মূত্র ত্যাগের মধ্যে শিশুর শরীর-মনের একটা বিশেষ আরাম বোধ হয়। মল-মূত্র ত্যাগের, বিশেষ করে মল ত্যাগের, বেগ অনুভূত হলেই শিশু একটা পীড়ন (Tension) অনুভব করে। মল-মূত্র ত্যাগের মধ্য দিয়ে এই পীড়নের অবসান হয়। তখন আসে আরাম বোধ। আবার মলমূত্র ত্যাগ ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতার মধ্য দিয়ে শিশু তার মা বা মাতৃস্থানীয়া ব্যক্তিদের সাথে একটা যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ পায়; শিশু মল বা মূত্র ত্যাগ করলেই মা এগিয়ে আসে, তাকে পরিষ্কার করে দেয়। মা তাকে মল-মূত্র ত্যাগে নিয়ন্ত্রণ শেখায়—কখন কোথায় পায়খানা বা প্রস্রাব করতে হবে। এই ভাবে এই সকল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিশু মাকে কাছে পায়, মায়ের সাথে তার যোগাযোগ হয়। তাই বস্তু-জগতের সাথে যোগাযোগের রকম বা দৃষ্টিভঙ্গীর উপর এই পায়ু স্থানীয় সুখের বা অ-সুখের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। শিশুর জীবনের এই পর্যায়কে পায়ু সুখের পর্যায় (Phase of Anal pleasure) বলা হয়। কাজেই মল-মূত্র ত্যাগে ব্যাঘাত ও তার প্রতি

মা বাবার দৃষ্টিভঙ্গী শিশুর মনোভাব ও ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার ব্যাপারে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। মোটামুটি ভাবে শিশুর জীবনের দ্বিতীয় বছরেই এই পর্যায়ের কার্যকারিতা পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করে।

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। বক্ত্রীয় স্তরে কেবলমাত্র মুখের সুখ এবং পায়ু-স্তরে কেবলমাত্র পায়ু-সুখ বর্তমান থাকে, তা নয়। একটি স্তরে অপর স্তরের সুখানুভূতিরও (বা তার অভাব) উপভোগ বা অনুভব হবে এটাই স্বাভাবিক। প্রত্যেক স্তরেই শরীরের অন্যান্য ইন্দ্রিয়জাত এবং অঙ্গ-সঞ্চালনজাত অনুভূতির স্বাচ্ছন্দ্য-অস্বাচ্ছন্দ্যের বোধও থাকবে।—যেমন স্পর্শানুভূতির বোধ, শ্বাস-প্রশ্বাসের বোধ ইত্যাদি। আসলে প্রতিটি স্তরই অপর স্তরের সাথে, পূর্ববর্তী বা পরবর্তী, মিলে-মিশে থাকে। যে সময় যে স্তরের অনুভূতির প্রবলতা সর্বাপেক্ষা অধিক থাকে, সেই অনুযায়ী এই স্তরভেদগুলি করা হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট সীমা-রেখা দিয়ে একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা যায় না। কেবলমাত্র আধিক্য অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে।

এরপর শিশুর সুখবোধ নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উপস্থমণ্ডলে বা জননেন্দ্রিয় স্থানে (Genital zone) কেন্দ্রীভূত হয়। প্রায় তিন বছর বয়সের শিশুদের পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে ছেলে শিশুরা তাদের শিশ্ন (Penis) এবং মেয়ে শিশুরা তাদের ভগাঙ্কুর (Clitoris) স্পর্শ বা নাড়াচাড়া করতে ভালবাসে। এর ফলে তারা যে কিছুটা যৌন উত্তেজনা অনুভর করে, তাও পর্যবেক্ষণ করা গেছে। তাই এই ক্রিয়ার মধ্যে তীব্র সুখবোধ বর্তমান। অতএব একে শৈশবের হস্তমৈথুন (Masturbation) বলা যেতে পারে। অবশ্যই শিশুর এই সকল যৌন আচরণ বয়স্কদের যৌন আচরণ থেকে পরিমাণগত এবং উদ্দেশ্যের দিক থেকে পৃথক। কিন্তু শিশুর এই আচরণই বয়স্ক যৌন আচরণের পূর্বগামী। শিশুর এরূপ আচরণের মধ্যে

কিছুমাত্র অস্বাভাবিকতা নেই। শিশুমনের পরিণতির জন্য এও একটি প্রয়োজনীয় পর্যায়। মানস-শক্তির বা কাম-শক্তির বিকাশের এই স্তরকে শৈশ্নিক দশা (Phallic phase) বলা হয়। এই স্তরের যথাযথ বিকাশে বাধা পড়লে শিশুর মনে নানা রকমের উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। এই স্তরের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তার অহং বস্তু-জগতের সাথে নতুন ভাবে সম্পর্ক বিন্যাস করতে আরম্ভ করে। জন্মের পর থেকেই শিশুর মধ্যে অন্যান্য সুখ-বোধের মত এরও উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে, যদিও তা খুব সুপ্ত অবস্থায় থাকে। শিশুর তিন বছর বয়স থেকে এই শৈশ্নিক দশার সূত্রপাত হলেও এই বোধ পূর্ণতা লাভ করে কৈশোরে। সেইজন্য কৈশোর কাল পর্যন্তই শিশুর কাম-শক্তির বা মানস-শক্তির বিকাশের কাল বলা যেতে পারে। তবে দেখা গেছে মোটামুটিভাবে পাঁচ-ছয় বছর বয়সের মধ্যেই মানব-শিশুর মানস-শক্তি বিকাশ ধারার সকল স্তরের মধ্য দিয়েই একবার পরিক্রমা করে আসে। এবং এই পরিক্রমার শেষে অর্থাৎ পাঁচ-ছয় বছর বয়স অতিবাহিত হওয়ার পর এই বিকাশ ধারা যেন একটা স্থিতাবস্থা লাভ করে। তারপর কৈশোর কালের আবির্ভাবের সাথে সাথে তা আবার অধিকতর প্রবল ভাবে ও তীব্র গতিবেগ সহ শিশুর জীবনে আবির্ভূত হয় এবং যথাযথ পরিপূর্ণতা লাভ করে।

শিশুর কাম-শক্তির বিকাশের এই প্রধান তিনটি পর্যায়ের সাথে সাথে তার শব্দ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ও দর্শন শক্তিরও অভিব্যক্তি ঘটতে থাকে। এই সকল ইন্দ্রিয়-স্থানের কার্যকারিতার মধ্য দিয়ে সে বস্তু-জগতের সাথে যুক্ত হয়। কাম-শক্তি বিকাশের কাজে এগুলিও সহায়করূপে কাজ করে। কিন্তু মূলতঃ উপরে বর্ণিত তিনটি পর্যায়ের যথোচিত বিকাশের দ্বারাই নির্ধারিত হয় বিভিন্ন ইন্দ্রিয়স্থানগুলির যথোচিত কার্যকারিতা। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-স্থানগুলির মধ্য দিয়ে বহির্জগৎ

শিশুর কাছে কিভাবে প্রতিভাত হবে, বহির্জগতের প্রতি শিশুর দৃষ্টিভঙ্গী কিরূপ গড়ে উঠবে, তা নির্দিষ্ট হয় এই তিনটি পর্যায়ের অভিজ্ঞতার স্বরূপ দ্বারা। যে শিশু তার বক্ত্রীয় দশায় যথোচিত সুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে তার বয়স্ক জীবনে বিভিন্ন ভোগ্য বস্তুর সাথে যথাযথ ভাবে নিজেকে যুক্ত করতে সক্ষম হয় না। শৈশ্নিক দশার ত্রুটি-বিচ্যুতি তার বয়স্ক জীবনের ব্যক্তি-সম্পর্ককে (অর্থাৎ অপর লোকের সাথে সম্পর্ককে) অনুরূপভাবে প্রভাবিত করবে। মূলত এই তিনটি দশার উপর নির্ভর করেই গড়ে ওঠে শিশুর শব্দ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, স্বাদ ও দর্শনের জগৎ। শিশুর, তথা পরিণত মানুষের মানসিক সুস্থতার স্বরূপ তার কাম-শক্তির বিকাশ ধারার বিভিন্ন পর্যায়ের যথোপযুক্ত ও নির্বিঘ্ন গতিশীলতার ধরনের ওপর গভীর ভাবে নির্ভরশীল। আবার এই বিকাশ ধারার বিভিন্ন দশাগুলির অতিরিক্ত চরিতার্থতা যেমন ক্ষতিকারক, তেমনি এগুলির কৃতার্থতায় অকিঞ্চিৎকরতাও মানব জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।

শিশুর বস্তু-সম্পর্কের প্রথম বস্তু হ'লো তার মা (মায়ের অবর্তমানে মাতৃস্থানীয়া)। তারপরে আসে বাবা, ভাই-বোন ইত্যাদি। তার জীবনের তৃতীয় বছর (মোটামুটিভাবে) অতিক্রমকালে দেখা যায় যে পুরুষ শিশু মায়ের প্রতিই অধিক আসক্ত থাকে এবং মেয়ে শিশুর আসক্তি ধীরে ধীরে স্থানান্তরিত হয় বাবার প্রতি। এইভবে পরিবারের মধ্যে মা, বাবা ও শিশু—এই তিনে মিলে বস্তু-সম্পর্কের (বা ব্যক্তি-সম্পর্কের) একটা ত্রিভুজ তৈরী হয়। এই ত্রিভুজাকৃতি সম্পর্কের ধরনই তার ভবিষ্যৎ জীবনের সকল সম্পর্কের ভিত্তি ভূমি। কাজেই লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন শিশুর জীবনে বস্তু-সম্পর্কের এই ত্রিভুজটি সুদৃঢ় ও সুসমঞ্জস হয়। এর উপরই নির্ভর করে অহং-এর সুস্থ বিকাশ। আবার শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচ-ছ' বছরের বিভিন্ন দশার অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে তার বস্তু-সম্পর্কের ধরন। কাজেই

শিশুর জীবনের এই প্রথম পাঁচ-ছ' বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বভাবতঃই এই সময়ের লালন-পালন প্রক্রিয়াগুলিও অসীম গুরুত্বপূর্ণ।

সর্বশেষে এ-কথাটি বলা দরকার যে শিশু-মনের বিকাশ ধারার এই নিখুঁত জ্ঞান ফ্রয়েড আবিষ্কৃত মনঃসমীক্ষা বিজ্ঞানের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ ও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা লাভ করা সম্ভব হয়েছে। সেদিক থেকে মনঃসমীক্ষা শিশুমনোবিজ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত উদ্ঘাটিত করেছে।

শিশুর ভালবাসা

"'ভালোবাসি ভালোবাসি'
এই সুরে কাছে-দূরে জলে-স্থলে বাজায় বাঁশি।"
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"Across the gateway of my heart
I wrote "No Thoroughfare".
But love came laughing by, and cried
"I enter everywhere".
—Herbert Shipman.
(No Thoroughfare.)

"Love is an affective state, an attitude of the total personality toward an object..........." (Encyclopedia of Psychoanalysis, 1098)। ভালবাসা একটি দৃষ্টিভঙ্গী, বাইরের জগতের সাথে মিলনের দৃষ্টিভঙ্গী। ক্রোধ যেমন বিচ্ছেদের দৃষ্টিভঙ্গী, ভালবাসা তার বিপরীত। ভালবাসার মধ্য দিয়ে জগতের সাথে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তা মিলনের সম্পর্ক, তা আত্মবিস্মৃতির সম্পর্ক। ভালবাসা আলোর মত। অন্ধকারে আমরা আমাদের চারপাশের জগতের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। কারণ আমরা দেখতে পাই না। আলোর উপস্থিতি আমাদের চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের সাথে চার পাশের বস্তুরাজির যোগ ঘটায়। চার পাশের জগতর সাথে আমরা মিলিত হই। সকলের সাথে নিজেকে মিলিয়ে দেখতে পাই। আলো সব কিছুকে উদ্ভাসিত করে। ভালবাসাও সব কিছুর সাথে আমাদের মিলন ঘটায়। ভালবাসার আলোতে সব কিছু উদ্ভাসিত হয়।

ভালবাসার হু'টি রূপ। একটি ভালবাসা দেওয়া, আর একটি ভালবাসা চাওয়া। একজন ভালবাসা দেয়, আর একজন ভালবাসা নেয়। একজন বলে, 'আমি তোমাকে ভালবাসি ; আর একজন বলে, 'আমি তোমার ভালবাসা চাই।' ভালবাসা হু'জনের মধ্যে একটা দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক। তাই ভালবাসার বস্তু (object) কেউ নিজেও হতে পারে, আবার অপরকেও করতে পারে। কেউ যখন নিজেই ভালবাসার বস্তু হয়ে পড়ে, তখন সে অপরের কাছ থেকে ভালবাসা চায়। নিজেকে অপরের মত করে সাজিয়ে তোলে। আবার ভালবাসার বস্তু যখন অপর কেউ হয়, তখন তাকে ভালবেসেই একজন পরিতৃপ্ত। কিন্তু একজন মানুষের মধ্যে ভালবাসার এই হুটি দিক অবিমিশ্র ভাবে থাকে না। ভালবাসা নেওয়া ও দেওয়ার ইচ্ছা মানুষের মধ্যে মিলেমিশে থাকে। কখনও কোনওটা বেশি, কখনও কোনওটা কম—এই আপেক্ষিক তারতম্যে ভালবাসার হু'টি দিক বিরাজ করে।

খুব ছোট শিশুর (যেমন জন্মের পর থেকে মোটামুটিভাবে এক বছর বয়স পর্যন্ত) ক্ষেত্রে ভালবাসার রূপটি আবার একটু অন্য রকমের হ'তে দেখা যায়। তখন ভালবাসার কর্তা (subject) ও ভালবাসার বস্তু. (object) শিশু নিজেই। এরূপ ভালবাসাকে আত্ম-প্রেম (narcissism) বলা যেতে পারে। স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য মানুষের মধ্যে এই আত্ম-প্রেমেরও প্রয়োজন আছে। নিজেকে ভালবাসতে না শিখলে জগতকে ভাল বাসবে কি করে ? কিন্তু বয়ো-বৃদ্ধির সাথে-সাথে এই আত্মপ্রেম ধীরে-ধীরে বস্তু-প্রেমে রূপান্তরিত হওয়া দরকার। শিশু বড় হওয়ার সাথে-সাথে তার সাথে তার চার পাশের ব্যক্তি ও বস্তুর যোগাযোগ হতে থাকে। ছ'মাস বয়স থেকেই সে তার মা-বাবা ও ধীরে-থীরে অন্যান্য ব্যক্তি ও বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হতে থাকে। এই ভাবে তার কাম-শক্তি (libido) নিজেকে বাদ দিয়ে বাইরের ভোগ্য বস্তুর প্রতি ধাবিত হয়। বাইরের

বস্তু ও ব্যক্তির কাছ থেকে সে সুখ পেতে থাকে। তার ভালবাসার উপকরণের বিস্তৃতি ঘটে। সে অপরের কাছ থেকে ভালবাসা চাইতে থাকে এবং ধীরে-ধীরে অপরকে ভালবাসতে শেখে। শুরুতে যা ছিল আত্ম-প্রেম, পরিণামে তা হয়ে ওঠে বস্তু-প্রেম। এটাই স্বাভাবিক। এরূপ বিকাশ না ঘটলে, পরিণত বয়সেও মানুষ আত্ম-প্রেম সর্বস্ব হলে তার ব্যক্তিত্বে নানারূপ অস্বাভাবিকতা দেখা দেবে।

মনীষী ফ্রয়েডও ভালবাসাকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করেছেন। একটি আত্ম-প্রেম মূলক (narcissistic type) ও অন্যটি অন্যাশ্রয়ী মূলক (anaclytic type)। পরিণত স্বাভাবিক মানুষের ভালবাসা এই দুইয়েরই মিশ্রণ। ভালবাসা চাওয়ার মধ্যে আত্ম-প্রেমের ঝোঁকটাই বেশি থাকে ; আর ভালবাসা দেওয়ার মধ্যে অপরটির প্রাধান্যই বেশি। প্রথমটির প্রাধান্য শিশুর মধ্যে, এবং অপরটির বিকাশ শিশুর প্রতি মা-বাবার ভালবাসার মধ্যে। শিশুর ভালবাসা ভোগ-বৃত্তমূলক বা নিষ্ক্রিয় (passive) এবং মা-বাবার কর্ম-বৃত্তমূলক বা সক্রিয় (active)। পূর্বেই বলা হয়েছে ভালবাসার কোন একটি ধারাকে অবিমিশ্র ভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় না। দু'টি ধারার মিলনেই ভালবাসার স্রোতস্বিনী তার স্নিগ্ধ জলধারার স্পর্শে দুই কূল সঞ্জীবিত করে তোলে। এই দুই ধারার মধ্য দিয়েই মানুষে-মানুষে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, মানুষের জীবন ভালবাসার শত বর্ণে রঞ্জিত হয়ে ওঠে। এর থেকে আসে মান, অভিমান, রাগ, অনুরাগ, আসক্তি, কামনা, ঈর্ষা ইত্যাদি।

ভালবাসা চাওয়ার ধারাটিই শিশুর জীবনে, তার আচরণে বিশেষ পরিস্ফুট। তার অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদেই বিবর্তনের ধারা ক্ষুদ্র শিশুর মধ্যে কতগুলি সহজাত আচরণ বিধি এনে দিয়েছে, যার সাহায্যে শিশু অপরের দৃষ্টি, মনোযোগ ও ভালবাসা আকর্ষণ করে নিতে পারে। এই আচরণ বিধির প্রথমটি হ'ল কান্না। শিশুর যে

কোন অস্বস্তি বোধ হলেই সে তার কান্নার মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করে এবং অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার কান্নায় আকৃষ্ট হয়েই মা তার অসুবিধা দূর করতে এগিয়ে আসে। শিশু একটু বড় হলেই (৫।৬ মাস) সে সব সময় চায় কেউ তার নজরের মধ্যে থাকুক। মা তার কাছ থেকে উঠে গেলেই শিশুর নজর যতক্ষণ সম্ভব মাকে অনুসরণ করে। শিশু মুখ দিয়ে নানা রকম শব্দ করে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; অর্থাৎ সে তার নানা আচরণ ধারার মধ্য দিয়ে নিজেকে অপরের দৃষ্টির বিষয়বস্তু করে রাখে। এমনকি শিশু তার মল-মূত্র ত্যাগ, আহার প্রভৃতি কাজের দ্বারাও অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। শিশু জীবনের বস্তুগত প্রয়োজন বোঝে না। তাই শিশুর হাব-ভাব, সাজ-পোশাক পরা, লেখা-পড়া করা, সুশৃঙ্খল আচরণ করা প্রভৃতি সব কিছুর মধ্যেই অপরের ভালবাসা পাওয়ার তাগিদটি প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হয়। একটি মানব-শিশু নানা প্রকারের আদিম প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। ভালবাসা পাওয়ার তাগিদেই সে এই সকল প্রবৃত্তিকে পরিমার্জিত করে একটি সুশৃঙ্খল আচরণসম্পন্ন সভ্য মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে।

শিশুর মধ্যে ভালবাসা দেওয়ার ক্ষমতার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। শিশুর আচরণ পর্যবেক্ষণের সাহায্যেই একাজে আমরা কিছুটা অগ্রসর হতে পারি। এবং এই পর্যবেক্ষণ লব্ধ তথ্য থেকেই আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

এক কি দু'বছরের শিশুকে যখন দেখি যে মাকে বা বাবাকে চুমা দিচ্ছে, আদর করছে, তখন তার মধ্যে ভালযাসার অস্তিত্বকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। ধীরে ধীরে শিশু বড় হওয়ার সাথে-সাথে, তিন-চার বছর বয়স থেকেই দেখা যায় সে তার পুতুলকে আদর করছে, যত্ন করছে, পড়ে গেলে সান্ত্বনা দিচ্ছে। এগুলি তার মনের ভলেবাসারই অভিব্যক্তি। ধীরে-ধীরে সে অপরের সুখ-দুঃখের সাথে

দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করলে ভুল করা হবে। দেখতে হবে কোন পরিস্থিতিতে শিশু ভয় পাচ্ছে। শিশুর বাস্তব-বোধ থাকে দুর্বল। কাজেই বড়দের পক্ষে যা অযৌক্তিক শিশুদের পক্ষে তা যৌক্তিক হতে পারে। শিশু-মনে ভয় তার নিজস্ব যুক্তির ধারায় প্রকাশিত হয়। যদি শিশুর বয়স বাড়ার সাথে-সাথে তার ভয়ের বিষয়বস্তু, রূপ ও প্রকাশভঙ্গীর পরিবর্তন না হয় তবেই এ ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে এবং বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে হবে। শিশু-মনে ভয়ের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিও আবার একটি অস্বাভাবিকতার সূচক। অনেক সময় দেখা গেছে যে অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন শিশুরা কম ভয় পায়। তারা ভয়ের পরিস্থিতিগুলি বা ভয়ের লক্ষণগুলি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তারা বিপদের গভীরতা বা তাৎপর্য ঠিক বুঝতে পারে না। বুদ্ধিমান শিশুদের কল্পনা-শক্তি প্রখর থাকে। তারা পরিস্থিতির গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই সতর্ক হতে পারে। ভয়কে তারা আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে ব্যবহার করে।

শিশুর বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার ভয়ের বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে। মনোবিজ্ঞানী পিয়াঁজের (Jean Piaget) শিশুর বস্তুজগত সম্বন্ধে ধারণার বিকাশ সংক্রান্ত গবেষণা অনুযায়ী বলা চলে যে বস্তুজগত সম্বন্ধে শিশুর প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিকাশ-ধারার সাথে ভয়ের পরিবর্তন-ধারা যুক্ত। প্রথমে বহির্জগতের বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে শিশুর পার্থক্যবোধ থাকে না। বাইরের জগত তার কাছে একাকার (undifferentiated) হয়ে থাকে। কাজেই এই সময় শিশুর ভয় কোন নির্দিষ্ট বস্তু থেকে উদ্ভূত হয় না, একটা সামগ্রিক অস্বস্তিবোধ থেকে একটা অনির্দিষ্ট ভয়ের উদ্রেক হয়। ধীরে ধীরে বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশু বস্তুতে বস্তুতে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য করার ক্ষমতা আয়ত্ব করে। তখন তার ভয় বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে যুক্ত হয়। ছয়-সাত বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর দৃষ্টিভঙ্গী থাকে আত্মকেন্দ্রিক (ego-centric)। সে তার নিজস্ব কল্পনা জগতে বাস করে। কাজেই এই

সময় কাল্পনিক ভয়ই বেশি থাকে ; যেমন—ভূত, দৈত্য, পরী ইত্যাদি। শিশুর ভাষা আয়ত্বের সাথে-সাথেও ভয়ের বিকাশের যোগাযোগ রয়েছে। কথা বলার মধ্য দিয়ে শিশু যতই আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করে ততই সে প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিভিন্ন উৎসের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখে এবং এইভাবে তার অনুভূতির জগতে সুনির্দিষ্টতা দেখা দেয়। কাজেই তার ভয়ের জগতেও সুনির্দিষ্টতা দেখা দিতে বাধ্য। কৈশোরে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে ভয়ের বিষয়বস্তুর পার্থক্য দেখা যায়। কোন কোন ব্যাপারে ভয় পাওয়া ছেলেদের পক্ষে লজ্জার ব্যাপার ; যেমন একা একা কোথাও যাওয়া। এরূপ ভয় ছেলেদের মধ্যে বিশেষ দেখা যায় না। কিন্তু এরূপ ভয় মেয়েদের পক্ষে মোটেই লজ্জার নয়। সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাবে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে ভয়ের বিকাশের পার্থক্য দেখা যায়। এই কারণেই কিশোর বয়সের মেয়েদের মনে প্রথম মাসিকের (menstruation) সময় ও ছেলেদের মনে প্রথম বীর্যপাতের (semen discharge) অভিজ্ঞতার পর কখ্নও কখনও ভয় দেখা দেয়।

শিশু বড় হওয়ার সাথে-সাথে তার ভয়ের পরিমাণও কমে যেতে থাকে। কৈশোরের পরে সাধারণতঃ অমূলক ও অস্বাভাবিক ভয়গুলি দূর হয়ে যায়। কারণ একজন সুস্থ বয়স্ক মানুষ স্বাভাবিক ও সুস্থ বাস্তববোধের অধিকারী। তবুও শিশুবয়সের কিছু কিছু ভয় কারুর-কারুর ভিতর অধিক দিন, এমন কি বয়স্ক বয়স পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। শরীর সংক্রান্ত ভয়, কোনও বিশেষ প্রাণীর ভয়, অপার্থিব কোনও কিছুর ভয় কোনও কোনও মানুষের মনে অধিক দিন স্থায়ী হতে দেখা যায়। এই ভয় যদি তার দৈনন্দিন জীবনের কাজ-কর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে বা তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে ঐ ব্যক্তির কোন মানসিক দ্বন্দ্ব বা নিরাপত্তা-বোধের অভাব থেকেই এই অস্বাভাবিক ভয়ের উৎপত্তি।

নিজেকে মিলিয়ে দেখতে শেখে। অপরের সুখে সুখী হয়, অপরের দুঃখে দুঃখী হয়। পোষা পশু-পাখীর প্রতি সমবেদনা দেখায়। ধীরে ধীরে বড় হওয়ার সাথে-সাথে শিশুর ভালবাসা দেওয়ার প্রকাশভঙ্গীর কিছু-কিছু পরিবর্তন হয়। সে অপরের মনোভাবের প্রতি অনুভূতিশীল হয়। অপরের ভালবাসা দেখলে তার প্রতি সমবেদনাশীল ও অনুগত হয়। তার মধ্যে নম্র অনুভূতিগুলি দেখা দিতে থাকে।

শিশুদের মধ্যে দেখা যায় একটি শিশু অপর একটি শিশুকে আদর করে, যত্ন করে, বিপদে রক্ষা করে। শিশুদের মধ্যে এই মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব সুলভ মনোভাব ছোট বয়স থেকেই দেখা যায়। শিশুরা নিজেদের মা-বাবার প্রতিও এরূপ মনোভাব দেখায়। যদিও এর পরিপূর্ণ প্রকাশ হয় বয়স্ক জীবনে যখন তারা মাতৃত্ব বা পিতৃত্ব লাভ করে।

শিশুর ক্ষেত্রে ভালবাসা দেওয়া অপেক্ষা ভালবাসা চাওয়ার দিকটাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কারণ ভালবাসা চাওয়া এবং গ্রহণ করার ক্ষমতার মধ্যেই শিশুর বিকাশ বিধৃত। এর মধ্য দিয়েই বাইরের জগতের সাথে তার যোগাযোগের সূত্রপাত। তাই যে শিশু ভালবাসা পাওয়ার ক্ষেত্রে বঞ্চিত অথবা যার ভালবাসা গ্রহণের ক্ষমতা খর্বাকৃত, সে শিশুর বিকাশ ধারাও ব্যাহত। ভালবাসা চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্য দিয়েই শিশুর সুস্থ ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। কিন্তু এই ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ ও সুস্থ বিকাশ ঘটে ভালবাসা দেওয়ার ক্ষমতার মধ্যে ; ভালবাসা চাওয়া ও দেওয়ার ইচ্ছার একটা সামঞ্জস্য বিধানের মধ্যে। যে মানুষ কেবলই ভালবাসা চায়, দিতে পারে না, সে বাস্তব জীবনে অচল। সুখ তার জীবনে সুদূর পরাহত। সাধারণ বাস্তব জীবনে ভালবাসা চাওয়া এবং দেওয়া উভয়েরই প্রয়োজন আছে। কিন্তু একটি পরিপূর্ণ বিকশিত মানুষের মধ্যে ভালবাসা চাওয়ার দিকটি ভালবাসা দেওয়ার মধ্যে চরম পরিণতি লাভ করে। ভালবাসার এই রূপটির মধ্যেই মানুষের জীবনের শত বর্ণের শতদল প্রস্ফুটিত। তাই

শিশুর মধ্যে ভালবাসা দেওয়ার ক্ষমতার যাতে স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। ভালবাসা দেওয়ার বিকাশ না ঘটলে শিশু তার বয়োবৃদ্ধির সাথে-সাথে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়বে। তার মধ্যে অপরের দৃষ্টিভঙ্গী হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা গড়ে উঠবে না। অপরের সাথে, বাইরের জগতের সাথে একাত্ম অনুভূতির সুখ সে কোন দিনই লাভ করতে পারবে না। আমাদের শাস্ত্রে আছে 'ভূমৈব সুখম্ ইতি, নাল্পে সুখম্ অস্তি'। বিস্তৃতির মধ্যেই সুখ। ক্ষুদ্রতার মধ্যে সুখ- নেই। আত্ম-বিস্তৃতির জন্য চাই অপরকে ভালবাসার ক্ষমতা।

আত্ম-প্রেমে মগ্ন, ক্ষুদ্র শিশুর জগতের কেন্দ্রবিন্দু সে নিজেই। তার ভালভাসার বস্তু সে নিজেই। সে তার নিজের মানসিক, শারীরিক ও কল্পনার সুখের মধ্যেই মগ্ন হয়ে আছে। শিশুর এই চাহিদার মধ্যে তার অস্তিত্ব রক্ষার চাবিকাঠি নিহিত। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সাথে-সাথে শিশু যতই বাস্তবের সংস্পর্শে আসতে থাকে ততই তার আত্ম-প্রেমের কেন্দ্রবিন্দুটির স্থানান্তর ঘটতে থাকে। দৃষ্টিভঙ্গীর এই রূপান্তর ঘটনই স্বাভাবিক বিকাশ। তাই এরূপ বিকাশের জন্য চাই শিশুর জীবনে উপযুক্ত একটি ভালবাসার পরিবেশ। ভালবাসার পরিবেশের মধ্যে থেকেই শিশু ভালবাসতে শিখবে। মা-বাবার, বিশেষ করে মায়ের ভালবাসার মধ্য দিয়েই শিশুর জীবনে ভালবাসার প্রথম পাঠ শুরু হয়। তাই প্রত্যেক মা-বাবাকেই মনে রাখতে হবে যে তাদের ভালবাসা যেন শিশুকে আত্ম-প্রেমের মধ্যেই নিবদ্ধ করে না রাখে। তাদের ভালবাসা যেন শিশুর জীবনে বিস্তৃতির পথ দেখায়।

শিশুর জীবনে ভালবাসার যথাযথ প্রবাহটি বইয়ে দিতে হলে এ ব্যাপারে মা-বাবার উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে। তাদের আচরণে যেন কখনও ক্ষুদ্রতার প্রকাশ না ঘটে। পরিবারের বড়দের শিশুর প্রতি আচরণে সতর্ক হওয়া দরকার। এমন আচরণ কখনওই করা ঠিক নয় যার ফলে শিশুর মনে ঈর্ষা, ভয়, বিরক্তি, আত্ম-কেন্দ্রিকতা প্রভৃতি বিচ্ছেদমূলক অনুভূতিগুলি জাগে।

শিশুর খেলা

"তোতন, শীগগিরি খেতে এসো। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কখন থেকে ডাকছি, তা কানেই যাচ্ছে না।" মা ডেকে ডেকে সারা হচ্ছেন। ছেলের সেদিকে হুঁশ নেই। সে পুতুল, দিয়াশলাইর বাক্স, টিনের রেলগাড়ী, পাথর-কুচি আরও কত টুকিটাকি জিনিস ঘরময় ছড়িয়ে খেলায় মত্ত। খাওয়ার কথা মনেও করছে না। খাওয়ার সময় বয়ে যাচ্ছে। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। মায়ের কাজের অসুবিধা হচ্ছে, কাজ বাড়ছে। এমত অবস্থায় মা রেগে যান। —"দাঁড়াও, আসছি আমি। সব খেলনা ফেলে দেব। এই মাত্র ঘর ঝাঁট দিয়ে সব গুছিয়ে রাখলাম। এর মধ্যে দেখো ঘরের কি চেহারা করেছে। এখন সব তুলে রাখো, আবার কাল খেলবে।" অবশেষে মা অনন্যোপায় হয়ে জোর করেই ছেলেকে খাওয়াতে বসান। তোতন বিরক্ত মনে খেতে বসে। তার খেলা অসমাপ্ত থাকে। খাওয়ায় মন বসে না। মন ছুটে চলে হয়ত তার রেলগাড়ীর সাথে সাথে ধূ ধূ মাঠের মধ্য দিয়ে কোন্ নিরুদ্দেশের পথে।

(এক ইংরেজ কবি খেলার কল্পনার জগতে ধাবমান শিশুর মনকে প্রয়োজনের তাগিদে জোর করে এই খাওয়া-পরার বাস্তব জগতে ফিরিয়ে নিয়ে আসার মধ্যে যে একটা ব্যথার দিক আছে, একটা সমস্যার দিক আছে, তা সুন্দরভাবে একটি কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। সন্ধ্যার পর অল্প আলোতে ঘরের আসবাব পত্র ও তার ছায়া মিলে-মিশে শিশুর কল্পনার রাজ্যে জেগে ওঠে গল্পের বইয়ে পড়া এক বৈচিত্র্যময় জগত,—কোথাও সমুদ্র, কোথাও নিবিড় বনানী। এর মধ্যে চলে শিশুর রোমাঞ্চকর অভিযান। কিন্তু এর ছেদ পড়ে যখন—

"So when my nurse comes in for me,
Home I return across the sea,
And go to bed with backward looks
At my dear land of Story-books."

—R. L. Stevenson.

আপাতঃ দৃষ্টিতে শিশুর খেলা মায়ের ঘর-গেরস্থালীতে অসুবিধার সৃষ্টি করছে। তার কাজ বাড়াচ্ছে। শিশুর পড়াশোনা, খাওয়া-দাওয়ায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। কিন্তু এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। এ নেহাতই একদেশদর্শিতা। এ নেহাতই বড়দের সুবিধা-অসুবিধার কথা। শিশুর জীবনে খেলার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে গেলে শিশুর জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা এবং শিশুর জীবনে খেলার উৎপত্তি প্রভৃতি আলোচনা করে দেখা দরকার।

শিশুর খেলা সম্বন্ধে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। খেলাকে কেউ শিশুর একটা সহজ প্রবৃত্তি (instinct) বলে উল্লেখ করেছেন। মানবেতর প্রাণী-শাবকের মধ্যে যেমন একটা অহেতুক স্বতঃপ্রবৃত্ত গতি-চঞ্চলতা দেখা যায়, মানব-শিশুর মধ্যেও অনুরূপ গতি-চঞ্চলতা দেখা যায়। অহেতুক স্বতঃপ্রবৃত্ত গতি-চঞ্চলতাই খেলা। ছোট শিশু বিছানায় শুয়ে হাত-পা নাড়ে, দাপাদাপি করে। আর একটু বড় হলে অহেতুক ছুটোছুটি করে, নাচানাচি লাফালাফি করে ; কত রকমের ভঙ্গী করে। ঘরের ফেলে দেওয়া জিনিস নিয়ে কত কি যে করে। একই ভঙ্গী বা কাজ বার বার করে। একজনের পিছনে আর একজন ছুটোছুটি করে, ইত্যাদি কত রকমের গতি-চঞ্চলতা শিশুর মধ্যে দেখা যায়। এগুলোই খেলা। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে খেলা হলো কতগুলি স্বাভাবিক স্বতঃপ্রবৃত্ত গতি-চঞ্চলতা যার উদ্দেশ্য শিশুর কাছে স্পষ্ট নয় এবং যেগুলো করার মধ্যে শিশুর

একটা সুখবোধ রয়েছে। এর মধ্যের শারীরিক পরিশ্রমকে ক্লান্তিকর বলেই মনে হয় না। খেলার মধ্যে শিশু তার কল্পনাকে বিমুক্ত অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারে। এর মধ্য দিয়ে কখনও সে সৃষ্টি করে, কখনও সে বিনষ্ট করে। কখনও সে জয়লাভ করে, কখনও বিজিত হয়। এদিক থেকে খেলাকে নানা প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ বলা চলে।

খেলা সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেছেন যে খেলা হলো শিশুর উপচে পড়া শক্তির প্রকাশ। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ক্রীড়ারত শিশুকে কেউ কেউ বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সাথে তুলনা করেছেন। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে যেমন বাড়তি বাষ্প-শক্তি মাঝে মাঝে বের করে দিতে হয় এবং এর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখতে হয়, ঠিক সেইরূপ একটি শিশুর ক্ষেত্রেও বাড়তি শক্তি বের হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হলো খেলা। বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয়িত হয়েও অনেক শক্তি সঞ্চিত থাকে প্রাণী দেহে। এই সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখনই তার কিছু নির্গমন দরকার বাষ্পীয় ইঞ্জিনের মতই। খেলাই হলো এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

আবার খেলাকে কেউ বলেছেন অপচয়িত শক্তির পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা। দৈনন্দিন কাজের মধ্যে যখন আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি তখন খেলার মধ্য দিয়ে আমরা সে ক্লান্তিকে দূর করার চেষ্টা করি। এইজন্যই সারা দিনের কাজের শেষে খেলার নামে মন চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

অনেকে খেলাকে দেখেছেন ভবিষ্যৎ কর্ম জীবনের মহড়া হিসেবে। দু'টো কুকুরছানার একটা আর একটাকে তাড়া করছে। এটা ভবিষ্যৎ জীবনের শিকারের পিছনে তাড়া করার বা আত্মরক্ষা করার মহড়া। বেড়াল ছানা বল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে পরবর্তী জীবনের ইঁদুর ধরার কৌশল আয়ত্ত করার মহড়া হিসেবে। ছোট ছেলে-মেয়েদের যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা, পুতুল খেলা এবং আরও নানা রকমের খেলা

ভবিষ্যৎ জীবন সংগ্রামেরই প্রস্তুতি। এরূপ খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর একটা দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি ঘটে থাকে।

উপরের এই মতবাদের আবার বিরোধিতা করেছেন অনেকে। তাঁদের মতে খেলা ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি বা মহড়া নয়। বরং মানব জাতি যুগযুগান্তর ধরে তার জীবন সংগ্রামের তাগিদে যে সকল কর্ম-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার স্তর অতিক্রম করে বর্তমান সভ্যতার স্তরে এসে পৌঁছেছে, খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর জীবনে ঐসকল যুগ যুগান্তরের ফেলে আসা কর্ম-কাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটে। মানব জীবনের সেই ফেলে আসা অভিজ্ঞতার রসে শিশু আবার অবগাহন করে। চোর-চোর, ডাকাত-ডাকাত, যুদ্ধ-যুদ্ধ, শিকার ধরা, মাছ ধরা ইত্যাদি খেলার মধ্য দিয়ে পুরানো দিনের ফেলে আসা স্মৃতিই উদ্দীপিতি হয়। কাজেই খেলা ভবিষ্যৎ জীবন মুখীন নয়, বরং ফেলে আসা স্মৃতিমুখীন।

মানব মনের একটি অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি হলো প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কেউ কেউ বলে থাকেন খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবৃত্তিই চরিতার্থ হয়। এর সমর্থনে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক খেলার উদাহরণ তাঁরা দিয়ে থাকেন।

আবার অনেকে বলেন বড়দের তুলনায় শিশুর শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা অনেক কম। এর জন্য তার মনে একটা হীনমন্যতা বোধ রয়েছে। খেলার জগতে শিশু এই অবস্থাকে খানিকটা পুষিয়ে নিতে পারে।

একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে খেলা সম্বন্ধে এই সকল ব্যখ্যার প্রতিটিই অসম্পূর্ণ এবং একদেশদর্শী। খেলার মধ্যে যে একটা বিশেষ ধরন দেখতে পাওয়া যায়, ক্লান্ত অবস্থায়ও যে শিশুরা খেলে চলে, বাড়তি শক্তি কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ না হয়ে খেলার রাস্তাই বা কেন ধরে—এসব প্রশ্নের উত্তর আমরা এই সকল ব্যাখ্যার

মধ্যে পাই না। এ ছাড়া এই সকল মতবাদ বিশেষ করে বালক, কিশোর ও বয়স্কদের খেলার কিছু কিছু ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। ছোট শিশুর খেলা এর দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় না। তবে একথা ঠিক যে এর প্রতিটির মধ্যে কিছু না কিছু সত্য রয়েছে; অর্থাৎ প্রতিটি মতবাদই কোন একটা দিকের উপর গুরুত্ব দিয়ে সেই দিকটির ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। সেদিক থেকে এগুলিকে পরস্পরের পরিপূরক হিধাবে গণ্য করাই ঠিক।

খেলাকে কেবল মাত্র ব্যাখ্যা করা এবং তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করাই যথেষ্ট নয়। খেলাকে আমরা কিভাবে শিশুর দৈনন্দিন জীবনে তার ক্রমবিকাশের সহায়তায় প্রয়োগ করতে পারি তা আমাদের ভাবতে হবে। মনঃসমীক্ষা মূলক মনোবিজ্ঞান খেলার এই ব্যবহারিক বা প্রয়োগের দিকটি সবিশেষ যত্ন সহকারে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিতে তুলে ধরেছে। মনঃসমীক্ষা তাই খেলাকে চিকিৎসার হাতিয়ার হিসাবেও ব্যবহার করে থাকে। এই মতবাদ অনুযায়ী মানব মনের উপর (বিশেষ করে শিশু মনের উপর) খেলার একটা বিরেচক (cathertic) প্রভাব রয়েছে। মনের সকল অবদমিত বৃত্তি, ইচ্ছা ও দ্বন্দ্বগুলি খেলাকে কেন্দ্র করে বহিঃপ্রকাশের সুযোগ পায়। সমাজ, সংস্কৃতি, ন্যায়-নীতি ও অনুশাসনের বাধার জন্য মনের যে সকল ভাব, ধারণা, বৃত্তি, ইচ্ছা ইত্যাদি বহিঃপ্রকাশের পথ পায় না, সেগুলি খেলার রাস্তা ধরে বেরিয়ে আসে এবং মনকে অপরিসীম বোঝার ভার থেকে মুক্তি দেয়। এ ছাড়া খেলাকে কেন্দ্র করে বা খেলার মধ্য দিয়ে মানব শিশুর মনের বিকাশ ঘটতে থাকে। খেলা শিশু মনের অহং-শক্তি (Ego strength) বিকাশের একটি পথ। শিশু যে সচেতন ভাবে খেলার মধ্য দিয়ে অহং-শক্তির বিকাশ ঘটায় তা নয়; এ ব্যবস্থা বিবর্তনের ধারার মধ্যে নিহিত। যেমন প্রাণী জগতে যৌন মিলনের মধ্য দিয়ে প্রাণীর বংশধারা বয়ে চলেছে।

তাই বলে সচেতনভাবে বংশ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রাণী সকল যৌন সঙ্গম করে না। সেরূপ ভাবে খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর অহং বা বাস্তব-বোধের বিকাশ ঘটতে থাকে। শিশু কেবল মাত্র ভাল লাগার তাগিদেই খেলা করে। তার সামনে এর অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। খেলা নিজেই নিজের পুরস্কার। যে ক্রিয়া কেবল মাত্র ভাল লাগার তাগিদে হয়, যার উদ্দেশ্য শুধু মাত্র গতি-চঞ্চলতার আনন্দ, তাই খেলা। খেলা যদি এরূপ স্বাভাবিক স্বতঃপ্রবৃত্ত এবং আনন্দময় না হ'তো তা হলে মানব মনের মত একটা জটিল জিনিসের বিকাশ এর মধ্য দিয়ে সম্ভব হ'তো না। খেলার মধ্য দিয়ে শিশু নিজের (এবং সকলের) অলক্ষ্যে নিজের মানস সৌধ গড়ে তোলার কাজের অনেক সুযোগ পায়। খেলার মধ্য দিয়ে এই অসংখ্য কক্ষময় সৌধের বহু সংখ্যক ইট স্থাপিত হয় এবং ধীরে ধীরে এই বিরাট সৌধ গড়ে ওঠার কাজ এগিয়ে চলে। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় দর্শনে সৃষ্টির পিছনে 'লীলা'র কথা উল্লেখযোগ্য। সৃষ্টিও যেন এক মহাশক্তির 'লীলা' বা খেলা। শুধু মাত্র লীলার আনন্দে বিভোর হয়ে মহাশক্তি এই সৃষ্টির ধারা বয়ে নিয়ে চলেছে। এর মধ্য দিয়ে হয়ত নানা উদ্দেশ্য চরিতার্থ হচ্ছে; কিন্তু মহাশক্তি লীলার আনন্দে বিভোর হয়ে সৃষ্টি ক্রীড়ায় রত। জগৎময় গতি-চঞ্চলতার মধ্যে আনন্দই মুখ্য কথা। উপনিষদের কথায়—

"কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।"

"কেই বা শরীর চেষ্টা করিত, কেই বা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দ না থাকিতেন।" (রবীন্দ্রনাথ)।

জগৎময় সকল প্রক্রিয়ার মধ্যেই আনন্দের লীলাখেলা এবং লীলা-খেলার আনন্দ বিরাজমাম।

আমরা বড়রা যখন ঘর-সংসারের কাজ করি, অফিস-কাছারির

কাজ করি, পড়াশোনার কাজ করি, তখন সে সকল কাজকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। শিশুর খেলাও শিশুর কাছে তদনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই শিশুর খেলা ভাঙ্গার আগে আমাদের ভাবতে হবে।

আমরা যদি একটু নজর করি তাহলে দেখতে পাব যে শিশুর খেলা শুরু হয় তার জন্মের কিছু দিন পর থেকেই। দু'তিন দিন বয়সের শিশুকেও দেখা গেছে হাতের আঙ্গুল মুখের কাছে নিয়ে আসছে বার বার। শিশুর প্রথম খেলা শুরু হয় তার হাত, পা ও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে এবং তার মাকে নিয়ে—মায়ের মুখ, হাত, চুলের গুচ্ছ ও স্তন নিয়ে। এগুলিই তার খেলনা। মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার সময় একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে শিশু মায়ের হাতের আঙ্গুল, মাথার চুল নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। দুধ খাওয়া হয়ে গেলেও স্তন মুখে পুরে জিভ বা ঠোঁট দিয়ে নাড়াচাড়া করছে অথবা হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করছে। শুইয়ে থেকে হাত-পা ছোড়া, পায়ের আঙ্গুল ধরা, লিঙ্গ নাড়াচাড়া করাও শিশুর খেলা। তবে মা হলো শিশুর খেলার প্রথম সঙ্গী। প্রাথমিক স্তরে মায়ের শরীরের কোনও কোনও অঙ্গ, যেমন হাত, চুল, মুখ এবং স্তন, শিশুর খেলার সঙ্গী হিসেবে থাকে। হয়ত এগুলি শিশুর কাছে সম্পূর্ণ মায়েরই প্রতিনিধিত্ব করে। এমন কি একটু বড় হলেও শিশুকে মায়ের শরীরের কোনও একটা অঙ্গ নিয়ে খেলা বা খেলার কল্পনা করতে দেখা যায়। প্রায় চার বছর বয়সের শিশু তোতন মায়ের মুখ দু'হাত দিয়ে ধরে বলছে, "এই মুখটা নিয়ে আমি খেলা করব। এটার হাত আছে, পা আছে, কথা বলে, দেখতে পায়। এটা শাড়ী পরে, ব্লাউজ পরে, এটাকে আমি শাড়ী পরাবো।"

শিশু খুব বেশি দিন নিজেকে নিয়ে, অর্থাৎ নিজের শরীর নিয়ে খেলায় মত্ত থাকে না। একটু বড় হলেই, এমন কি বসতে পারার

আগেই সে হাতের কাছের জিমিসপত্র ধরার চেষ্টা করে। জিনিসপত্র ধরার চেষ্টা করা এবং ধরাই তখন তার খেলা। নিজের মল-মূত্র ঘাঁটাঘাঁটি করাও তার এক রকমের খেলা। এরপর সে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী দিয়ে খেলতে শুরু করে। এই সময় মনে রাখতে হবে যে শিশুকে কিছুদিন খেলার সামগ্রী হিসাবে নরম বস্তু দেওয়া দরকার (যেমন কাদা মাটি)। কারণ শিশুর প্রাথমিক খেলা শুরু হয়েছিল নিজের এবং মায়ের শরীরের নরম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে। তাছাড়া নরম জিনিসে শিশু সহজেই নিজের ইচ্ছামত আকৃতিগত পরিবর্তন আনতে পারে। এইভাবে শিশু তার পরিচিত খেলার সামগ্রী নাড়া-চাড়ার মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে যে পরিবর্তন আনে, তার ফলে সে আসলে তার পরিবেশের জিনিসের মধ্যে পরিবর্তন সাধনের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করে। সে তার খেলার জিনিসগুলি খুশি মত ভাঙতে পারে, জোড়া লাগাতে পারে এবং এই ধরণের প্রতিটি কাজেরই তার কাছে একটা অর্থ আছে। এইভাবে শিশু পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করার চেষ্টা করতে থাকে।

এর পরের স্তরেই শিশু আকৃষ্ট হতে থাকে নানা রকমের খেলনার প্রতি। যেমন পুতুল, রেলগাড়ী বা অন্যান্য গাড়ী, খেলনা, আসবাবপত্র, কাঠের টুকরো, ইট, পাথর কৌটো, ঘরের বিভিন্ন ভাঙ্গা জিনিসপত্র ইত্যাদি। খেয়াল রাখতে হবে যে শিশু যখন বিভিন্ন জিনিসপত্র দিয়ে গঠন মূলক খেলা খেলতে সক্ষম হবে তখনই তাকে সেসব জিনিস দিতে হবে। কারণ এর আগের স্তরে শিশু বিভিন্ন জিনিস নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করবে, ভাঙচুড় করবে, নষ্ট করবে। তবে এসব করারও সুযোগ তাকে কিছু কিছু দিতে হবে। এর মধ্য দিয়ে তার নষ্ট করার, ধ্বংস করার বা এক কথায় তার আক্রম বোধের চরিতার্থতা হবে। এবং এরপর সে কাদামাটি পেলে তা ছোঁড়াছুঁড়ি লেপটা-লেপটি না করে তা দিয়ে কিছু গড়বে। দিয়াশলাই বাক্স

পেলে না ভেঙ্গে তা দিয়ে রেলগাড়ী তৈরী করবে। এইভাবে শিশুর বিভিন্ন গঠনমূলক খেলায় উত্তরণ ঘটবে, যার মধ্যে সুযোগ হবে তার কল্পনা শক্তির বিকাশের। শিশুকে যে সব সময় খুব নিপুনভাবে গঠিত বা বাস্তবের অনুকরণে গঠিত খেলনা দিতে হবে তা নয়। শিশু সামান্য জিনিস দিয়েও তার কল্পনার সাহায্যে অনেক কিছু খেলতে পারে। সে পর পর ইটের টুকরো সাজিয়ে রেলগাড়ী বানাতে পারে এবং সেই রেলগাড়ীর ঝিক্‌ঝিক্ শব্দ করে চলতে কোনও বাধা থাকে না। খেলার মধ্য দিয়ে যাতে তার কল্পনার বিকাশ ঘটতে পারে তার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। এদিক থেকে যে শিশুর জীবনে খেলনা সামগ্রীর প্রাচুর্য্য, খেলনার ভারে তার কল্পনার জগত সঙ্কুচিত। "উপকরণ প্রচুর থাকিলে মনটা কুঁড়ে হইয়া পড়ে; সে কেবলই বাহিরের উপরেই সম্পূর্ণ বরাত দিয়া বসিয়া থাকে, ভুলিয়া যায়, আনন্দের ভোজে বাহিরের চেয়ে অন্তরের অনুষ্ঠানটাই গুরুতর। শিশুকালে মানুষের সর্বপ্রথম শিক্ষাটাই এই। তখন তাহার সম্বল অল্প এবং তুচ্ছ, কিন্তু আনন্দলাভের পক্ষে ইহার চেয়ে বেশি তাহার কিছুই প্রয়োজন নাই। সংসারে যে হতভাগ্য শিশু খেলার জিনিস অপর্যাপ্ত পাইয়া থাকে তাহার খেলা মাটি হইয়া যায়।" (রবীন্দ্রনাথ)

শিশু ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে এবং সে খেলার সঙ্গীর প্রয়োজন বোধ করতে থাকে। আড়াই বছর তিন বছর বয়স থেকেই শিশু খেলার সঙ্গীর প্রয়োজন বিশেষভাবে উপলব্ধি করে। এতদিন সমবয়সী অন্য শিশু বা অপরাপর ব্যক্তিরা ছিল তার খেলার সামগ্রী। এখন তারা তার খেলার সঙ্গী। এই সময় থেকেই শিশু কিছু কিছু সংগঠিত ও নিয়ম শৃঙ্খলায় আবদ্ধ খেলা খেলতে শুরু করে। এরপর এরূপ খেলার চরম বিকাশ ঘটে তার বাল্যকাল, কৈশোর ও যৌবনে। এইভাবে খেলার মধ্য দিয়ে তার সামাজিক বিকাশ ঘটতে থাকে। যে শিশু খেলা শুরু করেছিল একা এবং তার মাকে নিয়ে, তারই এখন

প্রয়োজন অনেক সঙ্গীর। এইভাবেই খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর জগতের বিস্তৃতি ঘটতে থাকে।

আগেই বলা হয়েছে যে খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর বিভিন্ন আবেগের প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে, যার মধ্যে তার আক্রমবোধ (aggression) অন্যতম। খেলার জগতের মাধ্যমেই এই আক্রমবোধ বিনা বাধায় প্রকাশ হতে পারে যেমন পারে রূপকথার জগতের মধ্য দিয়ে। খেলার মধ্য দিয়েই আক্রান্ত না হয়েও আক্রমবোধের চরিতার্থতা সম্ভব। বাস্তব জগতে শিশু যা ব্যক্ত করতে পারে না, খেলার মধ্য দিয়ে শিশু তা প্রকাশ করে। যেমন যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা, রেল দুর্ঘটনার খেলা, যেমন পুতুল খেলায় বাবা-পুতুল, মা-পুতুল অথবা শিশু পুতুল অসুস্থ হচ্ছে, এমন কি মারাও যাচ্ছে। ইস্কুল ইস্কুল খেলায় ঘরের আসবাবপত্র ছাত্র হচ্ছে, তার মধ্যে কোনটা হয়ত বাবা অথবা মা অথবা দাদা বা দিদি, বা অন্য কেউ। মাঝে-মাঝেই পড়া না পারার জন্য তাদের শাস্তি পেতে হচ্ছে। এই ভাবে খেলার মধ্য দিয়ে শিশুমনের যথাযথ অভিব্যক্তি ঘটে এবং তার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। এই কারণেই মনঃসমীক্ষায় শিশুর মানসিক অসামঞ্জস্যতা চিকিৎসার ক্ষেত্রে খেলাকে কাজে লাগান হয়েছে।

এক দিকে যেমন খেলার মধ্য দিয়ে শিশু আনন্দ পায়, আবার অন্য দিকে খেলার মধ্য দিয়ে শিশু তার মনের আবেগ ও উদ্বেগ জনিত নিরানন্দকে ঠেকিয়ে রাখে। এই জন্যই অনেক সময় দেখা যায় যে শিশু যখন কোন বিশেষ মানসিক উদ্বেগে ভোগে তখন সে অনেক সময় ধরে একই খেলার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। খেলা যেখানে উদ্বেগকে ঠেকিয়ে রাখার কাজে ব্যবহৃত হয় সেখানে বিশেষ সতর্কতার সাথে শিশুর সাহায্যে এগিয়ে যেতে হবে। কারণ এরূপ খেলা শিশুর মানসিক জগতের ভারসাম্যহীনতার ইঙ্গিত। এরূপ খেলায় যে সে কতটা আনন্দ পায় বলা মুশকিল। তাই এরূপ ক্ষেত্রে

শিশুর সাহায্যে এগিয়ে না গেলে সে ধীরে ধীরে মানসিক বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। খেলা তখন মানসিক বিকাশের উপায় না হয়ে বাস্তব জীবনের থেকে পলায়নের রাস্তা হয়ে দাঁড়াবে। আজকাল আমাদের দেশে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে খেলা নিয়ে বিশেষ ধরণের একটা মাতামাতি দেখা যায়। ক্রিকেট খেলার মরসুমে স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলার রিলে শোনায়, খেলার আলোচনায় এবং খেলার টিকিট যোগাড় করার কাজে ব্যয় হয়ে যায়। এই পরিস্থিতির মধ্যে যেন একদল মানুষের বাস্তব অবস্থা থেকে সরে যাওয়ার এবং একটা মানসিক অসুবিধা থেকে আত্মরক্ষা করার লক্ষণসমূহ ফুটে ওঠে। তেমনি শিশু যদি খেলার মধ্যে এরূপ আত্মগোপন করার চেষ্টা করে তাহলে অতি সতর্কতার সাথে ধীরে ধীরে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে আনতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে তার মধ্যে যেন অন্য কোনও রূপ মানসিক অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে খেলার মধ্যে পুনরাবৃত্তি ও মাতামাতির মাত্রা বেশি ঘটলেই তাকে অস্বাস্থ্যকর এবং আনন্দহীন মনে করার কারণ নেই। শিশু তার কুশলতা অর্জন ও পরিস্থিতির উপর যথেষ্ট আয়ত্ত লাভের জন্যও একই খেলা বার বার ও অনেকক্ষণ ধরে খেলে। দেখতে হবে যে শিশুর খেলা তার কাছে আনন্দ রহিত হয়ে বাধ্য-বাধকতার পর্যায়ে পৌঁছেছে কিনা। সেরূপ ক্ষেত্রেই কেবল মাত্র সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে।

খেলার মধ্য দিয়ে শিশু তার পরিবেশের সাথে পরিচয় করে নেয়; সে পরিবেশের নব নব পরিস্থিতি আবিষ্কার করে। এই ভাবে তার বাস্তববোধের উন্মেষ ঘটে। মায়ের সাথে খেলার মধ্য দিয়ে প্রথম তার পরিবেশের সাথে যোগাযোগ ঘটে। কাজেই সেই স্তরে শিশুর বাস্তববোধ গড়ে তোলার পক্ষে এবং বাইরের জগতের প্রতি তার

সুসংহত দৃষ্টি-ভঙ্গী গড়ে তোলার পক্ষে খেলা বিশেষ সহায়ক। কাজেই দেখা যাচ্ছে খেলা শিশুর কাছে একটা নব আবিষ্কারের পরিস্থিতি, একটা রোমাঞ্চকর পরিস্থিতি।

খেলা এমনই একটা ব্যবস্থা যার মধ্য দিয়ে শিশু বাস্তব পরিস্থিতির সম্মুখীন না হয়েও বাস্তব পরিস্থিতির উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে। খেলার মধ্য দিয়ে সে বস্তু জগতের এবং বহির্জগতের নিয়মসমূহ আবিষ্কার করে ও আত্মসাৎ করে নেয়। যেমন কাদামাটি দিয়ে খেলতে গেলে কাদামাটির স্বভাবের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। অপর সঙ্গীর সাথে খেলতে গেলে সঙ্গীর মনোভাবের মূল্য দিতে হবে। এই ভাবে শিশু তার আত্মকেন্দ্রিক জগত থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তব জগতের উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠার শিক্ষণ পায়। খেলার মধ্য দিয়ে শিশু নিজের সাথে অপরের সম্পর্কগুলি যাচাই করে নিতে পারে। অপরের ধৈর্য্য কতটা, কতটা সে সহ্য করবে, কিসে তার রাগ হবে বা হবেনা, অপরের ভালবাসা কতটুকু—এসব ব্যাপার খেলার পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচাই করার সুযোগ মেলে। কোন্ কোন্ কাজগুলিতে মা-বাবা রাগ করে, আর কোনগুলিতেই বা তারা প্রশংসা করে—এ বোধ শিশুর খেলার মধ্যে জন্মাতে থাকে এবং খেলার মধ্য দিয়েই শিশু এ সবের বাছাই ও যাচাই করে নেয়। শিশু খেলায় মত্ত। সে তার টুকিটাকি ঘরময় ছড়িয়ে বসেছে। মা ভাত বেড়ে ডাকাডাকি করছে খেতে যাওয়ার জন্য। কিন্তু শিশুর রান্নাবাড়ি খেলা, রেলগাড়ী খেলা ছেড়ে খেতে যেতে ইচ্ছা করছেনা, যাচ্ছেনা। এ খেলার জগতও তার কাছে কম সত্য নয়, অবশেষে যখন সে বুঝতে পারে যে মা বিরক্ত হচ্ছে, রাগ হচ্ছে, তখন দৌড়ে খাওয়ার জায়গায় গিয়ে বসে। এরূপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সে তার কল্পনার জগত থেকে বাস্তব জগতে ফিরে আসে, কল্পনার সত্য থেকে বাস্তব সত্যে ফিরে আসে। এভাবে ধীরে ধীরে তার শৃঙ্খলাবোধ

সাধারণতঃ যে সকল কারণ বা পরিস্থিতি থেকে শিশুর মনে ভয়ের সঞ্চার হয় তা আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ভয়ের কাছাকাছি আর একটি অনুভূতি সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা দরকার। এই অনুভূতিটির নাম উৎকণ্ঠা (anxiety)। ভয় এবং উৎকণ্ঠা—উভয়ের মধ্যে বহুলাংশে মিল রয়েছে। কেবলমাত্র উৎসের সুনির্দিষ্টতা বা স্পষ্টতার দিক থেকে উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সাধারণতঃ ভয়ের ক্ষেত্রে ভীত ব্যক্তির ভয়ের কারণ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকে। এ ব্যাপারে তার দৃষ্টি স্বচ্ছ ও নির্ভুল। সে ভূতের ভয় পাচ্ছে, না পোকার ভয় পাচ্ছে, তা সে ভয় পাওয়ার সাথে সাথেই বলতে পারে। কিন্তু যে মানুষের মন উৎকণ্ঠার ছায়ায় আবৃত, সে শুধু উৎকণ্ঠাই অনুভব করে। কি কারণে তার উৎকণ্ঠা তা সে বলতে পারে না। কোনও একটা কিছুর জন্য সে উৎকণ্ঠিত বা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে, এইটুকুই কেবলমাত্র বুঝতে পারে। উদ্বেগের কারণ সম্পর্কে তার মনে কোনও স্পষ্ট ধারণা থাকে না। ভয় ও উৎকণ্ঠার ব্যাপারে শিশু ও বয়স্ক, সকলের ক্ষেত্রেই এরূপ তারতম্য দেখা যায়। প্রতিক্রিয়ার দিক থেকেও ভীত এবং উদ্বিগ্ন শিশু বা ব্যক্তির মধ্যে তারতম্য দেখা যায়। ভীত ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া সুনির্দিষ্ট ; ভয়ের উৎসকে সে পরিহার করতে চায়। তাই সে প্রয়োজনবোধে পলায়ন করে, অথবা ভয়ের উৎসকে আঘাত বা আক্রমণ করে। কিন্তু উৎকণ্ঠা সঞ্জাত প্রতিক্রিয়া এতটা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নয়। মানুষ তার উৎকণ্ঠার উৎস সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অবহিত থাকে না। তাই তার প্রতিক্রিয়াকে কোন খাতে পরিচালিত করতে হবে সে সম্বন্ধে তার কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই। কাজেই তার প্রক্রিয়ার মধ্যেই কোন নির্দিষ্টতা নেই। প্রতিক্রিয়া প্রায়শঃই এলোমেলো এবং অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। উৎকণ্ঠা ব্যক্তিত্বের আভ্যন্তরিক ব্যাপার। ব্যক্তিত্বের গঠনের (structure) সাথে এ যুক্ত। তাই উৎকণ্ঠাকে বলা হয় ব্যক্তিগত (subjective) ব্যাপার। সাধারণতঃ এবং

আপাতদৃষ্টিতে এর সুনির্দিষ্ট কোন বস্তুগত ভিত্তি থাকে না। তাই ভীত মানুষের মধ্যে যেমন ভয়ের উৎস থেকে আত্মরক্ষার জন্যে পলায়নের প্রবৃত্তি দেখা যায়, উদ্বিগ্ন মানুষের মধ্যে এরূপ কোন সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না। কারণ কারুর পক্ষেই নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বিপরীত পক্ষে উৎকন্ঠিত মানুষ উৎকণ্ঠার বা উদ্বেগের বিষয়বস্তুগুলির বা পরিস্থিতির মধ্যে বারবার নিজেকে টেনে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে তার মধ্যে একটা বাধ্যতামূলক বা আবেশিক অনুবৃত্তি মূলক (obsessive-compulsive repetition) প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। শিশুদের মধ্যেও নানা ভাবে উৎকণ্ঠার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। অনেক সময় ভয়ের সাথে এর পার্থক্য নিরূপণ দুষ্কর হয়ে পড়ে। কোন কোন মনোবিজ্ঞানীর [যেমন সুলিভান (Sullivan)] মতে শিশুদের বড় হওয়ার পথে উদ্বেগ একটা স্বাভাবিক আনুষঙ্গিক ব্যাপার। কিছুটা উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা শিশুর মনের একটা স্বাভাবিক ব্যাপার ; কিন্তু এক্ষেত্রেও মাত্রাধিক্য ঘটলে ব্যক্তিত্ব হানির সম্ভাবনা রয়েছে।

ভয়ের বস্তু সম্বন্ধে যেমন ভীত মানুষের সুনির্দিষ্ট ধারণা থাকে, উৎকণ্ঠা সম্বন্ধে উৎকন্ঠিত মানুষের সেরকম কোন ধারণা থাকে না। তাই উৎকণ্ঠাকে অবচেতন মনের ব্যাপার বলা হয়ে থাকে। উৎকণ্ঠার ধারণার সাহায্যে মানুষের অনেক অপ্রাসঙ্গিক বা আপাতঃ যৌকিক্ত ব্যবহার ও প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা সম্ভব হয়েছে (যেমন আপাতঃ অহেতুক রাগ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, আত্ম-সম্মান নষ্টের ভয়, অতিমাত্রায় কর্ম প্রবণতা, পানাসক্তি ইত্যাদি)।

ভয় ও উৎকণ্ঠার মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। ভয়ের উৎস ও ভয়ের প্রকাশের মধ্যে একটা পরিমাণগত আনুপাতিক সামঞ্জস্য থাকে। প্রতিক্রিয়াটি ভয়ের উৎসের অনুরূপ হবে। সামান্য ভয়ের ব্যাপারে

জাগতে থাকে, তার অহং-শক্তি বাড়তে থাকে। আবেগসর্বস্ব শিশু ধীরে ধীরে বাস্তবমুখীন হতে থাকে। খেলা হলো সম্পূর্ণ আবেগসর্বস্ব ও আত্মকেন্দ্রিক জগত এবং বাস্তবজগতের মাঝামাঝি একটা পরিস্থিতি। তাই খেলার মধ্য দিয়ে আবেগসর্বস্ব আত্মকেন্দ্রিক অবস্থা থেকে বাস্তব জগতে উত্তরণের সহজ সুযোগ মেলে।

শিশু শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতায় বড়দের থেকে খর্ব। ক্ষমতার এই অভাব সে মনে মনে উপলব্ধি করে এবং এর জন্য তার একটা হীনমন্যতা থাকে। খেলার জগতে শিশু এই ক্ষমতার অভাব পূরণ করে নেয়। খেলায় সে দৈত্য, পুলিশ, ডাকাত, কুমীর, বাঘ, রেলগাড়ী, মা, বাবা, দাদা, দিদি, মাষ্টারমশাই প্রভৃতি কত কিছু হয়। ঐ সমস্ত চরিত্রের সাথে একাত্ম অনুভূতির মধ্য দিয়ে সে ক্ষমতার স্বাদ মিটিয়ে নেয় এবং নিজের ক্ষুদ্রত্ব ঘুচিয়ে দেয়। তোতন ও বাবুন বাঘ বাঘ খেলতে খুব ভালবাসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই খেলা চলতে থাকে। একজন বাঘ আর একজন মানুষ বা হরিণ হচ্ছে। দু'জনের মধ্যে মাঝে মাঝে এ ব্যবস্থার অদল বদল হয়। তবে ছোট জন (তোতন) বেশির ভাগ সময় বাঘ হতে চায়। ওরা দু'জনেই অনেক বাঘের গল্প শুনেছে। বাঘের শক্তি, বাঘের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ওদের ভাল লাগে। খেলার মধ্য দিয়ে এই শক্তিকে ওরা অনুভব করার চেষ্টা করে। খেলার মধ্য দিয়ে শিশুরা নিজেদের ভয়ের পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করারও চেষ্টা করে। তোতন ফড়িংকে ভয় পায়। একদিন তাকে ভয় দেখাবার জন্য ফড়িং-এর পাখার শব্দের মত ফর্ ফর্ শব্দ (ঘরের মধ্যে ওড়ার সময় ঐ রকম শব্দ হয়) করা হলো। ও ভয় পেতেই থেমে যাওয়া হলো। খানিক বাদে ও বলল, "আবার করো। কৈ, ফড়িং আসছে না কেন?" শেষ পর্যন্ত এই ফড়িং আসার খেলা অনেকক্ষণ ধরে চালাতে হলো। এখন মাঝে মাঝে এই ফড়িং আসার খেলা খেলতে হয়। বুবুন বেলুন দেখলে ভয় পেত। অনেক

সময় মজা করার জন্য মুখে বাতাস ঢুকিয়ে গাল ফুলিয়ে বলা হত "এই যে বেলুন।" এ রকম করলেই ও চেঁচাত। আবার থেমে গেলেই বলত, "আবার করো।" অবশেষে নিজেদের ফাঁদে নিজেদের পড়া। মুখ ব্যথা হলে বুবুনকে অন্য খেলায় ভুলিয়ে এ খেলা বন্ধ করতে হতো।

অনেক সময় দেখা যায় শিশুরা এমন খেলে, যার ফলে বড়দের বিরক্তি উৎপন্ন হয়। যেমন ঘরময় কাগজ কুটিকুটি করছে, জল ছিটাচ্ছে, ঠুকঠুক শব্দ করছে, মুখে নানারকম শব্দ করছে। মা যখন অন্য কারুর সাথে কথা বলছে তখন হয়ত মায়ের চারদিকে ঘুরছে বা এমন কিছু করছে যার ফলে মায়ের অসুবিধা হচ্ছে। এইভাবে বিরক্তি উৎপাদন করার মধ্যেও তার আনন্দ আছে, কারণ এরূপ খেলার মধ্য দিয়ে সে যে বিরক্তির কারণ হতে পারছে তার জন্য একটা আনন্দ পায় এবং নিজের মূল্যবোধ জন্মে। এরূপ ক্ষেত্রে শিশুর মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

খেলা সম্পর্কে আর একটি কথা আমাদের ভাবা দরকার। আজকাল বিদ্যালয়ে কিশোর কিশোরীদের জন্য সংগঠিত খেলার উপর খুব জোর দেওয়া হচ্ছে। যেমন ফুটবল, ক্রিকেট, টেবিল-টেনিস ইত্যাদি প্রতিযোগিতামূলক খেলা। বলা হয়ে থাকে এরূপ খেলায় সহযোগিতা বোধ বাড়ায়। আমাদের ভেবে দেখা দরকার যে এরূপ খেলার মধ্য দিয়ে সহযোগিতার পরিবর্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং নানাভাবে আক্রম বোধ উদ্দীপিত হয় কিনা? আমরা যদি গণতান্ত্রিক ও সহযোগিতামূলক শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা চাই তাহলে এ সকল খেলার উপর এত গুরুত্ব দেওয়া কি ঠিক? এর চাইতে নানা দুঃসাহসী খেলা, যেমন দূর পাল্লার সাঁতার, পর্বতারোহণ, নৌকা-চালনা এবং বিভিন্ন ব্যায়াম সংক্রান্ত ক্রীড়া চর্চার উপর গুরুত্ব দেওয়া ভাল নয় কি? এর মধ্য দিয়ে সাহস ও শারীরিক কুশলতা বাড়তে পারে ও আবিষ্কারের আনন্দ পেতে পারে।

সর্বোপরি মনে রাখতে হবে যে খেলা সম্বন্ধে বড়দের যথোপযুক্ত মনোভাব পোষণ করতে হবে। বিশেষ করে শিশুদের খেলার ব্যাপারে মা-বাবারা যেন শিশুর খেলার প্রবণতাকে অহেতুক অবদমন না করেন। আবার খেলনার বোঝা চাপিয়ে দিয়ে শিশুর ক্ষমতার বাইরে যেন তাকে খেলায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা না হয়। অবদমন ও আতিশয্য উভয়ই ক্ষতিকর। শিশুর ক্ষমতা অনুযায়ী খেলার সামগ্রী তাকে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে ঘরের ফেলে দেওয়া সাধারণ জিনিস দিয়েই খেলার সামগ্রী তৈরী হতে পারে। এর জন্য খুব দামী জিনিসের দরকার নেই। শিশুর বয়স অনুযায়ী যখন যেরূপ খেলার প্রয়োজন তখন সেরূপ খেলার সুযোগ তাকে দিতে হবে। যদি দেখা যায় কোনও একটা বিশেষ ধরণের খেলায় শিশু বেশিদিন আবদ্ধ হয়ে আছে, বয়স বাড়া সত্ত্বেও সে ছোটদের মত খেলছে, তাহলে এ ব্যাপার সম্বন্ধে ভাবতে হবে। দরকার হলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। কারণ এরূপ ঘটনা শিশুর বিকাশের ধারায় কিছু ব্যাঘাতের ইঙ্গিত দেয়।

খেলার সময় শিশুদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে হবে। তাদের খেলার ব্যাপারে অযথা হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয়। খেলার নিয়ম-কানুন শিশুদেরই ঠিক করতে দিতে হবে। অনেক সময় খেলার মধ্যে শিশুরা ঝগড়া বিবাদ করে। এ সকল সমস্যার সমাধান যতদূর সম্ভব শিশুদের উপরই ছেড়ে দিতে হবে। প্রয়োজন না হলে এ ব্যাপারে বড়দের অযথা নাক গলান ঠিক নয়। 'এটা করো', এভাবে করো,' খেলার মধ্যে সবসময় এরকম নির্দেশ দেওয়াও ঠিক নয়, এতে শিশুরা খেলার ব্যাপারেও পরনির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে।

মনে রাখতে হবে শিশুর জীবনে খেলা খাওয়ার মতই একটি প্রয়োজনীয় ব্যাপার। তাই এ ব্যাপার যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তার দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

শিশুর ক্রোধ

খুব ছোট শিশু, শুয়ে আছে, হাত-পা নাড়ছে, মাথা ঘুরিয়ে চারদিক দেখার চেষ্টা করছে। তার এই অঙ্গ-সঞ্চালনে বাধার সৃষ্টি করলেই দেখা যাবে যে সে কেঁদে উঠছে অথবা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য দম বন্ধ করে ফেলছে। তার মুখ লাল হয়ে উঠছে। এইভাবে সে তার বিরক্তি ও রাগ প্রকাশ করে।

অল্প বয়সের ছেলে-মেয়েদের সম্বন্ধে তাদের মা-বাবাকে বলতে শোনা যায়, "ওর ভীষণ রাগ", "নিজের মর্জি মত চলবে", "যা করবে তো করবেই", ইত্যাদি। আসল কথা তাঁরা বলতে চাইছেন, তাঁদের ছেলে-মেয়েদের রাগ অত্যন্ত বেশি। তাঁরা এই সমস্ত রাগী ছেলে-মেয়েদের যে কীভাবে মানুষ করবেন তা ভেবেই ঠিক করতে পারেন না। কখনও তাঁরা ছেলে-মেয়েদের উপর আরও কঠোর শাসন প্রয়োগ করেন, মারধর করেন, বকাবকি করেন, শাস্তি দেন; আবার কখনও তাদের নানা ভাবে তোয়াজ করেন, তাদের রাগের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন। এই দুই পদ্ধতির ফলই হয় হিতে বিপরীত। ফলে শিশুর ব্যবহারে দেখা দেয় নানা অশোভনতা, অস্বাভাবিকতা।

শিশুর ক্রোধ বা রাগের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া বুঝতে গেলে আমাদের ক্রোধের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার। Dictionary of Philosophy and Psychology-তে (Ed. : James Mark Baldwin ; Vol. I ; Copyright ; MacMillan ; 1960) ক্রোধ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "A painful emotion essentially characterized by the tendency to destroy or to break down opposition." সেখানে আরও বলা হয়েছে যে ক্রোধ হল মানুষের আদিম প্রক্ষোভগুলির (emotion) মধ্যে অন্যতম। ক্রোধের সাথে ভয়ের একটা বিশেষ যোগ রয়েছে। ভয়ের পরিস্থিতিতে আত্ম-

সৃষ্টিছাড়া প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। কিন্তু উৎকণ্ঠার প্রকাশের মধ্যে এরূপ কোন আনুপাতিক সামঞ্জস্য থাকে না। সেখানে প্রতিক্রিয়াটি খানিকটা সৃষ্টিছাড়া গোছের হয়। যেমন কারুর যদি সন্দেহ হয় যে ঘরে আরশোলা আছে, তাহলে সে উৎকণ্ঠায় বিনিদ্র রজনী যাপন করতে পারে। অথবা কোন কারণে কোন শিশুর যদি আশঙ্কা হয় তার মা তাকে ফেলে বেড়াতে যাবে তাহলে শিশুটি উদ্বিগ্ন হয়ে সারাক্ষণই মায়ের আঁচল ধরে ঘোরার চেষ্টা করে এবং ঘ্যানর ঘ্যানর করতে পারে। মূলতঃ শিশুর জীবনে উৎকণ্ঠার আবির্ভাব হয় মাকে কেন্দ্র করে, মায়ের ভালবাসা হারাবার ভয়ের থেকে।

উৎকণ্ঠা আবার কখনও কখনও আতঙ্কের (Phobia) মধ্যে প্রকাশ পেতে পারে। কোন বিশেষ বস্তু বা পরিস্থিতির প্রতি অযৌক্তিক এবং নিরন্তর ভয়ের নামই আতঙ্ক। যেমন স্কুলের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় পরীক্ষার আতঙ্ক। ফ্রয়েডের মতে মনের আভ্যন্তরীণ উৎকণ্ঠা যখন বাইরের কোন নির্দিষ্ট বস্তুকে কেন্দ্র করে প্রকাশ হতে থাকে তখন তাকে আতঙ্ক বলা চলে। এ যেন আভ্যন্তরীণ ভয়ের বাহ্যিক রূপান্তর। চরিত্রের দিক থেকে ভয় ও আতঙ্ক খুব কাছাকাছি প্রক্ষোভ। এই কারণেই শিশুর মনের ভয়, উৎকণ্ঠা ও আতঙ্কের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা কঠিন। জন্তু-জানোয়ার, অন্ধকার প্রভৃতির প্রতি শিশুর ভয়কে অনেকে ভয় না বলে আতঙ্ক বলেছেন; কারণ শিশুর ভয়ের উৎস সম্বন্ধে বস্তুগত যৌক্তিকতা অপেক্ষা ব্যক্তিগত (subjective) অযৌক্তিকতাই বেশি। এ জাতীয় ভয়ের মধ্যে শিশুর মানসিক দ্বন্দ্বই বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। যেমন—কোন শিশু যদি দীর্ঘদিন ধরে একটা কুকুর দেখে অস্বাভাবিক রকমের ভয় পায়, তাহলে বুঝতে হবে যে কুকুরের ধারণার সাথে তার অবচেতন মনে অন্য কোন ধারণা যুক্ত হয়ে আছে। কুকুর তার মনে অন্য কোন ধারণাকে উদ্দীপিত করে, যে ধারণাটি তার কাছে মোটেই প্রীতিকর নয়। ফলে তার মনে উৎণ্ঠার সঞ্চার হয়।

নিবারণ ও প্রতিকারঃ আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে শিশুমনে কিছুটা ভয়ের অস্তিত্ব স্বাভাবিক। মানব-মনের গঠন ও বিকাশ-ধারার মধ্যে এর উৎস নিহিত। বড় হওয়ার সাথে-সাথে শিশু এই স্বাভাবিক ভয়কে জয় করে বা অতিক্রম করে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে ভয়সমূহ শিশু তার পরিবেশ থেকেই গ্রহণ করে। এমন কি আমাদের সামাজিক কাঠামো বহুলাংশেই এই ভয়ের উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। সমাজ-ব্যবস্থাই ভয়ের প্রশ্রয় দেয়, ভয় পেতে শেখায়। সমাজ শাস্তির ভয় দেখিয়ে, বা তার অনুমোদন প্রত্যাহারের ভয় দেখিয়ে মানুষকে সামাজিক আচরণ করতে বাধ্য করে। কাজেই দেখা যায় যে সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থাই তার নিজের উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্য যেন ভয় দেখাবার ষড়যন্ত্র করছে। বর্তমান জগতে কোন সমাজ-ব্যবস্থাই এই ভয়কে পরিহার করে চলতে পারছে না। বর্তমান জগতের সমাজ-ব্যবস্থাসমূহে এই ভয়ের নিশ্চয়ই কিছুটা প্রয়োজন আছে। তাই বলে একটা সমাজ-ব্যবস্থা যদি পুরোপুরিই ভয়ের উপর নির্ভর করে, তাহলে সেই সমাজ-ব্যবস্থায় গভীর স্বাস্থ্যহানি দেখা দিতে বাধ্য। তাই পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় ভয়কে যথাসম্ভব পরিহার করে চলার চেষ্টা কর্তব্য। গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার আদর্শ ভয়শূন্যতা। এরূপ সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের মনকে ভয়শূন্য করে তোলার চেষ্টা করা হয়। গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে নির্ভীক মানুষের উপর।

সামাজিক ক্ষেত্রেও কোন ব্যক্তি-মানুষের আচরণের অধিকাংশই যদি ভয়-সঞ্জাত হয়, তাহলে তার মধ্যে প্রভূত পরিমাণে মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার ইঙ্গিত রয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। সুতরাং শিশু লালন-পালনের ক্ষেত্রে ভয়কে কাজে লাগানোর নীতির উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করা পাশবিকতা বা বিচার বুদ্ধিহীনতারই পরিচায়ক।

আমরা কামনা ও ক্রোধের জালে আটকা পড়তে থাকি। তাই এরূপ বলতে শোনা যায়, "মাসে পাঁচ হাজার টাকা না হলে বাঁচব কী করে", "ঘরে ফ্রিজ না থাকলে চলবে কী করে।" অর্থাৎ বক্তা এখানে তার মনের বিভিন্ন বাসনার বস্তুর সাথে নিজের সত্বাকে মিশিয়ে ফেলেছেন। ঐ বস্তুর অভাবই তাঁর অস্তিত্বের অভাব। এরূপ অস্তিত্ব নাশের আশঙ্কা বা ভয় থেকেই ক্রোধ জন্মে। আশঙ্কা ও ভয়ের মধ্যে থাকে একটা অস্বস্তি। এই মানসিক অস্বস্তিই ক্রোধের উৎপাদন ঘটায়। তাই কারুর ইচ্ছা বা কামনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধ্যান-ধারণা, সম্মান, অহংকার প্রভৃতিতে আঘাত (তার মতে) আসলেই সে ক্রুদ্ধ হয়।

এখন দেখা যাক উপরের এই বক্তব্য শিশুদের ক্ষেত্রে কীভাবে প্রযোজ্য। শিশুর অস্তিত্ব-বোধে বিপর্যয় দেখা দেয় তার শরীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবের মধ্যে। তাই শিশু ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতিতে ক্রুদ্ধ হয়। খুব ছোট শিশু তার মল-মূত্রের বেগের জন্যও ক্রুদ্ধ হয়; এক-ভাবে শুয়ে থাকার অস্বস্তির জন্য, পোশাক পরাবার অস্বস্তির জন্য, খাওয়া, মলমূত্র ত্যাগ সম্পর্কে সুঅভ্যাস গড়ে তোলার কর্ম্মসূচার জন্য, এমন কি তার অঙ্গ-সঞ্চালনে বাধা জনিত অস্বস্তির জন্যও শিশু ক্রুদ্ধ হয়। শিশুদের মূল্যবোধগুলি বড়দের মত নয়। তাই তাদের কামনা-বাসনাও বড়দের মত নয়। তাই বলে তাদের কোন কামনা বা ইচ্ছা নেই তা নয়। তাদের কামনা ব্যাহত হলে তারা অস্বস্তি বোধ করে ও ক্রুদ্ধ হয়। তাদের কাম্য বস্তুর অভাব তাদের মনে নিজের অস্তিত্ব-বোধে বিপর্যয় ঘটায়। কারণ শিশুরাও তার কাম্য বস্তুর সাথে নিজের সত্বাকে মিশিয়ে ফেলে। তাই খুব ছোট শিশুর হাতের চুষিকাঠি সরিয়ে নিলে কেঁদে ওঠে, মুখ থেকে মায়ের স্তন অথবা দুধের বোতল সরে গেলে কেঁদে প্রতিবাদ জানায়।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে রাগ বা ক্রোধ একটি অস্বস্তিমূলক প্রক্ষোভ; একটি বেদনাদায়ক মানসিক বৃত্তি। এর প্রকাশ আমরা দেখতে পাই মানুষের আচরণের মধ্যে এবং তার কিছু কিছু আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক

শারীরিক পরিবর্তনের মধ্যে। শিশুর জীবনে সর্ব্বপ্রথম ক্রোধের অভিব্যক্তি ঘটে তার কান্নার মধ্য দিয়ে। বয়স বাড়ার সাথে-সাথে এই অভিব্যক্তির রূপান্তর ঘটে। এক বছর বয়স প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে শিশুর রাগের অভিব্যক্তির মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে না। হঠাৎ বিস্ফোরণের মত একটি অভিব্যক্তি হিসাবেই দেখা দেয় প্রথম। তারপর ধীরে ধীরে এই অভিব্যক্তি একটি সুনির্দিষ্ট রূপ নেয়। তিন চার বছর বয়স থেকেই শিশুর রাগের অভিব্যক্তি ঘটে কোন বস্তু বা ব্যক্তি অথবা কোন প্রতিবাদস্পৃহাকে কেন্দ্র করে।

শিশুদের রাগের অভিব্যক্তির আর একটি বিশেষত্ব হল, তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাগ প্রকাশ করে মৌখিক (verbal) ভাবে। যেমন অপরকে গালাগালি দেওয়া, যার উপর রাগ হয়েছে তার প্রতি নিজের অপছন্দ প্রকাশ করা, নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা। রেগে গেলে শিশুদের বলতে শোনা যায়, "তুমি ভাল না", "তোমার জিনিস চাই না", "আমি তোমার কাছে থাকব না", "আমি তোমার চেয়ে ভাল", "আমার পুতুল তোমার পুতুলের থেকে অনেক ভাল", "তোমার থেকে আমার বেশি খেলনা আছে", "আমি তোমাকে মেরে ফেলতে পারি" ইত্যাদি।

এক বছর বয়সের পর থেকেই শিশুরা খাওয়ান, স্নান করান, পোশাক পরান প্রভৃতি ব্যাপারে শারীরিক অস্বস্তি বোধ করলেই রেগে যায়। এই সময় পায়খানা প্রস্রাব করার ব্যাপারে অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যও শিশুদের রাগের সম্মুখীন হতে হয়। সজোরে কান্নার মধ্য দিয়ে তারা এই রাগ প্রকাশ করে। এই সময় শিশুরা অপরিচিত পরিবেশের সম্মুখীন হলেও রাগ প্রকাশ করে। মায়ের কোল থেকে অপরিচিত কেউ কোলে নিলে তারা বিরক্ত বোধ করে। এরপর আরও একটু বড় হলে নিজের পছন্দ মত খেলা-ধূলা, চলা-ফেরায় বাধা পড়লে, খেলার সাথীদের সাথে মত পার্থক্য হলে শিশুদের রেগে যেতে দেখা যায়। বাড়ীতে নতুন শিশুর আবির্ভাব শিশুর ক্রোধের একটি বিশেষ

কারণ। এই সময় থেকেই শিশু তার ক্রোধ কান্না, প্রতিবাদ বাক্য, জিনিষপত্র নষ্ট করা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে।

শিশুর ক্রোধের প্রথম অভিব্যক্তি ঘটে তার মায়ের (অথবা মায়ের বিকল্প) বিরুদ্ধে ; মা তাকে ঠিক সময় মত না খাওয়ালে, তার শারীরিক কষ্ট দূর না করলে, তাকে যথোপযুক্ত আদর না করলে, তাকে একা ফেলে রেখে চলে গেলে, অর্থাৎ শিশু তার পছন্দ মাফিকভাবে মাকে না পেলেই ক্রুদ্ধ হয়। এরপরই আসে প্রায় অনুরূপ কারণে বাবার বিরুদ্ধে (অথবা বাবার বিকল্প) রাগ। তারপর দাদা-দিদি ও বাড়ীর অন্যান্য নিকট জন। অর্থাৎ শিশু তার কামনা-বাসনা ও স্বাচ্ছন্দ্যে বাধা পেলেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোকের বিরুদ্ধে রেগে যায়। সে যতই বড় হয় ততই তার সম্পর্কের পরিধি মা-বাবাকে অতিক্রম করে বাইরের জগতে পরিব্যাপ্ত হতে থাকে, ততই তার রাগের স্থান-বিন্দুগুলিও চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কিশোর বয়সে এই পরিব্যাপ্তি বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মা-বাবা থেকে শুরু করে শিক্ষক, আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবেশী, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, পরিবেশ, প্রাকৃতিক ঘটনা প্রভৃতি পর্যন্ত এই ক্রোধের দিগন্ত প্রসারিত হয়। যেমন কিশোর ছেলে-মেয়েদের কেউ বিরক্ত করলে, তাদের প্রতি কেউ অযৌক্তিক হলে, তাদের সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বললে, অপরের প্রতি অন্যায় আচরণ দেখলে, তাদের উপর খবরদারী করলে, তাদের মর্যাদার হানী ঘটালে, অহেতুকভাবে তাদের স্বাধীনতা খর্ব করলে, অহেতুকভাবে তাদের সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করলে, তাদের ক্ষমতায় অনাস্থা দেখালে তারা ভীষণ রেগে যায়।

কল্পনা ও মনঃসৃষ্টি (phantasy) শিশুদের ক্রোধ প্রকাশের মাধ্যম ; বিশেষ করে শিশুরা যখন বড়দের উপর রাগ করে তখন তারা নানা কাল্পনিক পরিস্থিতি, বিভিন্ন মনশ্চিত্র ও কাল্পনিক খেলার পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তাদের রাগ প্রকাশ করে। এর কারণ বড়দের ক্ষমতার সাথে তুলনায় নিজেদের ক্ষমতাকে তারা নিতান্তই তুচ্ছ মনে করে এবং বড়দের প্রতি রাগ প্রকাশের পথে ন্যায়-নীতির বাধা অনুভব করে। এইজন্য পুতুল-

খেলা শিশুর রাগ প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি উপযোগী মাধ্যম। ব্যবহারিক জীবনে সে যে রাগ প্রকাশ করতে পারে না, পুতুল খেলার জগতে সে সেই রাগ প্রকাশের সুযোগ পায়। আজকাল এই জাতীয় খেলাকে শিশুর প্রক্ষোভজনিত অনেক মানসিক অসুবিধার চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

।শশুর রাগ প্রকাশের ব্যাপারে অনেক সময় আর একটি বিশেষত্ব দেখা যায়। যার উপর রাগ সব সময় ঠিক তার প্রতিই রাগ প্রকাশ না করে তারা অন্য ব্যক্তি বা বস্তুর উপর রাগ প্রকাশ করে। অর্থাৎ ক্রোধের স্থানান্তরকরণ শিশুদের ক্রোধ প্রকাশের একটি বিশেষ ভঙ্গী। যেমন মায়ের উপর রাগ হয়ে নিজের খেলার মা-পুতুলটাকে ভেঙ্গে ফেলতে পারে, মায়ের দেওয়া কোন জিনিস নষ্ট করতে পারে। বাবার উপর রাগ করে বাড়ীর কুকুরটাকে পীড়ন করতে পারে। নবজাত ছোট ভাই বা বোনের উপর রাগ করে সদ্য আনা খেলনাটা নষ্ট করতে পারে। মল-মূত্র ত্যাগ করে জামা-কাপড় ও বিছানা নষ্ট করা, এও শিশুর রাগ-জনিত কারণে হতে পারে।

অনেক সময় শিশুদের ক্রোধের বশে চুপ করে থাকতে দেখা যায়। যার উপর রাগ তার সাথে কথা না বলা, নানা ব্যাপারে অসহযোগ করা ও জিদ প্রকাশ করা শিশুর রাগ প্রকাশের অপরাপর উপায়।

আমাদের সামাজিক সংস্কার ও ধ্যান-ধারণাকে আশ্রয় করেও শিশুরা অনেক সময় ক্রোধ প্রকাশ করার সুযোগ পায়। যেমন বিজাতীয় লোকের প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধ। অপর সম্প্রদায়ের লোকের প্রতি ক্রোধ, যুদ্ধের সময় শত্রু দেশের প্রতি ক্রোধ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে শিশুরাও তাদের ক্রোধ প্রকাশ করার সুযোগ পায়। এসব ক্ষেত্রে শিশুদের স্থানান্তরিত ক্রোধ-প্রকাশের সুযোগ ঘটে। যার প্রতি তার রাগ, তার প্রতি রাগ প্রকাশিত না হয়ে স্থানান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সামাজিক শত্রুর প্রতি ক্রোধ প্রকাশিত হতে দেখা যায়। যেমন বারো-তেরো বছর বয়সের একটি কিশোরকে দেখা গেছে ডাকাতদের উপর ভয়ানক

রাগ। খেলার ছলে সে ডাকাত মারে। স্বপ্নে ডাকাতের সাথে যুদ্ধ করে। ডাকাতের সাথে যুদ্ধের ছবি আঁকে। অবশেষে. মনঃসমীক্ষার সাহায্যে দেখা গেল যে ডাকাত আর কেউ নয়, তার বাবা। বাবার প্রতি রাগ সে ডাকাত মারার কল্পনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছে। বড়দের অধিকতর শক্তির প্রতি শিশুদের একটা ভয় থাকে। এছাড়া ক্রোধকে আমাদের সমাজ-সংস্কৃতিতে খুব নিম্নমানের রিপু বলে পরিগণিত করা হয়। যার ক্রোধ নেই তাকে মহৎ বলে আখ্যাত করা হয়। গুরুজনদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা খুব অন্যায় বলে বিবেচনা করা হয়। এই সকল বোধ ক্রোধ-স্থানান্তরকরণে বা অবদমনে সহায়তা করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে অবদমিত ক্রোধ শিশু মনের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিতে হবে। রোগ দীর্ঘ দিন স্থায়ী হলে তার আরোগ্যের পথও দীর্ঘতর হবে।

অনেক কিশোর বয়সের ছেলে-মেয়েদের দেখা যায় যে তাদের মেজাজ যেন অধিকাংশ সময়ই পঞ্চমে চড়ে আছে। তাদের দাবী, বায়না, অভিযোগ ও অনুযোগের অন্ত নেই। একটুতেই তাদের সাথে অপরের খিটিমিটি লাগে। সব ব্যাপারে তারা তর্ক করে। কোন কিছুতেই তাদের তুষ্টি নেই।

আবার আর এক দল শিশুকে দেখা যায় যে তারা জিনিস-পত্র নষ্ট করে। নিজের বই, খাতা, পেন্সিল, জামা-জুতো প্রভৃতি ব্যবহারের জিনিস মাত্রাধিক ভাবে নষ্ট করে। ফড়িং, প্রজাপতি, পিঁপড়ে, বাড়ীর পোষা পাখী বা জন্তুর প্রতি নির্দয় ব্যবহার করে।

তৃতীয় এক দল শিশুকে লক্ষ্য করা যায় যে তারা যেন নিজেদের ক্ষতি করতে ব্যস্ত। এরা রাগ হলে অনেক সময় শক্ত জিনিসের সাথে নিজের মাথা ঠোকে। এরা এমন ভাবে চলাফেরা করে যাতে নিজের শরীরে আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকে। এই ভাবে এরা যেন পরোক্ষ ভাবে নিজেকে শাস্তি দিতে ব্যস্ত।

এই সকল প্রকার শিশুর ক্ষেত্রেই বুঝতে হবে যে এরা রাগ অবদমিত করেছে বা যথাস্থানে ব্যক্ত করতে অক্ষম। রাগ অবদমনের ফলে শিশুদের অনেক সময় চুপচাপ হয়ে যেতে দেখা যায়। আমরা অনেক সময় ভুল করি, বুঝি বা শিশু খুব শান্ত-শিষ্ট হয়েছে। এরূপ ভুলের পরিণাম বেদনাদায়ক হতে পারে।

অবদমিত ক্রোধের জন্য শিশুকে অনেক সময় শারীরিক রোগেও ভুগতে দেখা যায়। কোন-কোন পেটের রোগ, অক্ষুধা, মাথাধরা, গায়ে ফুসকুড়ি বের হওয়া, বমি, তোতলামী, হাঁপানি প্রভৃতি রোগ অনেক সময় অবদমিত রাগের প্রতিক্রিয়া রূপে দেখা দিতে পারে। একটি সতেরো-আঠারো বছর বয়সের ছেলের ফিট এবং ডান হাত অবশ (paralysis) হয়ে যাওয়ার পিছনে এরূপ কারণ পাওয়া গিয়েছিল। ঐ ছেলেটি মনঃসমীক্ষা চিকিৎসার দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছে। বড়দের অনেক শারীরিক ব্যথা, যেমন বাত, আরথ্রাইটিস প্রভৃতি রোগ অনেক সময় অবদমিত ক্রোধজনিত কারণে হতে দেখা গেছে। ক্রোধ-জনিত কারণে দীর্ঘ দিন ধরে রুদ্ধ-বাক্ রোগে ভুগতে দেখা গেছে।

অপরাপর প্রক্ষোভের মতই ক্রোধেরও আমাদের শরীরের উপর বিশেষ প্রভাব রয়েছে। আমাদের অভ্যন্তরে ছ'টি কিডনির উপরের পাশের দিকে ছ'টি গ্রন্থি (gland) রয়েছে। এই গ্রন্থি ছ'টির নাম এ্যাড্রিনাল (adrenal) গ্রন্থি। এই গ্রন্থি ছ'টি আমাদের শরীরের স্বতঃ-ক্রিয় নার্ভ-তন্ত্রের (autonomic nervous system) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিশেষ প্রক্ষোভজনিত পরিস্থিতিতে, যেমন ক্রোধের পরিস্থিতিতে, নার্ভ-তন্ত্র কর্তৃক এই গ্রন্থি ছ'টি সক্রিয় হয়ে ওঠে। তখন গ্রন্থির অভ্যন্তর অংশ থেকে, যার নাম মেডুলা (adrenal medulla), ছই প্রকারের হরমোন (hormone) নিঃসৃত হয়। এই হরমোন ছ'টির নাম এ্যাড্রিনালিন (adrenaline) এবং নরএ্যাড্রিনালিন (noradrenaline)। এই গ্রন্থি-রস-সমূহ আমাদের শরীরের রক্ত-প্রবাহের সাথে মিশে গিয়ে শরীরে নানা প্রকারের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। প্রথমটির প্রভাবে আমাদের

যকৃৎ (liver) থেকে প্রচুর পরিমাণে শর্করা (sugar) নিঃসৃত হয়ে রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়িয়ে তোলে। ফলে শরীরে রক্তের চাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়. নাড়ীর গতি দ্রুত ও সতেজ হয়; ফুসফুসে বাতাস অনুপ্রবেশের পথের আয়তনের বৃদ্ধি হয় যাতে অধিক অক্সিজেন ফুসফুসে যেতে পারে; চোখের তারা-রন্ধ্র (pupil) বড় হয় যাতে তার মধ্য দিয়ে অধিক আলো প্রবেশ করতে পারে। শরীরে, বিশেষ করে হাতের তালুতে ঘাম দেখা দেয় এবং শরীরের তাপ-মাত্রা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আবার নরএ্যাড্রিনালিন রসের প্রভাবে শরীরের বহির্ভাগে (surface) রক্তবাহ (blood vessel) সমূহ সঙ্কুচিত হয়, যার ফলে প্রয়োজনীয় অঙ্গে রক্ত সরবরাহ ও প্রবাহ বেশি হতে পারে। শরীরের অভ্যন্তরে এই সকল পরিবর্তন হয়ে থাকে রাগের মুহূর্তের জরুরী অবস্থার সাথে শারীরিক দিক থেকে খাপ খাওয়াবার জন্য। রাগের মুহূর্তের মানসিক অবস্থার সাথে-সাথে শরীরে এই সকল পরিবর্তন দেখা না দিলে ব্যক্তি তার রাগ-প্রকাশ করতে পারত না, প্রতিপক্ষকে আঘাত করতে পারত না; ফলে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে অসুবিধা হত। কাজেই ক্রোধের সাথে শরীর-যন্ত্রের এই নিবিড় যোগ প্রজাতির বেঁচে থাকার তাগিদেই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সাধিত হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে আবার বিপদও নিহিত রয়েছে। ক্রোধ যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, একটা ক্রোধের-মানসিকতা যদি দীর্ঘ দিন ধরে চলতে থাকে, তাহলে তার প্রভাবে শরীরের আভ্যন্তরিক পরিবর্তনসমূহও দীর্ঘস্থায়ী হয়। দীর্ঘকাল ধরে শরীর-যন্ত্র তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না। আভ্যন্তরিক জরুরী অবস্থা চলতেই থাকে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট আন্তরযন্ত্র সমূহের উপর চাপ দীর্ঘস্থায়ী হয় ও সেগুলির টিস্যু (tissue) সমূহ ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্থ হতে থাকে। এই কারণেই দীর্ঘস্থায়ী ও অবদমিত ক্রোধের ফলে গ্যাসট্রিক আলসার, পেপটিক আলসার, রক্ত-চাপ, মাথাধরা, কোলাইটিস, হাঁপানি প্রভৃতি রোগ দেখা দিতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী ক্রোধের ফলে হৃৎপিণ্ড-সম্পর্কীয় অসুখও দেখা দিতে পারে। কারণ

এ্যাড্রিনালিন রস রক্তকে দ্রুত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে যে দীর্ঘস্থায়ী রাগের মানসিকতা শরীরের উপর যে চাপ সৃষ্টি করে তার ফলে ব্যক্তির বা শিশুর অন্য কোন রোগের অরোগ্যের পথে এবং সুস্থ শারীরিক বিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি হতে পারে।

মানব শিশু জন্মাবার প্রায় ছয় মাস পর থেকেই মায়ের অস্তিত্বকে নিজের অস্তিত্ব থেকে আলাদা ভাবে বুঝতে শেখে। এই সময় থেকেই শিশু তার মাকে সব সময়ের জন্যই নিজের কাছে রাখতে চায়, কারণ এই মায়ের কাছ থেকেই তার সব রকমের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আসে। তাই মাকে সে নিজের পছন্দমত ভাবে না পেলে ক্রুদ্ধ হয়। এই ক্রোধের আবির্ভাব প্রতিটি মানব শিশুর ক্ষেত্রেই অপরিহার্য। বাস্তব পরিবেশে কোন শিশুর পক্ষেই তার মাকে ষোল আনা ভাবে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই ক্রোধ মানব-মনের বিকাশ ধারায় একটি অপরিহার্য সংযোজন। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সাথে-সাথে ক্রোধ-ভালবাসার সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে তার অহং (ego) শক্তির বিকাশ হতে থাকে। সে-দিক থেকে ক্রোধ মানব-মনের বিকাশ-ধারার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু এই ক্রোধই আবার বিপথ-গামী হলে শিশু-মনের অপূরণীয় ক্ষাত করতে পারে। সব সময়ই লক্ষ্য রাখতে হবে যে শিশুর ক্রোধ যেন কখনই আয়ত্বের বাইরে চলে না যায়। শিশুর প্রতি আচরণে তার পরিবেশের লোকদের, বিশেষ করে মা-বাবাকে যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে তার ক্রোধ যেন অনবরতই উদ্দীপিত না হয়। যতটা সম্ভব ক্রোধ উদ্রেকের পরিস্থিতিগুলি পরিহার করতে হবে। ক্রোধ থেকে যদি একবার ঘৃণার আবির্ভাব হতে শুরু করে এবং তাকে যদি অপ্রতিহত গতিতে চলতে দেওয়া হয়, তাহলে কালক্রমে শিশু মনোবৈকল্যের অতল তলে তলিয়ে যেতে পারে। এরূপ ক্রোধ ক্রমেই শিশুকে বাস্তব থেকে দূরে সরিয়ে নেবে। আবার ক্রোধ যদি সব সময় প্রশ্রয় পায়, তাহলে শিশু নিজেকে সংযত করতে শিখবে

না। কাজেই শিশুকে সংযত হতে সাহায্য করার জন্য অনেক সময় শাসনেরও প্রয়োজন আছে।

আমরা বড়রা অনেক সময় মজা করার জন্য শিশুকে খেপিয়ে তুলি। শিশুকে অনর্থক ভাবে বিরক্ত করি। এতে আমরা মজা পেতে পারি, কিন্তু শিশুর মনে এর ফলে প্রকৃতই একটা রাগের সৃষ্টি হয়। বিনা প্রয়োজনে শিশুকে শরীর ও মনের দিক থেকে এরূপ অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ঠেলে দেওয়া নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

শিশুর মধ্যে ক্রোধের প্রকাশ দেখলেই ভয়ের কোন কারণ নেই। লক্ষ্য রাখতে হবে যে সেই ক্রোধ যেন শিশু ও তার মা-বাবা এবং অন্যান্য লোকজনের সাথে যোগাযোগের পথে কোন বাধার সৃষ্টি না করে। শিশু তার নিজের রাগকে নিজেই ভয় পায়। কারণ রাগের মুহূর্তে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। তাই তার রাগের পরিস্থিতিতে তার মা-বাবাকে তার এই নিয়ন্ত্রণের কাজে সাহায্য করতে হবে। শিশুর প্রতি আচরণে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তার মর্যাদায় কোন ক্রমেই আঘাত না লাগে। অপরের সাথে তুলনা করে তাকে অহেতুক ভাবে ছোট করা কখনই উচিত নয়। তার শারীরিক ও মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্যকর পরিস্থিতির সময় তাকে যথোপযুক্ত ভাবে সাহায্য করতে হবে। সর্বোপরি তার বাস্তববোধ জাগিয়ে তোলার দিকে বিশেষ যত্নবান হতে হবে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ভয়ের সাথে ক্রোধের একটা বিশেষ যোগ রয়েছে। বহু ক্ষেত্রেই ভয়ের থেকে, ক্রোধের জন্ম হতে দেখা যায়। কাজেই শিশুর জীবনে ভয়ের পরিস্থিতিগুলি পরিহার করে চলতে হবে। ছোট শিশুদের মায়ের ভালবাসা হারাবার একটা ভয় থাকে। মায়ের অথবা বাড়ার অন্যান্যদের আচরণের ফলে এই ভয় যাতে আরও শক্তিশালী না হয় তার দিকে নজর রাখতে হবে। কর্মরত মায়েদের ক্ষেত্রে এটি একটি বিশেষ সমস্যা। তাদের সন্তানেরা

মায়ের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হবার ভয়ে ভীত হয়। ফলে এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে তাদের মনে ক্ষোভ জমতে থাকে। এই ক্ষোভ তাদের নানা প্রকারের অস্বাভাবিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আত্ম-প্রকাশ করে। কখনও কখনও এই ক্ষোভকে অবদমন করে শিশুরা হতাশার সাগরে নিমজ্জিত হয়।

শিশুর শারীরিক অসুস্থতাও শিশুর মনে সহজেই ক্রোধ-সঞ্চারের কারণ হয়ে ওঠে। এই জন্যই শারীরিক দিক থেকে অসুস্থ শিশুদের খিটখিটে মেজাজের হতে দেখা যায়। কাজেই শিশুর ক্রোধের পিছনে কোন শারীরিক কারণ আছে কিনা তা প্রথমেই বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে শারীরিক অসুস্থতা দূর হলেই দেখা যাবে যে শিশুর রাগ অনেক কমে গেছে।

ক্রোধ একটি শক্তিশালী প্রক্ষোভ। একে নিয়ন্ত্রণে রেখে সৃজনাত্মক পথে পরিচালিত করতে পারলে এর দ্বারা মানুষের কল্যাণ হতে পারে। শিশুর মানসিক শক্তি যেন তার ক্রোধের মধ্যে অপচয় হয়ে না যায়।

শিশুর ভয়

"ভয় হতে তব অভয় মাঝে
নূতন জনম দাও হে ॥"

—রবীন্দ্রনাথ

"The only thing we have to fear is fear itself."
—Franklin D. Roosevelt.

(এক)

মা—, মা—, একটা পোকা, শিগ্‌গির মেরে ফেলো ; আমি যেতে পারছি না।" কালো রঙের একটা গুবরে পোকা দেখে চার বছর বয়সের তোতন ভয়ে স্থাণু হয়ে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। এ ঘর থেকে ও ঘরে কিছুতেই আর যেতে সাহস হচ্ছে না, কারণ যাওয়ার পথে পোকা। বর্ষার দিনে বাজ পড়ার আওয়াজ হলে তোতন ভয়ে তার মাকে জড়িয়ে ধরে। আট বছরের বুবুন কালীপূজার সময় আওয়াজের ভয়ে ঘরের কোণে গুটিশুটি মেরে বসে থাকে। ছয় বছরের বাবুন রাতে ঘরের বাতি নিভিয়ে দিলেই বড় কারুর গা ছুঁইয়ে থাকবে, সে অন্ধকারে ভয় পায়। একটা ভীত শিশুর আচরণ দেখলেই তার ভয়জনিত মানসিক দুরবস্থার কথা বুঝতে কারুর অসুবিধা হয় না। ভয়ের অভিজ্ঞতা আমাদের প্রত্যেকেরই আছে। কাজেই ভয়ের স্বরূপ বুঝতে আমাদের কিছুমাত্র বেগ পেত হয় না।

ভয় একটি মানসিক প্রক্ষোভ। মানুষের বিশেষ কতগুলি আচরণের মধ্য দিয়ে এর অভিব্যক্তি। ভয়ের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা এর নানা রকম বর্ণনা দিয়েছেন। জেমস ড্রেভার (James Drever) তাঁর A Dictionary of Psychology—

তে বলেছেন, ভয় হলো "One of the primitive, violent, and usually crippling emotions, marked by extensive bodily changes, and by behaviour of the flight or concealment character." ভয় আদিম প্রক্ষোভগুলির অন্যতম এবং পলায়নী আচরণের মধ্যে এর প্রকাশ। Encyclopedia of Psychoanalysis-এ-সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "Fear is the experience of unpleasure that is characterized by the anticipations of being overwhelmed by an internal or external force—where the object is known. The emotion of fear, along with the motoric and secretory discharges connected with it, is an affect experienced by the total personality." ভয়ের মধ্যে একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের অনুভূতি রয়েছে। ভীত মানুষ অন্তর্জগতের বা বহির্জগতের একটা নির্দিষ্ট শক্তি বা পরিস্থিতির কাছে অবিভূত হয়ে পড়বে বলে আশংকা করে। আরও অনেক মনোবিজ্ঞানী ভয়ের সংজ্ঞা অথবা বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা সকলই এ সকল বর্ণনারই অনুরূপ বা সামান্য এদিক-ওদিক।

ফ্রয়েডের (Freud) মতে শিশুর মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া একটা অস্বাচ্ছন্দ্যকর অভিজ্ঞতা। এর মধ্যে তার একটা অভিঘাতের (truama) অভিজ্ঞতা জন্মে। মাতৃজঠরের নিশ্চিন্ত, নিরাপদ ও আরামের আশ্রয় থেকে সে হঠাৎ একেবারে নতুন অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে আবির্ভূত হয়। আবির্ভাবের মুহূর্ত থেকেই তাকে সংগ্রাম করে বাঁচতে হয়। তাকে নিজে-নিজেই শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালাতে হয়; বাইরের তাপের তারতম্য সহ্য করতে হয় এবং আরও অনেক শারীরিক প্রক্রিয়া চালাতে হয়। মাতৃজঠরে অবস্থানকালে এসব ব্যাপারে তার কোনও দায়িত্ব থাকে না। সবটাই মাতৃনির্ভর। তাই জন্মগ্রহণ একটা ভীতিপ্রদ বেদনাদায়ক অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা। ফ্রয়েড একেই বলেছেন

"Primal anxiety of birth" ও 'birth trauma'। এই অস্বস্তির মধ্যেই ভয়ের জন্ম। এর অভিব্যক্তি শিশুর কান্নায়। কোন-কোন মনোবিজ্ঞানী আবার আরও অধিকদূর অগ্রসর হয়ে এরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে মায়ের মনের ভয়, উদ্বেগ ইত্যাদি প্রক্ষোভসমূহ ভ্রূণের মধ্যেও সঞ্চারিত হতে পারে ঃ এমন কি পিতা-মাতার মনের প্রক্ষোভসমূহ শুক্র (spermatazoon) ও ডিম্বাণুকেও (ovum) প্রভাবিত করতে পারে। জে. সেজার (J. Sadger) এই বিজ্ঞানীদের অন্যতম। মনোবিজ্ঞানী এল. বেণ্ডার (L. Bender) ভয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন তাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"When a child comes into the world he comes in lonely, and he is afraid." শিশুর জ্ঞানভাণ্ডার খুবই সীমিত। তার শরীরযন্ত্র ও মানসিক ক্ষমতাসমূহ পরিপূর্ণতা লাভ করে নি। তার পরিবেশ সম্বন্ধে সব কিছু বোঝার ক্ষমতা অতি অল্প ও দুর্বল। কিন্তু তা সত্বেও শিশুর মনের বিভিন্ন চাহিদা, ইচ্ছা, ভয়, ভালবাসা, ক্রোধ প্রভৃতির উদয় হতে বিলম্ব হয় না। শিশুর এই মানস-প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মনোবিজ্ঞানী সুসান আইজাকস্ (S. Isaacs)।

মনোবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে যে শিশুর শরীর-যন্ত্রের বিকাশ না ঘটলেও শিশুর আবেগজনিত অভিজ্ঞতা লাভের ক্ষমতা থাকে। মানুষের মস্তিষ্কের উপরিভাগ (cerebral cortex) সব কিছু আবেগ হৃদয়ঙ্গম করার স্থান। এই যন্ত্রের সাহায্যেই মানুষ জটিল উদ্দীপক সমূহের অর্থ উপলব্ধি করে থাকে ও বিভিন্ন আবেগজনিত প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব ঘটায়। শিশু অবস্থায় মানুষের এই যন্ত্রটি বিশেষভাবে অপরিণত থাকে। সেই অবস্থায় মানব শিশু-মস্তিষ্কের নিম্নতর কেন্দ্রের (lower centre) সাহায্যে আবেগের অনুভূতি লাভ ও তার প্রতিবেদন দানের কাজসমূহ চালিয়ে থাকে। জে. এইচ. মেছারম্যানের (J, H. Masserman) থ্যালামাস (thalamus) সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষায় এ ব্যাপার দেখা গেছে। যদিও শিশুর

আবেগজনিত ব্যবহারসমূহ বড়দের ব্যবহারের মত স্থির নিশ্চিত ছকে বাঁধা থাকে না ; শিশুর আবেগজনিত ব্যবহারের বহিঃপ্রকাশ ঘটে অত্যন্ত সোজাসুজি ভাবে।

ফ্রয়েডও বলেছেন যে শিশু তার অপরিণত শরীর ও মন নিয়ে এই ধরাধামে অত্যন্ত অসহায় অবস্থার ("Original helplessness of human being") মধ্যে আবির্ভূত হয়। মাতৃজঠরের ঘেরাটোপে সে থাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ। জন্ম-মুহূর্ত থেকেই সূচনা হয় তার অসহায়তার ও ভয়ের, যদিও মাতৃস্নেহের রক্ষা-কবচের সহায়তায় সে এই ভয় থেকে অভয়ে পৌছুতে পারে। ভয় মানুষের মনের একটি আদিম (archaic) অনুভূতি। বিবর্তনের সেই সুদূর অতীত পর্বে মানুষ যখন এই ধরিত্রীতে আবির্ভূত হয়েছিল তখন তার চারপাশে প্রচণ্ড শক্তিধর হিংস্র জন্তুসকল ও প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ বিরাজমান। প্রতিক্ষণেই তার অস্তিত্বনাশের সম্ভাবনা। বিপদের সম্ভাবনায় প্রতিক্ষণেই সে ভীত ও সন্ত্রস্ত। অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী প্রতিকূল শক্তির হাত থেকে বাঁচার জন্য তাকে ভীত হয়ে পলায়ন করতে হত। পলায়ন তার কাছে বেঁচে থাকার অন্যতম কৌশল হয়ে উঠল। তাই বোধ হয় দেখতে পাওয়া যায়, ভয়ের প্রকাশ পলায়নের মধ্যে। তাই ভয় মানুষের একটি স্বাভাবিক আবেগ। ভয়ের পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে মানুষ ভয় পাবে, এটাইতো স্বাভাবিক। ভয় পাবার প্রয়োজনীয়তা আছে। ভয় আত্মরক্ষার, বাঁচার সহায়ক। তাই বলা হয়েছে, "Normal fear is a danger. signal which increases the individual's ability to deal with an external danger" (Encyclopedia of Psychoanalysis)। কিন্তু এই ভয়ই আবার মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায় যদি সে বিনা প্রয়োজনে ভয় পায় ; যাকে ভয় পাওয়ার নয় তাকে, বা যে পরিস্থিতিতে ভয়ের কিছু নেই তাতে যদি ভয় পায়

তাহলে সেই ভয় মানুষের বাঁচার সহায়ক না হয়ে তাকে করে তোলে জীবন-মৃত। বিবর্তনের যে আদি পর্বে বিশ্ব-বিধাতা নানা ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়ে মানুষের মনকে গড়ে তুলছিলেন, ভয় সেই পর্বের সংযোজন। তাই একে আদিম আবেগ বলা হয়ে থাকে। ("A primitive and often intense emotion characterized by a systematic pattern of bodily changes those resulting from arousal of the sympathetic nervous system and by certain types of behaviour, particularly flight or concealment" – Encyclopedia of Psychology)। ভয় আমাদের মনের সংগঠনের মধ্যে রয়েছে। এ আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। এ একটি সহজাত আবেগ।

আগেই বলা হয়েছে, ভয় মানুষের জীবনে অস্বাভাবিক রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। শিশু বয়সে যে ভয় স্বাভাবিক ও যৌক্তিক, পরিণত বয়সে তার অনেকটাই অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক হয়ে দাঁড়ায়। অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক ভয় পরিণত মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বাধাস্বরূপ। সুস্থ ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য শিশুর ভয়গুলির ধীরে-ধীরে অবসান দরকার। তাই মানুষ বার-বার প্রার্থনা জানিয়েছে ভয় থেকে মুক্তি পাবার জন্য। তাই কবির প্রার্থনায় পাই ভয়শূন্য চিত্তে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার আকুতি—

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির,
..................ইত্যাদি

—(রবীন্দ্রনাথ)

মানবমনে ভয়ের স্বরূপ, বিস্তার ও গতি-প্রকৃতি যথাযথভাবে বিবেচনা করতে গেলে শিশুমনে এর আবির্ভাব ও ক্রিয়া-কলাপ পর্যবেক্ষণ করা দরকার। প্রথমে দেখা যাক শিশুরা কোন্-কোন্ পরিস্থিতিতে ভয় পায়।

মনোবিজ্ঞানী জে. বি. ওয়াটসন (J. B. Watson) বলেছেন যে শিশুরা সাধারণতঃ শব্দ বা গোলমাল এবং অবলম্বনের (support) অভাববোধ থেকে ভয় পায়। এ'দুটিই শিশুমনে ভয় সঞ্চারের মূল কারণ।

ও. ডি. হেব (O. D. Hebb) শিশুর ভয়কে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমতঃ যে সকল ভয় শব্দ, গোলমাল বা কোন রকম শারীরিক অস্বস্তি থেকে জন্মায়। দ্বিতীয়তঃ অন্ধকার, অবলম্বনের অভাব ও একাকীত্ব থেকে যে সকল ভয় সঞ্চার হয়। এবং তৃতীয়তঃ অনেক ভয় আছে যা শরীর ক্ষমতার অপ্রতুলতার জন্য বা শরীরযন্ত্রের গোলমালের জন্য দেখা দেয়।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিশুদের কোন-কোন ভয় সহজাত আবার অনেক ভয় শিশুরা বড়দের বা পরিবেশ থেকে পেয়ে থাকে। পরিবেশ থেকে বা বড়দের কাছ থেকে অনেক ভয়ই শিশুদের মনে সঞ্চারিত বা সংক্রমিত হয়।

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শিশুদের পর্যবেক্ষণ করলে তাদের মনে নানা কারণে ভয়ের উপস্থিতি দেখা যায়—

১। হঠাৎ শব্দের তারতম্য, গোলমাল বা চেঁচামেচি হলে খুব ছোট শিশু ভীত হয়ে পড়ে। শিশু ঘুমিয়ে আছে, হঠাৎ তার কাছে বসে জোরে কথা বললে, জোরে রেডিও চালালে, কোন জিনিস পড়ে যাওয়ার শব্দ হলে সে ভয় পেয়ে কেঁদে উঠতে পারে। এরূপ কারণে মাত্র কয়েক সপ্তাহ বয়সের শিশুরাও ভীত হয়ে পড়ে।

২। অনেক সময় আমরা আদর করে খুব ছোট শিশুদের কোলে করে দৌড়াই বা দ্রুত দোলা দিই (দোলনায় বা হাতে করে) ; এতেও খুব ছোট শিশুরা ভয় পায়।

৩। শিশু আর একটু বড় হলে (এক/দুই মাস) তার সামনা দিয়ে দ্রুত কোন লোক ছুটলে বা কোন জিনিস নাড়ালে সে ভয় পেতে পারে।

ভয়-নিবারণের ব্যাপারে প্রথমেই আমাদের নজর রাখতে হবে শিশুর প্রতি আচরণের দিকে। বিশেষভাবে মা-বাবার আচরণে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আমাদের নিজেদের কাজের সুবিধার জন্য যেন ভয় দেখিয়ে শিশুকে আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য না করা হয়। শিশুর অসুবিধা বুঝতে হবে, তার মনোভাব লক্ষ্য করতে হবে। যেমন শিশু খেতে চাইছে না, বা ঘুমাতে চাইছে না; তখন তাকে ভূত-প্রেত বা শাস্তির ভয় দেখালে সাময়িক ফল লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে এর ফল মারাত্মক হতে পারে।

শিশুর মৌলিক ভয়গুলি যাতে বেশি দিন স্থায়ী না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শব্দ বা গোলমালের ভয়, অন্ধকারের ভয়, অবলম্বনের অভাব বা পড়ে যাওয়ার ভয়, প্রভৃতি পরিস্থিতিগুলি যাতে শিশুর জীবনে যথাসম্ভব কম দেখা দেয় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ভয়ের ব্যাপারে শিশুর আত্মবিশ্বাসকে জাগিয়ে তোলাই শ্রেয়। ভয়ের উৎসের স্বরূপ তাকে বস্তুগত ভাবে বোঝার সাহায্য করতে হবে; তার যে ঐ পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতা আছে তা তাকে বুঝতে দিতে হবে। যেমন, একটা পোকা যে তার শারীরিক ক্ষমতার কাছে কিছুই নয়, পোকাটি একটা কিছুর সামান্য আঘাতেই যে অকেজো হয়ে পড়ে এটা তাকে দেখিয়ে দিতে হবে। অনেকে কোন কোন শিশুর ক্ষেত্রে ধীরে এবং বার বার শিশুকে ভয়ের পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে ভয়কে জয় করতে সাহায্য করার কথা বলেছেন; এতে অনেক সময় ভাল ফল পাওয়া যায়। যেমন, একটি শিশু ট্যাক্সিতে চড়তে ভয় পেত। ট্যাক্সির ভিতর উঠলেই সে ভয়ে ভীষণ চীৎকার করত। তার ভয় দূর করার জন্য প্রথমে তাকে দূর থেকে ট্যাক্সি দেখান হত। তার সমবয়সী অন্য শিশুরা ট্যাক্সিতে চড়ছে তা দেখান হত। পরে ধীরে ধীরে তাকে ট্যাক্সির কাছে নিয়ে যাওয়া হতে লাগল। ট্যাক্সির গায়ে হাত দেওয়া হত, তাকে হাত দিতে বলা হত। এইভাবে ক্রমে

স্থির ট্যাক্সির দু'ধারের দরজা খোলা রেখে তাকে নিয়ে ভিতরে বসা হতে লাগল। এবং পরে যখন বোঝা গেল যে তার ভয় কেটে গেছে তখন ট্যাক্সিতে চড়া হল।

ভয়ের মুহূর্তে শিশুকে সান্ত্বনা দিতে হবে। ভয়ের মোকাবিলা করার জন্য তাকে মানসিক সাহায্য দিতে হবে, তার মনে নিরাপত্তা-বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। শিশু যার উপর সব চাইতে বেশি নির্ভর করতে পারে, ভয়ের মুহূর্তে তাকেই সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

ভয় দূর করার ব্যাপারে সাধারণতঃ খেলা-ধূলা, ছবি-আঁকা প্রভৃতির উপযোগিতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। যেমন যে সকল শিশুরা স্কুলে যেতে ভয় পায় তাদের নিয়ে স্কুল-স্কুল খেলা, যারা অন্ধকারে ভয় পায় তাদের নিয়ে দিন-রাত্রি খেলা বা ভূত-ভূত খেলা, যারা গাড়ীতে চড়তে ভয় পায় তাদের নিয়ে গাড়ী-গাড়ী খেলা প্রভৃতিতে অনেক সুফল পাওয়া যেতে পারে। পুতুল খেলাকেও এরূপ প্রয়োজনানুযায়ী পরিকল্পনা করে নিতে হবে। ছবি আঁকা শিশুর আবেগ প্রকাশের একটি উপযোগী মাধ্যম। শিশু একটু বড় হলেই তাকে ছবি আঁকার জন্য উজ্জ্বল রং ব্যবহার করতে দিতে হবে। তাকে ইচ্ছামত ছবি আঁকতে দিতে হবে। অথবা দরকার হলে শিশুকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তার সামনে বসে বড়দের ছবি আঁকতে হবে। আবার প্রয়োজন হলে ছবির বিষয়বস্তু তাকে বলে দেওয়া যেতে পারে। একটি শিশু বেলুন ফোলানো দেখলে ভয় পেত। তার ভয় ছিল বেলুন ফেটে যাবে ও শব্দ হবে। তার শব্দের ভয় ছিল। তার এই ভয় দূর করার জন্য প্রথমে শিশুটির সামনে বেলুনের ছবি আঁকা হত। তারপর ছবিতে দেখান হল বেলুন ফেটে যাচ্ছে। এরূপ পদ্ধতিতে খুব ভাল ফল পাওয়া গিয়েছিল। ভয়ের বস্তু নিয়ে খেলা ও ছবি আঁকার মধ্যে শিশু ঐ বস্তুর সাথে একাত্ম অনুভবের একটা সুযোগ পায় এবং এভাবে সে ভয়কে জয় করে।

৪। শিশুর গায়ে হঠাৎ কোন নিবিড় স্পর্শ অনুভূত হলে, যেমন খুব ঠাণ্ডা হাতে হঠাৎ স্পর্শ করলে, বিশেষ করে শীতের দিনে, সে চমকে ওঠে বা ভয় পায়। তার গায়ে হঠাৎ চাপ পড়লে বা ভিন্ন রকমের স্পর্শ অনুভূত হলেও সে ভয় পেতে পারে।

৫। পাঁচ/ছ' মাস বয়স থেকে শিশুরা অপরিচিতকে ভয় পেতে থাকে। অপরিচিত লোক তার কাছে এলে, কোলে নিলে, অপরিচিত বা অদ্ভুত ধরণের জিনিস তার কাছে উপস্থিত করলে সে ভয় পেয়ে থাকে। এই ভয়ের মধ্যেই বোধ হয় বড়দের মনে নতুনের প্রতি (নতুন মতবাদ গ্রহণ, নতুন পরিস্থিতিকে মানা, নিজের সম্বন্ধে নতুন ভাবে বিবেচনা করা ইত্যাদি) ভয়ের বীজ সুপ্ত থাকে।

৬। শিশুরা পরিচিত জিনিসকে বিকৃত অবস্থায় দেখলে ভয় পায়। যেমন তার খেলার পুতুল হাত-পা ভেঙ্গে বিকৃত অবস্থায় পড়ে থাকলে।

৭। অদ্ভুত সাজ-পোশাক পরা লোক বা বহুরূপী, মুখোশ, অদ্ভুত ধরণের পুতুল বা মডেল প্রভৃতির সামনে ছোট শিশুদের উপস্থিত করলে তারা ভয় পেতে পারে।

৮। জন্তু-জানোয়ারের ভয়—কোন-কোন শিশু বিশেষ-বিশেষ জন্তুকে ভয় পায়। শিশু বয়সে কোন জন্তুর প্রতি ভয় দেখা দিলে সেই ভয় কাটিয়ে উঠতে বহুদিন সময় লাগে। এই ভয় কৈশোর পর্যন্ত চলতে পারে।

৯। অন্ধকারের ভয়—অধিকাংশ শিশুই এবং অনেক বয়স্ক ব্যক্তি অন্ধকারকে ভয় পায়। অন্ধকার দৃশ্যমান জগতকে আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফ্রয়েড অন্ধকারের ভয়, একাকী থাকার ভয় এবং অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি ভয়—এই তিন প্রকারের ভয়কেই প্রাথমিক ভয় বলেছেন। এই তিন প্রকারের ভয়কে তিনি আপনজন বা ভালবাসার জনকে (মা-বাবা অথবা অনুরূপ ব্যক্তি) হারাবার ভয়ের রূপান্তর হিসাবে পরিগণিত করেছেন। অন্ধকারে শিশু তার কাছের জিনিসও

দেখতে পায় না, তাই সে মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয় পায়। একাকী থাকলে বা মায়ের বদলে অপরিচিতকে দেখলে মাকে হারাবার ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। (কোন কোন মনোবিজ্ঞানীর মতে (যেমন ওয়াটসন), খুব ছোট শিশুদের অন্ধকারের ভয় থাকে না।) শিশু একটু বড় হলে, প্রায় দু' বছর বয়স হলে, অন্ধকারে থাকতে ভয় পায়। অন্ধকারের সাথে অন্য কোন ভয়ের উপসর্গ যুক্ত থাকে বলেই শিশুরা অন্ধকারে ভয় পায়। আসলে অন্ধকারে শিশুরা দেখতে পায় না। একে তার বাস্তববোধ অতি অল্প; তার উপর দৃষ্টি বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় সে পরিবেশ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করে, নিজেকে একাকী মনে করে। সে পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং নিজেকে বিপদগ্রস্ত মনে করে। এইভাবে অন্ধকার তার মনে ভয় এনে দেয়।

১০। মায়ের কাছ থেকে বিছিন্ন হওয়ার ভয়—এই ভয় শিশু-মনের একটি মৌলিক ভয়। প্রায় সকল শিশুই কোন না কোন সময় এরূপ ভয় পেয়ে থাকে। যেমন মা কিছু সময়ের জন্য তার কাছ থেকে অনুপস্থিত থাকলে, অসুস্থতার জন্য হাসপাতালে গেলে, বাড়ীতে নতুন শিশুর আবির্ভাব হলে সে এরূপ ভয় পেয়ে থাকে। শিশুকে যখন প্রথম বিদ্যালয়ে (নার্শারী) পাঠান হয় বা যদি অসুস্থতার জন্য তাকে একা হাসপাতালে থাকতে হয় তাহলেও সে এরূপ ভয়ে ভীত হয়ে পড়তে পারে। এক বছর বয়স থেকেই শিশুর মনে এরূপ ভয় দেখা দিতে পারে।

১১। তিন-চার বছর বয়স প্রাপ্ত হলেই শিশুর কল্পনার জগত বিস্তৃত হতে থাকে। এই সময় থেকে তার মনে ধীরে ধীরে নানারকম কাল্পনিক ভয় দেখা দিতে থাকে, যেমন—রাক্ষস, ভূত-পেত্নী, দৈত্য, পরী, ড্রাগন, ডাইনী, ডাকাত, ছেলেধরা ইত্যাদির ভয়। আমাদের প্রচলিত অনেক গল্প, রূপকথা শিশু-মনে ভয়সঞ্চারে সাহায্য করে। আমরা শিশুদের সহজে ঘুম পাড়াবার জন্য, খাওয়াবার জন্য এমন অনেক গল্প, বিকৃত

শব্দ প্রভৃতির আশ্রয় নেই যার উদ্দেশ্য শিশুকে ভয় দেখান। এর থেকে শিশুর মনে নানা রকম ভয়ের কল্পনা দেখা দিতে থাকে। এর সঙ্গে অন্ধকারের ভয় যুক্ত হয়ে ভয়ের কল্পনাকে আরও সতেজ করে তোলে।

১২। শিশু একটু বড় হলে তার মনে শারীরিক ক্ষয়-ক্ষতি বা আঘাতের ভয় এবং আগুন, জলে ডোবা ও দুর্ঘটনার ভয় দেখা দেয়। ধীরে ধীরে মৃত্যু সম্বন্ধেও তার মনে ভয় দেখা দেয়—তার নিজের মৃত্যু এবং তার মা-বাবা বা অন্য আপনজনের মৃত্যু।

১৩। শিশুর মনে বেশির ভাগ ভয়ই আসে তার মা-বাবা বা বাড়ীর অন্য বড়দের কাছ থেকে। মা-বাবার মনের ভয় শিশুর মনে সহজেই সঞ্চারিত হয়। আসলে এই ভয়ই বিশেষ করে শিশুর মানসিক বিকাশে ব্যাঘাত ঘটায়। অহেতুক ভাবে বড়রা শিশুকে নোংরা, শরীর খারাপ হওয়া, আঘাত পাওয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে ভীত করে তোলেন। এরূপ ক্ষেত্রে বড়দের ভয় ও উদ্বেগ শিশুদের মনে সঞ্চারিত হয়।

১৪। শিশুরা কিছুটা বড় হবার সাথে সাথে, বিশেষ করে কৈশোর বয়সে, সমাজে প্রচলিত নানা ধারণা থেকে কোন কোন ব্যাপারে ভয় পেতে শেখে। সকল সমাজেই নানা ব্যাপারে নানা প্রকারের সংস্কার অথবা টাবু (Taboo) প্রচলিত থাকে। এই সংস্কার ও টাবুগুলি সম্বন্ধে বা এ'গুলির বিরুদ্ধাচরণ সম্বন্ধে সব সমাজের শিশুরাই (বড়দের অনুকরণে) মনে মনে ভয় পোষণ করে। এটা খুবই স্বাভাবিক। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাবেও শিশুরা ভয় পেতে শেখে। কোন ধর্মীয় আচরণের ক্রটি ঘটলে পাপ হবে বা দেবতা অসন্তুষ্ট হবেন—এই সকল ধারণা শিশুদের মনে সমাজ-সংস্কারের প্রভাবে দেখা দিতে পারে। এইভাবে শিশুর মনে নানা অপার্থিব ভয় দেখা দিতে থাকে।

১৫। কৈশোর বয়সে ছেলে ও মেয়েদের শরীরে ও চেহারায় কিছু কিছু পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের ফলে শিশুর মনে

শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার অপ্রতুলতার বোধ জাগে। এই সময় সে প্রাক-কৈশোরের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। নিজের শরীরটাকে তার নিজের কাছেই বে-মানান মনে হতে থাকে। নতুন-নতুন মানসিক আবেগগুলি সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সচেতন হয়ে পড়ে এবং উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সে সন্দিহান হয়ে পড়ে। বিশেষ করে মনের যৌন আবেগ সম্বন্ধেই তার বিশেষ ভয় দেখা দেয়। অবশ্য কৈশোর বয়সের এসকল ভয়ই আমাদের সামাজিক প্রভাবের ফলে এবং কিশোরদের প্রতি বড়দের মনোভাবের ফলে দেখা দেয়।

১৬। শিশু বড় হওয়ার সাথে-সাথে তার জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটে। সে অতীতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে শেখে। তার কল্পনার ক্ষমতা বাড়ে। অনেক কিছু অনুমান করতে পারে। কাজেই এই সকল ক্ষমতা বাড়ার সাথে সাথে কেবলমাত্র বর্তমানই নয়, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও তার নানারূপ ভয় দেখা দিতে থাকে। এ সকল ভয়ের মধ্য বাস্তব ও অবাস্তব, উভয়বিধ ভয়ই থাকতে পারে।

১৭। মানসিক সংগঠন (structure) সঞ্জাত ভয়—শিশু অবস্থা থেকে বয়স বাড়ার সাথে সাথে ও পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়ার (inter-action) ফলে মানুষের মনের গঠনের ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে থাকে। জন্মগ্রহণের পর কয়েক বছর পর্যন্ত শিশু মানসিক ও শারীরিক, উভয় দিক থেকেই থাকে অসহায়। এই সময় তার অহং (ego) বা বাস্তব-বোধ থাকে খুবই অপরিণত ও দুর্বল। কাজেই এই সময় ভালবাসার বস্তুকে (মাকে) হারাবার ভয়েতে তাকে কিছু না কিছু ভুগতেই হয়; কারণ বাস্তবে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে মাকে পাওয়া কোন শিশুর পক্ষেই সম্ভব নয়। এর পরে যখন সে আর একটু বড় হয় তখন ছেলে-শিশু মায়ের প্রতি আকর্ষণের জন্য মনে মনে ভীত হয়ে পড়ে। সে মাকে একান্তভাবে পেতে চায়। কিন্তু পরিবারের পরিস্থিতির মধ্যে এরূপ ইচ্ছা চরিতার্থে বাধা অনেক। তার বাবা বা অন্য ভাইবোনেরা এই ইচ্ছাপূরণের পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ। মা-বাবা সন্তানদের নিয়ে

পারিবারিক পরিস্থিতির মধ্যে যে নাটকের উদ্ভব হয় তার ফলে শিশু সন্তানদের মনে দেখা দেয় ইডিপস-গূঢ়ৈষা (Oedipus-complex)। শিশু সন্তান মাকে পাওয়ার ব্যাপারে অপরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। ফলে তার মনে দেখা দেয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব। ধীরে ধীরে তার মনে শাস্তির ভয় দেখা দেয়। শিশু (ছেলে-মেয়ে) একটু বড় হলেই তার জননেন্দ্রিয় নিয়ে নাড়াচাড়া করে আরাম পায়। কিন্তু সমাজের প্রচলিত ধারণা এরূপ আরাম বা সুখকে সমর্থন করে না; বরং গর্হিত কাজ বলে পরিগণিত করে। তাই শিশুকে এরূপ কাজে বাধা দেওয়া হয়। এই বাধা দেওয়ার কাজে শাস্তির ভয় দেখান হয়। এই সকল শাস্তির ভয়ই ছেলে-শিশুর মনে দেখা দেয় যৌনাঙ্গ-ছেদনের ভয়রূপে (castration fear) এবং মেয়ে শিশুর মনে দেখা দেয় ভালবাসা হারাবার ভয় রূপে। হস্ত-মৈথুন-সঞ্জাত ভয়ও এই সময় থেকেই দেখা দেয়। চার-পাঁচ বছরের শিশুরা যৌন ইন্দ্রিয় নাড়া-চাড়া করে যে সুখ পায়, শিশুমন সে অবস্থা অতিক্রম করতে না পারলে কৈশোরে এবং পরবর্তী জীবনে প্রকৃত হস্ত-মৈথুন ক্রিয়ার মধ্যে আত্মনিয়োগ করতে পারে। কৈশোরকালে হস্ত-মৈথুন ক্রিয়াসঞ্জাত ভয়ও নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। যেমন, শরীরে কঠিন রোগ হওয়া, যৌন-ক্ষমতা হারিয়ে ফেলা ইত্যাদি।

প্রাক-কৈশোর পর্যায়ে শিশু দেখতে পায় যে তার সকল প্রকারের সুখ লাভের ইচ্ছা ও মনের ঈর্ষা, দ্বেষ, রাগ মা-বাবার, বড়দের ও সমাজের অনুমোদন লাভ করে না। অনেক সময়ই এগুলি মা-বাবার ইচ্ছা ও মূল্যবোধের বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই এই সময় শিশু এই ইচ্ছা ও অনুভূতিগুলিকে অবদমন করতে থাকে এবং এগুলির জন্য নিজের বিবেকের কাছেই নিজেকে দোষী মনে করতে থাকে। মা-বাবার আচার-আচরণ ও চিন্তা-ভাবনার সংস্পর্শে থেকেই শিশুর এই বিবেক-বোধ জেগে ওঠে। শিশু তার নিজের বিবেকের অনুশাসনকে ভয় পেতে

থাকে (fear of the super-ego)। সাধারণতঃ এই বিবেকের ভয় সুস্থ, সামাজিক মানুষের মনে কিছু থাকবেই। সমাজে এর প্রয়োজনও আছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে মনের সাংগঠনিক বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে এবং অহং (ego) এর ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ভয়েরও রূপান্তর ঘটে।

মা-বাবার প্রতি শিশুর যেমন থাকে ভালবাসা, তেমন থাকে ঘৃণা। সে মা-বাবার কাছ থেকে সুখ পায়, নিরাপত্তা পায়। আবার মা-বাবাই তার সুখের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ছেলে-শিশু মায়ের ভালবাসা পাওয়ার পথে বাবাকে বাধা মনে করে। অনুরূপভাবে মেয়ে-শিশু বাবার ভালবাসা পাওয়ার ব্যাপারে মাকে প্রতিবন্ধক মনে করে। তাই শিশুরা মা-বাবার প্রতি ক্রোধান্বিত হতে থাকে এবং কখনও-কখনও শিশুর মনে তাদের মৃত্যু কামনাও এসে পড়ে। ফলে শিশু নিজের মনের এই অসামাজিক ধারণার জন্য নিজেই ভীত হয়ে পড়ে। তাই মা-বাবার অসুখ করলে শিশু ভাবে, বোধহয় তার ইচ্ছাই পূরণ হতে যাচ্ছে। তখন সে আরও ভীত হয়ে পড়ে। আবার মা-বাবার অসুখ করলে শিশুর মনে নিরাপত্তা-বোধেরও অভাব দেখা দেয়। এর ফলেও শিশু ভীত হয়ে পড়ে।

মা-বাবার ভালবাসা পাওয়ার পথে শিশুরা নবজাত ভাই-বোনকেও বাধাস্বরূপ মনে করে। ফলে তাদের সম্বন্ধেও অমঙ্গল কামনা শিশুর মনে দেখা দেয়। শিশু নিজের মনের এই কামনাকেও ভয় পায়। তাই ছোট-ছোট ভাই-বোনের অসুখ করলে, শিশু খুব ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

১৮। মায়ের বুকের দুধ ছাড়াবার সময়ের ভয়—মায়ের বুকের দুধ খাওয়া শিশুর কাছে কেবল ক্ষুন্নিবৃত্তিরই উপায় নয়। এর মধ্য দিয়ে শিশু নানা সুখ আহরণ করে এবং এই দুধ খাওয়া তার কাছে মায়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের একটি মাধ্যম। এই দুধ খাওয়ার মধ্য দিয়েই সে

চার-পাঁচ বছরের বা ছোট শিশুদের হঠাৎ কোন ভয়ের পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। এতে শিশুর অহংশক্তি (ego-strength) ঐ ভয়পূর্ণ পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধানে অসমর্থ হয়। এই ব্যর্থতার গ্লানি তাকে পেয়ে বসে এবং ভয় তার মনে বাসা বাধে। ভয় জয় করার ব্যাপারে শিশুকে ধীরে ধীরে ধৈর্য্য সহকারে অগ্রসর করাতে হবে। তাকে রাতারাতি বড়দের মত সাহসী করে তোলার চেষ্টা করলে হিতে বিপরীত হবে। শিশুর সহন ক্ষমতা বুঝতে হবে ও সেই অনুযায়ী অগ্রসর হতে হবে। শিশুদের বয়স্কদের মত ভাবলে ভুল করা হবে। দেখা গেছে খুব ছোট শিশুদের অনেক সময় ভূত-প্রেত বা রাক্ষসের গল্প বললে ভয় পায়। ঐ সকল শিশুকে গল্প বলার সময় আরও নরম প্রকৃতির গল্প দিয়ে শুরু করতে হবে। শিশুর বয়স বাড়ার সাথে-সাথে দেখা যাবে যে ক্রমে সে অধিকতর ভয়ের গল্প উপভোগ করতে পারে। অনেকে তাদের শিশুদের অত্যন্ত ভয়ের এবং রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চকর সিনেমা দেখাতে নিয়ে যান। তারা ভাবেন, এসব দেখে শিশু সাহসী হয়ে উঠবে। কিন্তু হঠাৎ এভাবে শুরু করা ঠিক নয়। শিশু যদি ঐ সকল দৃশ্যাবলী সহ্য করতে না পারে, তাহলে তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। ভবিষ্যৎ জীবনে সে রোমাঞ্চ ও রহস্যকে সর্ব্বদা পরিহার করে চলতে পারে। কাজেই রূপকথা, ভূতের গল্প, রোমাঞ্চকর ও রহস্য সিনেমা ইত্যাদি খুব হিসাব করে শিশুর কাছে বলতে হবে। শিশু যখন এগুলি উপভোগ করতে পারবে তখন এগুলি পরিবেশন করলে বিশেষ সুফল পাওয়া যাবে। যেমন, মাংস খুব পুষ্টিকর খাদ্য ; কিন্তু যে তা হজম করতে পারে না তাকে মাংস খেতে দিলে অসুস্থ হয়ে পড়বে ; কিন্তু যে মাংস তার পাক-যন্ত্রের সাহায্যে সুপরিপাক করতে পারে, তাকে মাংস খেতে দিলে তার শরীরের পুষ্টি হবে।

শৈশব থেকে কৈশোর পর্যন্ত অনেক ভয়েরই উৎস ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার ও পারিবারিক মূল্যবোধ। কোন কোন ধর্মীয়

ও সামাজিক রীতি-পালনে ত্রুটি ঘটলে পাপ হবে, এরূপ ভয় অনেক শিশুরাই ভোগ করে। নিজের অক্ষমতা ও অসাবধানতাবশতঃ যদি কোন কিশোর পারিবারিক মুল্যবোধে আঘাত করে তাহলে সে ভীত হয়ে পড়ে। কারণ সেরূপ ক্ষেত্রে তার মনে অপরাধ-বোধ জাগে। একটি শিশু পরীক্ষায় ফেল করার ভয়ে বাড়ী যেতে সাহস পাচ্ছিল না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল সে মা-বাবার সম্মান ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছে, পরিবারের মুখে কলঙ্ক লেপন করেছে। এরূপ ক্ষেত্রে সমাজের অনেক ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন দরকার। বড়দেরও সামাজিক, ধর্মীয় ও পারিবারিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করা দরকার।

ভয় বড়দের মন থেকে শিশুদের মনে সঞ্চার হতে দেখা যায়। একটি শিশুর খেলতে খেলতে ব্লেডে হাত কেটে গেছে। কিছুটা রক্ত বেরিয়েছে। শিশুটির তাতে তেমন ভ্রূক্ষেপ নেই। সে তার মাকে সহজভাবেই এসে বলল, 'মা, কেটে গেছে ওষুধ দিয়ে দাও'। মা শিশুর হাতের রক্ত দেখে চীৎকার করে উঠলেন, 'সর্বনাশ, কতটা কেটে গেছে! ইস!' শিশু তখন ভয়ে কেঁদে উঠল। এর পর থেকে শিশুটি ব্লেডকে ভয় করতে শিখল। কাজেই বড়দের এরূপ পরিস্থিতি বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নিজেদের ভয় ও উদ্বেগ অহেতুকভাবে শিশুর সামনে কিছুতেই দেখান চলবে না। নিজেদের আচরণ আগে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

আগেই বলা হয়েছে যে শিশু-মনে ভয়ের একটি বিশেষ উৎস হল মা-বাবার, বিশেষ করে মায়ের ভালবাসা হারাবার ভয়। শিশুর মনে যাতে এরূপ অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা-হীনতার বোধ না জাগে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আগেকার একান্নবর্ত্তী পরিবারে শিশুদের ভালবাসা পাওয়ার ব্যাপারে অধিকতর নিশ্চয়তা ছিল। মা-বাবার অবর্তমানে একান্নবর্তী পরিবারে ঠাকুমা, পিসিমা, দিদিমা, দাদু প্রভৃতির কাজই যেন ছিল কোন শিশুর জীবনে ভালবাসার ঘাটতি পূরণ করা।

তাছাড়া একার ছোট পরিবারে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে অনেক পরিবারে মা ও বাবা উভয়ই রুজি-রোজগারের কাজে ব্যস্ত থাকেন। শিশুকে নির্ভর করতে হয় আয়া বা কাজের লোকের উপর। এরূপ ক্ষেত্রে শিশুর মনে বিচ্ছিন্নতা-বোধ জনিত ভয়ের উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ছোট পরিবারের মা-বাবাকে এ সমস্যাটির দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

শিশুর মনের ভয় দূর করা ও প্রতিরোধের ব্যাপারে সর্ব্বোপরি মনে রাখতে হবে যে পরিবারে একটি সুস্থ ও প্রাণবন্ত আবেগের আবহাওয়া সৃষ্টি করা দরকার। এই আবহাওয়া সৃষ্টির ব্যাপারে মা-বাবা ও বড়দের দায়িত্ব অসামান্য। যে পরিবারে দেখা যায় যে বড়রা প্রায়শঃই মানসিক ভারসাম্যহীনতায় ভোগে, সামান্য ব্যাপার নিয়ে যেখানে অনবরতই ঝগড়াঝাঁটি লেগে থাকে, বিশেষ করে যেখানে মা ও বাবার সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, শিশু সেখানে ভীত হয়ে পড়বেই। মনে রাখতে হবে, মা ও বাবার সম্পর্কের মধ্যে সামান্য ত্রুটি ও অশালীনতা শিশুর কাছে অতি সহজেই ধরা পড়ে। কাজেই বাড়ীর বড়দের এদিকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। শিশু-মনের ইডিপাস-গূঢ়ৈষা (Oedipus-complex) সঞ্জাত যে ভয় তাও দূরীভূত হতে পারে একমাত্র মা-বাবার মধ্যের সুস্থ সম্পর্ক ও তাদের সুসমঞ্জস আচরণের দ্বারা। কাজেই দেখা যাচ্ছে শিশু-মনের ভয় দূরীকরণ ও প্রতিরোধের ব্যাপারে সর্ব শেষ কথা হল সুস্থ পারিবারিক আবহাওয়া ও মা-বাবার সুসমঞ্জস আচরণ।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে মানব-সভ্যতার বর্তমান পরিস্থিতিতে শিশুমনে ভয় সঞ্চার হওয়া কিছুটা স্বাভাবিক। তবে শিশু বড় হওয়ার সাথে সাথে তার অহং শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও সে তার মনের অনেক ভয়ই কাটিয়ে ওঠে। কিন্তু বর্তমান সভ্যতার চেহারার দিকে একটু বিশেষ ভাবে নজর করলে আমাদের বুঝতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না যে, শিশু

বয়সের অনেক অস্বাস্থ্যকর ভয়·বড়দের মনে বিশেষ ভাবে বাসা বেঁধে আছে। বিগত মহাযুদ্ধের পর থেকে বোধ হয় একটা ভয়ের আবহাওয়া সারা পৃথিবীতে আরও অধিক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। একদিকে দেশে-দেশে হিংস্র রাজনীতির নায়ক ও তার সৈন্য বাহিনীর রণ-দামামা ও দুঃশাসনের কারাগারে-কারাগারে নির্যাতন কৌশলের মধ্যে ভীত মানুষের হুঙ্কার; অপর দিকে অসংখ্য ভীত নির্যাতিত মানুষের ভাষাহীন ক্রন্দন। যারা আক্রমণ করছে তারা ভীত হয়েই আক্রমণ করছে, যারা আক্রান্ত হচ্ছে তারাও ভীত হয়েই আর্তনাদ করছে এবং প্রতিরোধে অক্ষম হচ্ছে। অত্যাচারী যখন আক্রমণ করে তখন সে তার লোভের বস্তু, ভোগের বস্তু হারাবার ভয়ে বিভ্রান্ত হয়ে আক্রমণ করে। সে ভয় পায়, এই বুঝি তার ক্ষমতার সিংহাসন, লোভের সিংহাসন হাত-ছাড়া হয়ে গেল। তাই সে আগে থেকেই তার প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে, নির্যাতন করে। আবার নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষ ভয়ে নির্যাতনের প্রতিরোধ করতে পারে না। উভয়ই ভীত, উভয়ই দুর্ব্বল। যে শিশু তার খেলনা অপর কোন শিশু নিয়ে নেবে, এই ভয়ে তার খেলনার কাছে অন্য শিশু এলেই তার সাথে দুর্ব্যবহার করে, যে শিশু তার মায়ের ভালবাসার অংশীদার ছোট ভাই বা বোনের আগমনে নবজাতকের মৃত্যু কামনায়ও দ্বিধা করে না, যে শিশু বিদ্যালয়ে সহপাঠীর কাছে পরাজয়ের ভয়ে ভীত, নতুন পরিস্থিতির ভয়ে ভীত; অবলম্বন হারাবার ভয়ে ভীত, তার ভয়ের প্রতিচ্ছবি কি আমরা রাষ্ট্র নায়কের ক্ষমতার সিংহাসন হারাবার ভয়, অথবা বড়দের লোভের বস্তু, ভোগের বস্তু হারাবার ভয়ের মধ্যে দেখতে পাই না? শিশু বয়সের যে সকল ভয়ের পুরোপুরি নিষ্পত্তি হয় না, সেগুলি বয়স্ক জীবনে নানা বিকৃতির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তাই আমরা যদি সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন চাই, তাহলে আমাদের এই ভয়ের মূলোৎপাটন করতে হবে। এবং এই কাজ শুরু করতে হবে শিশুমন থেকে;

কারণ তারাই ভবিষ্যৎ সমাজের নাগরিক। আমরা যে আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছি, সমাজ জীবনে যে সম্পূর্ণ বিপ্লবের কথা ভাবছি তার আবির্ভাব ঘটাতে গেলে মানুষের মন থেকে ভয়ের অপনয়ন ঘটাতে হবে। ভীত মানুষকে নিয়ে কখনই আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন সম্ভব নয়। অত্যাচারী অত্যাচার করে মানুষের মনের ভয়ের সুযোগ নিয়ে। কর্তৃপক্ষ যখন অত্যাচারী হয়ে ওঠে, তখন অত্যাচারিত মানুষ তার প্রতিবাদ করতে ভয় পায়। এই ভয়ের সুযোগ নিয়েই অত্যাচারী তার লোভের ক্ষুধা বাড়িয়ে তোলে। মানুষের ভয়ের মূল তার শিশু বয়সের সামঞ্জস্যহীন আচরণসম্পন্ন বাবা-মায়ের (এবং বাবা-মা স্থানীয়দের) প্রতি ভয়ের মধ্যে। শিশু বয়সে মানুষের মন যখন সংগঠিত হতে থাকে, এই ভয়টিও তখন সেই সংগঠনের মধ্যে নিজের স্থান করে নেয়। তারপর সময় ও পরিস্থিতির সুযোগ বুঝে এক-একজন মানুষের আচরণের মধ্যে এক-এক ভাবে প্রকাশ পায়। সুযোগ পেলে কেউ হয় অত্যাচারী ; আর কেউ হয় প্রতিবাদহীন অত্যাচারিত। শিশু বয়সে যারা অত্যন্ত ভীতিজনক বা অসামঞ্জস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে মানুষ হয় তারাই বড় হয়ে সুযোগ পেলে হয়ে ওঠে দুর্দান্ত অত্যাচারী ও নির্যাতন কৌশলবিদ্। অথবা তাদের মধ্যেই কেউ একদিন আবার হয়ে ওঠে প্রতিবাদহীন নির্ব্বাক। ইতিহাসের পাতায় এর অজস্র উদাহরণ রয়েছে। আমরা ভয়ে দৈনন্দিন জীবনে সহস্র অন্যায়কে মেনে নিই, অজস্র অত্যাচারের নির্ব্বাক সাক্ষী হয়ে থাকি। কাজেই সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করতে হবে বিজ্ঞানসম্মত শিশুপালনের মধ্য দিয়ে। যার উদ্দেশ্য শিশু মনকে ভয়মুক্ত করা। সম্পূর্ণ বিপ্লবের কোন কার্যসূচীই শিশু-পালনের কর্ম্মসূচীকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। এ বিষয়ে রাষ্ট্রনায়ক, সমাজ বিজ্ঞানী ও চিন্তানায়কদের বিশেষভাবে অবহিত হবার সময় এসেছে। মানব-সভ্যতার প্রথম

উষার সূর্যোদয় থেকে আজ পর্যন্ত সকল সাধকেরা মানুষকে ভয়মুক্ত করার সাধনাই করে গেছেন।

"এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে, হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।

* * *

....মঙ্গলপ্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক-মাঝে, উন্মুক্ত বাতাসে।"

—রবীন্দ্রনাথ

শিশুর খাওয়া

আজকাল মায়েদের মুখে প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায় যে তাদের শিশু সন্তানেরা খাওয়া নিয়ে ঝামেলা করে, খেতে চায় না। শিক্ষিত নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও সংগতিপন্ন ঘরের মায়েদের কাছেই এ অভিযোগ বিশেষভাবে শোনা যায়। কারণ যে ঘরে খাদ্য দ্রব্যের অভাব, সেখানে খাবার নিয়ে ঝামেলার প্রশ্ন ওঠে না। শিশুকে খাওয়াতে মায়েরা হিমশিম খান। তার খাওয়ার সময় বাড়ীতে একটা তোলপাড় পরিস্থিতি দেখা দেয়। এরূপ অবস্থায় মায়েরা ভেবে পান না যে কি করবেন।

শিশুর খাওয়ার ঝামেলা নানা রকম হতে পারে। কখনও শিশু বলছে খিদে লাগেনি। আবার কখনও বায়না করছে অমুকটা না হলে খাবে না। যে সব খাবার দেওয়া হলো তা পছন্দ নয়। কখনও খাবে না বলে জিদ, কখনও আরো খাবে বলে জিদ। না খাওয়া এমন পর্যায় গিয়ে পৌছাতে পারে যে শিশুর স্বাস্থ্যহানী পর্যন্ত ঘটতে পারে।

খাওয়ার প্রয়োজন শরীর রক্ষার জন্য। শিশুর খিদে পেলে খাবে, এটাইতো স্বাভাবিক। খিদের উদ্রেকের সাথে সাথে ছোট্ট শিশু কাঁদতে থাকে। আর একটু বড় হলে খাবার চাইতে থাকে বা নিজেই খাবার নেবার চেষ্টা করে। ক্ষুধার নিবৃত্তির সাথে সাথে তার শরীরে আসে আরাম বোধ। শরীর রক্ষার প্রয়োজনীয়তার পরিপূরণের সাথে সাথে এই আরাম বোধ মিলেমিশে আছে। ফলে শরীর রক্ষার জন্য খাওয়ার উদ্যম আরও সহজতর ও আরাম দায়ক হয়েছে। কিন্তু নানা কারণ এই প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দেয় ও শিশুর জীবনে খাওয়া নিয়ে নানা সমস্যা দেখা দেয়।

শিশুর খাওয়ায় সমস্যা নানা রকম হতে পারে। যেমন শারীরিক ও মানসিক। প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে শিশুর কোনও

শারীরিক রোগ আছে কিনা। শারীরিক রোগজনিত কারণে শিশুর খাওয়ার প্রতি অনিচ্ছা আসতে পারে। চিকিৎসকের সহযোগিতায় প্রথমেই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া দরকার। শিশুর শরীরে যখন খাদ্যের প্রয়োজন নেই, শরীর যখন খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না, শিশু তখন আপনা থেকেই অপ্রয়োজনীয় খাদ্য বমি করে দেয়। বেঁচে থাকার সহায়ক শিশুর এই ক্ষমতা প্রকৃতিদত্ত। এ যেন শিশুর শরীরে এক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা। শিশুর শরীরে রোগ দেখা দিলে এই ব্যবস্থা আপনা থেকেই কার্যকরী হয়। শিশুর শরীরিক রোগের সময় মায়েরা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েন, কারণ শিশুর খাওয়ার পরিমাণ খুব কমে যায়। না খেলে তার শরীর দুর্বল হয়ে যাবে, এরূপ চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। অতএব মায়েরা শিশুকে নানা ভাবে শারীরিক পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াবার চেষ্টা করতে থাকেন। অনেক সময় চিকিৎসার জন্যই, শিশুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তাকে খাওয়াবার চেষ্টা করতে হয়। এই চেষ্টা খুব সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে, যাতে শিশুর মনে কোনরূপ পীড়ন বোধ না হয়। এই সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মা ও শিশুর মধ্যে খাওয়া নিয়ে একটা টানা-হেঁচড়া চলতে থাকে। এইভাবে এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই খাওয়ার ব্যাপারে শারীরিক সমস্যা মানসিক সমস্যায় পর্যবসিত হয়।

শিশুর খাওয়ার ব্যাপারে আসল সমস্যাই হলো মানসিক সমস্যা। এই সমস্যাটি শিশুর জীবনে কিভাবে দেখা দেয় তা আমাদের বোঝা দরকার। শিশু জন্মাবার ক'য়েক দিন পর থেকেই মায়ের বুকের দুধ খেতে আরম্ভ করে। খিদে পেলে কাঁদে। খেতে পেলে পরিতৃপ্ত হয়, শান্ত হয়। খিদের পর খেতে পাওয়া—এই পরিস্থিতির মধ্যে শারীরিক আরাম বোধ ও পরিতৃপ্তিই শিশুর কাছে প্রধান। আবার খাওয়ার সময় শিশু মায়ের স্তন চুষছে। এই চোষার মধ্যেও সে একটা সুখ অনুভব করে। কাজেই খাওয়ার মধ্যে শিশুর কাছে সুখ ও আরামের দিকটাই বড়। এরূপ পরিস্থিতির মধ্যে শিশুর খাওয়ার

ব্যাপারে ঝামেলা উপস্থিত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এই পরিস্থিতির মধ্যে যখন অন্য পরিস্থিতি এসে হস্তক্ষেপ করে তখনই বাধে গোলমাল। অর্থাৎ শিশুর সুখানুভব প্রক্রিয়ায় যখন বাইরের হস্তক্ষেপ ব্যাঘাত সৃষ্টি করে তখনই শিশুর খাওয়া নিয়ে নানা ঝামেলা সৃষ্টি হয়।

আজকাল অধিকাংশ মায়েরাই (বাবারাও) তাদের শিশু-সন্তানদের খাওয়ার ব্যাপারে নানা প্রকারের ডাক্তারি মতবাদ, স্বাস্থ্যবিধি, আধুনিকতা, সংস্কার প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত। সারাদিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে খাওয়াতে হবে; শিশু একটু বড় হলেই দুধের সাথে সাথে যথা শীঘ্র সম্ভব তার খাওয়ার তালিকায় বিশেষ বিশেষ খাদ্যের সংযোগ দরকার, কারণ খাদ্য সুসমঞ্জস হওয়া প্রয়োজন ; বুকের দুধ অপেক্ষা কৃত্রিম দুধ (বেবি ফুড)খাওয়ান শ্রেয়ঃ, বেশিদিন বুকের দুধ খাওয়ান আধুনিকতা বিরুদ্ধ ; —এই সব ধারণা ও মতবাদের প্রতি আজকাল বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে শিশুদের খাওয়াবার ব্যাপারে তাদের শরীরিক দিকটা এবং প্রচলিত সংস্কার ও রীতি-নীতিই বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। খাওয়ার মধ্যে শিশুর সুখবোধ বা ভাল লাগার দিকগুলি, অথাৎ তার মানসিক দিককে সম্পূর্ণই উপেক্ষা করা হচ্ছে। মানসিক দিক থেকে দেখতে গেলে ক্ষুধার নিবৃত্তি ছাড়া খাওয়ার মধ্য দিয়ে শিশুর আরও কতগুলি সুখানুভূতির চরিতার্থ হয়। এই সুখানুভূতি নির্ভর করে তার পছন্দমত খাবার পাওয়া ; কিভাবে তাকে খাওয়ান হচ্ছে, অর্থাৎ খাওয়ার সময় তাকে কিভাবে শোয়ান হয়েছে, বা বসান হয়েছে ; তার হাত কতটা ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে ; খিদে পাওয়ার কতক্ষণের মধ্যে তাকে খাওয়ান হচ্ছে ইত্যাদি ব্যবস্থার উপর। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে শিশুদের খাওয়ান সম্বন্ধে ধারণা সমূহ শিশুর এই ভাল লাগার দিকটায় বিশেষভাবে হস্তক্ষেপ করে। আমাদের দেশের মায়েদের এ সমস্ত ধারণা সমূহের ত্রুটি উপলব্ধি করতে হবে এবং বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা বিচার করতে হবে।

শিশুর খাওয়ার মধ্যে প্রথম হস্তক্ষেপ শুরু হয় মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানর পরিস্থিতির মধ্যে। আধুনিক মা বাচ্চাকে বেশিক্ষণ বুকের দুধ খেতে দিতে রাজী নন, পাছে বেশি পরিমাণে খেয়ে ফেলে। তাড়াতাড়ি বুকের দুধ ছাড়াবার দিকেও মায়েদের একটা বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। ফলে একেবারে প্রথম থেকেই এই উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে শিশুর বুকের দুধ নিয়ন্ত্রণ করা হতে থাকে এবং তাড়াতাড়ি বোতলে করে কৃত্রিম দুধ খাওয়ান অভ্যাস করান হতে থাকে। বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থার (WHO) এক অনুসন্ধানের ফলাফলে দেখা গেছে যে কৃত্রিম দুধ অপেক্ষা মাতৃ দুগ্ধই শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে অধিকতর মঙ্গল জনক। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থার মতামত উল্লেখ করছি,—"Breast feeding is of prime importance to make the children much stronger against infection and give them a better chance of healthier adult life. Breast milk is the best food for infants. As a precious source of high quantity proteins for them it is well digested and absorbed, and transfers some of the immune bodies of the mother. Cow's milk is the second best....................mothers must be encouraged to breast feed their chileren from the very beginning and continue it regularly for a prolonged period with timely addition of supplementary nutrients. If no concerted action is taken, the time will come when the female breast will lose its function of feeding the young and become only a sex symbol". Editorial ; Calcutta Medical Journal (Journal of Calcutta Medical Club) ; Vol. 71, No 56, May—June, 1974) তিন-চার মাস বয়সের শিশু যখন মায়ের বুকের দুধ

পান করে তখন অনেক সময় দেখা যায় যে উদর পূর্তির পরেও শিশু মায়ের স্তন মুখে দিয়ে রাখে এবং নানা ভঙ্গিতে স্তন নিয়ে খেলা করবার চেষ্টা করে। খাওয়া এবং এই খেলা একই সঙ্গে হতে থাকে বলে ছু'টির সুখই ওতোপ্রতো ভাবে মিলেমিশে থাকে। তাই খাওয়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ হলে উভয় সুখই বিঘ্নিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের সুখও শিশুর জীবনে একান্ত প্রয়োজন। কারণ মায়ের স্তনের মধ্য দিয়েই শিশুর মায়ের সাথে প্রাথমিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে; এটাই তার প্রথম বস্তু-সম্পর্ক (object relationship)। এই সম্পর্কের উপরই তার ভবিষ্যৎ বস্তু-সম্পর্ক নির্ভর করে এবং ভবিষ্যতের যথাযথ বস্তু-প্রেমের (object love) ভিত্তিও এই সুখকর অভিজ্ঞতা।

খাওয়ার সুখে সব চাইতে বড় রকমের হস্তক্ষেপ দেখা দেয় শিশুকে মায়ের বুকের ছুধ খাওয়া ছাড়ানর সময় এবং ছাড়ানর পদ্ধতির মধ্যে। অনেক মায়েরা তাদের বাচ্চার অধিক দিন ধরে বুকের ছুধ খাওয়া তাদের সৌন্দর্য চর্চার বিরুদ্ধ বলে মনে করেন। (কিন্তু এটা একেবারেই ভুল ধারণা। চিকিৎসক ও শরীরতত্ত্ববিদদের অভিজ্ঞতায়ও এর সমর্থন মেলেনি। কাজেই এ ধারণা স্বাস্থ্য বিধি বহির্ভূত। শরীরের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলির স্বাভাবিক পরিপূর্ণতার মধ্যে শরীরের সুস্থতা বিধৃত। ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরাও শিশুকে মাতৃ-স্তন খেতে না দেওয়ার বিপক্ষে মতামত পোষণ করেন। উপরন্তু শিশু যখন মাতৃ-স্তন চোষে তখন মায়ের জরায়ুর পেশীসমূহে একটা প্রতিক্রিয়া হয়,—সঙ্কুচিত হয়; এই সঙ্কোচন জরায়ুর প্রাক্-গর্ভাবস্থায় ফিরে আসার পক্ষে সহায়ক।) এরূপ মনে করার জন্য শিশুদের মায়ের বুকের ছুধ খাওয়ায় বড় রকমের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

বুকের ছুধ ছাড়ান ব্যাপারটা এক সমাজে এক এক ভাবে সংঘটিত হয়। কোথাও কোথাও এটা সামাজিক বিধি অনুযায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের আধুনিক সমাজে যিনি যেমন ভাবে পারেন, তেমন ভাবে করে থাকেন; এর জন্য শিশুর বয়সের দিক থেকে

কোন সময় সীমা মানা হয় না। তাড়াতাড়ি বুকের দুধ ছাড়ানটাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এর জন্য মাইতে তেতো জিনিস, মাটি প্রভৃতি মেখে রাখা থেকে শুরু করে বল পূর্বক খেতে না দেওয়া—সব রকম পদ্ধতিই প্রয়োগ করা হয়। শিশু খেতে চাইলে নানা ঘেন্না সূচক শব্দ করা হয়, যার অর্থ স্তন নোংরা। এই ভাবে শিশুর খাওয়ার সুখ, চোষার সুখ এবং মাতৃ-স্তনের অনুভূতির সুখে বড় রকমের বাধার সৃষ্টি হয়। ফলে খাওয়া সম্বন্ধে শিশুর মনে নানা ভুল ধারণা জন্মাতে থাকে ; তার মনে জিদ দেখা দেয়, খাওয়ায় অনিচ্ছা দেখা দেয়। কারণ সুখ পেতে গিয়ে সে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে সুখের অনুভূতির চাইতে ব্যর্থতার বেদনাই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। ফলে ধীরে ধীরে খাওয়ার সাথে এই বেদনা যুক্ত হয়ে যায়। এখানে প্রসঙ্গত একটা বিষয়ের উল্লেখ অবান্তর হবে না। বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী শ্রীমতী মার্গারেট মিড তাঁর একটি গবেষণায় দেখিয়েছেন যে মায়ের দুধ খাওয়ান ও ছাড়ানর পদ্ধতি ও সময়ের উপর শিশুর ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্বের গঠন বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। শৈশবের এই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের নারী-পুরুষ সম্পর্ক বা বিপরীত লিঙ্গের সাথে যৌন সম্পর্কের ভিত্তিস্বরূপ কাজ করে। কাজেই শিশুর মায়ের দুধ খাওয়ার এবং তৎসংলগ্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে তার ভবিষ্যৎ জীবনে সুখ লাভের ক্ষমতা বহুল পরিমানে নির্ভর করে বলে সন্দেহ করা যেতে পারে। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জবাসী চারটি আদিম জাতির মধ্যে শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ান ও ছাড়ানর পদ্ধতির তারতম্যের উপর তাদের শিশুদের ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্ব গঠন যে কিভাবে নির্ভরশীল তা মিড ঐ সকল জাতির জীবনধারার নৃতত্ব-মূলক বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখিয়েছেন এবং উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে এসেছেন। শুধু তাই নয়, এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তিনি আরও দেখিয়েছেন যে মাই ছাড়ানর মধ্যে বয়স্কদের যৌন জীবন, তাদের যৌন বোধ ও যৌন ব্যাপারের প্রতি তাদের মনোভাবও প্রতিফলিত এবং তা নানা ভাবে

জাতির সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। (Authropology—A Human Science ; by Margaret Mead, 1964.)

এরপর শিশু যখন আর একটু বড় হয়, তার খাদ্য তালিকায় আর পাঁচটা জিনিস সংযোজিত হয় ; তখন খাওয়ার সমস্যা আরও নানা ভাবে বেশি করে দেখা দেয়। শিশুর তখন খাদ্য দ্রব্য সম্বন্ধে, তার স্বাদ, গন্ধ, আকৃতি, খাদ্য দ্রব্য ঠাণ্ডা কি গরম, নরম অথবা শক্ত প্রভৃতি ব্যাপারে পছন্দ-অপছন্দ জন্মায়। সেই পছন্দ-অপছন্দ হয়ত বড়দের পছন্দ-অপছন্দ ও প্রয়োজনীয়তার বোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। তখন শিশুদের খাওয়ান নিয়ে মায়েদের আরও মুশ্‌কিলে পড়তে হয়। শিশু যেটা খেতে চায় তাকে খেতে দেওয়া হয় না। যেটা খেতে চায় না তাই তাকে খেতে দেওয়া হয়। ফলে খাওয়াটা তার কাছে একটা শাস্তি স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এমন অবস্থায় শিশুর পছন্দ-অপছন্দকে নিশ্চয়ই মূল্য দিতে হবে। খাদ্যমূল্য বজায় রেখে তার পছন্দ-অপছন্দকে নিশ্চয়ই মূল্য দেওয়া কিছুমাত্র কঠিন কাজ নয়। মনে রাখতে হবে, খাদ্য তালিকা সম্বন্ধে আমরা বড়রা যেন আমাদের বদ্ধমূল ধারণা, আবেগ, ভয়, সংস্কার দ্বারা পরিচালিত না হই।

খাওয়ার সময় সম্বন্ধেও সেই একই কথা। একেবারে নির্দ্দিষ্ট সময়ে খাওয়াতেই হবে, সময়ের এতটুকু নড়চড় যেন না হয়, এরূপ গোড়ামী মনোভাব রাখার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। খাওয়া সম্বন্ধে মায়েদের অতি সচেতনতাই এর কারণ। অবশ্য এর পেছনে সন্তান সম্বন্ধে তাদের উদ্বেগই ইন্ধন যোগায়। প্রতিদিন একই সময় যে শিশুর পর্যাপ্ত খিদে পাবে এমন কোন কথা নেই। খিদে না পেলে তাকে জোর করে খাওয়াতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। এমন কি একদিনের এরূপ অভিজ্ঞতার ফলে খাওয়া সম্বন্ধে শিশুর বিরূপ মনোভাব দেখা দিতে পারে। আবার কোন দিন নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তার খিদে পেয়ে যেতে পারে। তখন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করা কোন-

ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। অপেক্ষা করার ক্ষমতা শিশুর ও বড়দের এক রকম নয়। বড়দের বিবেচনায় যা সামান্য সময়, শিশুদের বিবেচনায় তাই দীর্ঘ সময়। কাজেই অল্প সময়ের জন্য অপেক্ষা করালেই শিশু মনে করে যে তাকে অহেতুক দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করান হচ্ছে। শিশুর কাছে যখন কিছুর প্রয়োজন বোধ উপস্থিত হয় তখন তা অত্যন্ত তীব্রতা নিয়ে আসে। এক্ষণই মেটাতে হবে, চাহিদার এক্ষণই পরিপূরণ চাই—এই বোধ শিশুর মনের উপর চাপ সৃষ্টি করে। এই চাপ সহ্য করার মত শিশুর ক্ষমতা থাকে না। কারণ শিশুর অহং-শক্তি (Ego-strength) বড়দের অপেক্ষা অনেক দুর্বল থাকে। শিশুদের অহংশক্তি অসংগঠিত থাকে। তাই সে তার চাহিদাকে কিছু সময়ের জন্য স্থগিত রাখতে অক্ষম। তাৎক্ষণিক চাহিদা পূরণের মধ্যেই তার চাহিদা সঞ্জাত পীড়নের (tension) পরিসমাপ্তি। কাজেই ক্ষুধার্ত শিশুকে অল্প সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হলেও সে নিজেকে অত্যন্ত বিপর্যস্ত মনে করে এবং পরে খাওয়ার আনন্দ হারিয়ে ফেলে।

খাওয়া নিয়ে মায়েদের উদ্বেগের অন্ত নেই। কখনও মনে করছেন বেশি খাচ্ছে, কখনও মনে করছেন কম খাচ্ছে। শিশুর কম খাওয়া নিয়ে উদ্বেগই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়। বেশি খাচ্ছে মনে করে শিশুর খাওয়ার বাধা সৃষ্টি করা, বা কম খাচ্ছে মনে করে তাকে জোর করে বেশি খাওয়াতে চেষ্টা করার ফলেও তার খাওয়ার নানা অসুবিধা দেখা দিতে পারে। এতে শিশুর খাওয়ার রুচি চলে যেতে পারে ও তার মনে খাওয়ার ব্যাপারে নানা জিদ দেখা দিতে পারে। একথা মনে রাখতে হবে যে পরিমিত আহার গ্রহণ করার ক্ষমতা শিশুর সহজাত। তার কোন শরীরিক অসুবিধা না থাকলে সে স্বাভাবিক ভাবেই তার শরীর রক্ষার প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করবে। কখনই সে বেশি বা কম খাবে না। কারণ বেশি বা কম খাওয়ার মধ্যে একটা শারীরিক অস্বস্তি রয়েছে।

শিশুর খাওয়ার পরিস্থিতি যখন তার কাছে আনন্দ, সুখ ও উপভোগের পরিস্থিতি না হয়ে বেদনা ও পীড়নের পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়ায়, তখনই শিশুর খাওয়ায় নানা সমস্যা দেখা দেয়। তাই শিশুর খাওয়াকে আনন্দময় করে তুলতে হবে। এজন্য খাওয়ার ব্যাপারে তাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে হবে। খাওয়ার ব্যাপারে যথাশীঘ্র সম্ভব তাকে নিজের হাত ব্যবহার করতে দিতে হবে। অনেক মা অনুযোগ করেন যে বাচ্চা খাওয়ার সময় খুব নোংরা করে, ফেলেছেড়ে খায়। কিন্তু বাচ্চাকে খাবার জিনিস ঘাটাঘাটি করতে দিতেই হবে। খাবার জিনিস স্পর্শের মধ্যেও তাদের একটা সুখানুভূতি হয়। তাছাড়া অল্প দিনের মধ্যেই সে তার নিজের খাবার গুছিয়ে খেতে শেখে। খাবার ব্যাপারে শিশুকে দীর্ঘদিন পরনির্ভরশীল করে রাখা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

শিশুর খাওয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগী থাকলে খাওয়া নিয়ে ঝামেলা অনেক কম হয়। এই জন্যই দেখা যায়, যে পরিবারে একাধিক শিশু আছে সেখানে শিশুদের খাওয়ার সমস্যাও কম। একমাত্র সন্তানের ক্ষেত্রেই এই ঝামেলা বেশি দেখা যায়। বড়দের বেলাও আমরা দেখতে পাই যে নেমন্তন্ন বাড়ীতে খেতে বসে কেউ কেউ পাল্লা দিয়ে অনেক পরিমাণে খেয়ে ফেলে। এর মধ্যে সে একটা আত্মপ্রসাদ খুঁজে পায়, অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ও নিজেকে জাহির করার সুযোগ পায়। আবার একটা সামাজিক পরিস্থিতি বলেই নেমন্তন্ন বাড়ীতে সকলেই গুছিয়ে, না ফেলে-ছেড়ে সুন্দরভাবে খাওয়ার চেষ্টা করে। শিশুদের বেলাও বাড়ীতে এরূপ সামাজিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হবে। অর্থাৎ শিশুকে সঙ্গে নিয়ে সকলে একসঙ্গে খেতে বসার চেষ্টা করতে হবে। হয়ত নানা বাস্তব পরিস্থিতির জন্য এটা সব সময় হয়ে উঠবে না। তবু যতটা সম্ভব চেষ্টা করতে হবে। পিঠাপিঠি ভাইবোন থাকলে একই সঙ্গে খেতে দিতে হবে। কোন শিশু হয়ত খাওয়া নিয়ে বসে থাকে, বা খাওয়ার সময় ছুটাছুটি করে যাতে মা তাকে ধরতে না

পারে। এর মধ্য দিয়ে মাকে আটকে রাখার মতলবও তার থাকে। যদি তার আর একটি ভাই বা বোন থাকে তাহলে এরূপ হওয়ার সুযোগ কম। সেরূপ ক্ষেত্রে সে ভাববে যে ভাই বা বোন তাড়াতাড়ি খেয়ে মা বা বাবার কাছে শুয়ে পড়বে, বা আদর পাবে; অথবা ভাল খাবারটা সে আগে খেয়ে নেবে; বা ঠিক ভাবে খেয়ে সে সকলের প্রশংসা পাবে। শিশু হয়ত একটা খাবার নিয়ে নানা ঝামেলা করছে তখন যদি তাকে বলা হয় যে 'তোমার খাবার ভাইকে দিয়ে দিচ্ছি' বা 'অন্য কাউকে দিয়ে দিচ্ছি', তখনই সে নিজের খাবার আগলে বসে খেতে শুরু করবে। যেখানে প্রতিযোগী অন্য শিশুর অভাব, সেখানে বাবা অথবা প্রয়োজন হলে মাকে বা অন্য কাউকে এই প্রতিযোগীর স্থান নিতে হবে। শিশু দুধ খেতে চাইছে না। তখন যদি তাকে বলা হয় যে 'তুমি না খেলে বাবা খেয়ে ফেলবে', দেখা গেছে শিশু খাওয়ায় আগ্রহ প্রকাশ করে। প্রয়োজন হলে সত্যি সত্যিই খাবার খেয়ে ফেলতে হবে। তাকে বুঝতে দিতে হবে যে খাবার জিনিষ নষ্ট করতে দেওয়া যেতে পারে না। সে না খেলে আরও অনেক খাওয়ার লোক আছে।

মনঃসমীক্ষার মধ্য দিয়ে দেখা গেছে যে খাবার জিনিস কেবল মাত্র ক্ষুন্নিবৃত্তির উপকরণই নয়। এর মধ্যে নানা আবেগ মিলেমিশে আছে। জন্মাবার পর মায়ের বুকের দুধ পান করার মধ্য দিয়েই শিশুর জীবনে প্রথম সুখানুভূতি হয়; ক্ষুধার থেকে সৃষ্ট শারীরিক পীড়নের অবসান হয়। এইভাবে এই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে শিশু দেখতে পায় যে মাতৃস্তনের মধ্য দিয়ে তার চাহিদার পরিপূর্তি ঘটছে। এই ভাবে শিশুর আবেগ, ভালবাসা খাদ্যের সরবরাহ কর্ত্রী মায়ের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে। শিশুর জীবনে প্রথম বস্তু-প্রেম (object love) সঞ্চারিত হওয়ার কাজে খাওয়া বহুল পরিমাণে অবদান যোগায়। (মায়ের কোলে থাকা, মায়ের শরীরের স্পর্শ ইত্যাদিও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করে।) খাদ্য এবং মা শিশুর কাছে এক হয়ে মিলেমিশে

থাকে। এই জন্যই অনেক মনোবিজ্ঞানী বলে থাকেন যে মায়ের বুকের দুধ খাওয়া শিশুর ক্ষেত্রে বোতলের দুধ-খাওয়া শিশুর অপেক্ষা বস্তু-প্রেম সঞ্চার অনেক সহজতর হয়।

উপরিউক্ত কারণেই দেখা গেছে যে খাদ্যের প্রতি শিশুর বীতস্পৃহা কেবলমাত্র ক্ষুধার অভাবের জন্য হয় না। শিশু যখন একটু বড় হতে থাকে তখন মায়ের প্রতি তার মনোভাব খাদ্যের প্রতি সঞ্চারিত হতে থাকে। দু'তিন বছর বয়স থেকে এরূপ পরিস্থিতি বিশেষ ভাবে দেখা দিতে থাকে। মায়ের প্রতি যদি শিশুর দ্বন্দ্বপূর্ণ মনোভাব থাকে তাহলে তা খাওয়ার পরিস্থিতির মধ্যে সঞ্চারিত হতে থাকে। মায়ের প্রতি রাগ না-খাওয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে। মাকে নিয়ে অন্য ভাই-বোনের প্রতি ঈর্ষা, বাবার প্রতি ঈর্ষা, খাওয়ার মধ্য দিয়ে আত্ম-প্রকাশ করে। প্রায় কৈশোর কাল শুরু হওয়া পর্যন্ত শিশুর এরূপ মনোভাব থাকতে পারে। তারপর তার বাস্তববোধ শক্তিশালী হওয়ার সাথে সাথে এই সমস্যার সমাধান অনেক ক্ষেত্রে আপনা থেকেই হতে দেখা যায়। কিন্তু শিশুর বাস্তববোধ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে যদি কোনরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতি থাকে তাহলে এই খাওয়ার সমস্যা দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে এবং পরবর্তী জীবনে নানা রোগ-লক্ষণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, কাজেই প্রথম থেকে মা-বাবা, বিশেষ করে মাকে সতর্ক হতে হবে যাতে খাওয়ার ব্যাপারে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে, এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়। শিশুর সাথে মা-বাবার ব্যবহার সতর্কতাপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। মা-বাবা সম্বন্ধে শিশুর মনে যাতে কোনরূপ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বাবার কথা বলা হল কারণ শিশু যখন বুঝতে শেখে যে বাবা খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করছে (উপার্জন কর্তা) তখন বাবার সাথেও খাদ্যের একটা যোগাযোগ ঘটিয়ে নেয়। এবং বাবার প্রতি মনোভাবের প্রকাশ খাদ্যের মধ্য দিয়ে ঘটায়। মায়েরা নিজেদের মানসিক দুর্বলতার জন্য অনেক সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত দীর্ঘ

দিন ধরে শিশুর খাওয়ার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করে থাকেন; যেমন ভাত মেখে দেওয়া, খাইয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এইভাবে খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে তাঁরা শিশুর সাথে এক ধরণের সম্পর্ককে দীর্ঘায়ত করে রাখেন। এই সকল আচরণের মধ্য দিয়ে তাঁরা এমন মনোভাব ব্যক্ত করেন যাতে শিশুর ধারণা হতে থাকে সে খেলে মা খুশি হবে। এতে শিশু মনে করতে থাকে যে খাওয়াটা তার নিজের প্রয়োজনের চাইতে মায়ের প্রয়োজনেই বেশি। মায়ের উদ্বেগাকুল আচরণের মধ্যে সে এর সমর্থন পায়। এরূপ পরিস্থিতি ঘটলে শিশু খাওয়াটাকে মাকে জব্দ করার হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করে এবং এর সাহায্যে সে নিজের নানা অবদমিত ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। শিশু-পালনের ক্ষেত্রে মায়েদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে তাদের আচরণের জন্য যেন শিশু এরূপ পরিস্থিতির সুযোগ না পায়। লক্ষ্য রাখতে হবে যে মায়ের আচরণ দ্বারা যেন শিশুর অহংশক্তির যথাযথ বিকাশ ঘটে। সে যেন অযথা নির্ভরশীল হয়ে না থাকে। এই নির্ভরশীলতা তার আবেগ জীবনের বিকাশের পক্ষেও ক্ষতিকর। শিশুকে বুঝতে দিতে হবে যে খাওয়াটা তার প্রয়োজন, মায়ের প্রয়োজন নয়। তাই শিশুর খাওয়ার পরিস্থিতি থেকে বিবেচনাসম্মত ভাবে মায়েদের যথাশীঘ্র সম্ভব নিজেদের সরিয়ে রাখতে হবে। এর দ্বারা যেন এরূপ মনে না করা হয় যে মায়েরা শিশুদের খাওয়া সম্পর্কে উদাসীন থাকবেন। নিশ্চয়ই মা তাঁর শিশুর খাওয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখবেন। কিন্তু অযথা হস্তক্ষেপ যেন না ঘটে এবং এই হস্তক্ষেপের সাথে যেন মায়ের আবেগ ও উদ্বেগ মিশে না যায়। মনে রাখতে হবে যে মায়ের মনোভাবের জন্য যদি শিশুর খাওয়ার সমস্যা দেখা দেয় তাহলে তা পরবর্তী জীবনেও প্রতিকূলতার সঙ্গে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এ সমস্যার অনেক সময় মা ও শিশুর সাময়িক বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে সমাধান হতে পারে। যেমন শিশু বিদ্যালয়ে যেতে আরম্ভ করলে,

মা কোন কারণে স্থানান্তরে গেলে, শিশু বোর্ডিং-এ থাকতে আরম্ভ করলে শিশুর খাওয়ার সমস্যা অনেক সময় দূর হয়ে যায়।

শিশুর খাওয়ার সাথে তার মুখের সুখ জড়িয়ে আছে। তাই খাবারের স্বাদের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। খাওয়া যদি স্বাদহীন ও একঘেয়ে হয় তাহলে শিশু মুখের বৈচিত্র্যময় সুখ থেকে বঞ্চিত হবে। আর ক্ষুন্নিবৃত্তি ও মুখের সুখ এমনভাবে মিলেমিশে আছে যে এই সুখটাকে বাদ দিলে খাওয়ার ইচ্ছাটাও কিছু পরিমাণে বাদ পড়ে যায়। এবং এর মধ্য দিয়ে খাদ্যদ্রব্যের প্রতিও শিশুর একটা বীতস্পৃহা দেখা যায় যা অবশেষে শিশু ও মায়ের সম্পর্ককেও প্রভাবিত করে।

খাওয়ার মধ্য দিয়ে শিশুর আক্রম-বৃত্তি যথেষ্ট পরিমাণে চরিতার্থ হয়; বিশেষ করে যখন শিশুর দাঁত ওঠে। দাঁতের সাহায্যে অন্যকে আক্রমণ করে। দাঁতের সাহায্যে সে শক্ত খাবার নিজের নিয়ন্ত্রণে আনে। খাবার চিবানোর মধ্য দিয়ে বাইরের বস্তুকে নিয়ন্ত্রণে আনার ইচ্ছার অভিব্যক্তি ঘটায়। আগেই বলা হয়েছে যে খাদ্য-বস্তু ও মা শিশুর কাছে এক হয়ে মিলেমিশে থাকে। ফলে মায়ের প্রতি আক্রম-বোধ জ্ঞাপক বৃত্তির অভিব্যক্তি খাদ্য চিবানোর মধ্য দিয়ে অনেক সময় প্রকাশ হয়। এই সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই আক্রম-বোধের জন্য শিশুর মনে যেন অপরাধ-বোধ না জাগে। এই আক্রম-বোধকে যাতে শিশু ধীরে ধীরে তার অহং-শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সেই ভাবে তাকে সাহায্য করতে হবে। যদি অপরাধ-বোধ বিশেষভাবে দেখা দিতে থাকে তাহলে শিশুর খাওয়ার আনন্দ কমে যাবে। ফলে সে খেতে চাইবে না। অনেক সময় দেখা যায় যে খাদ্য-দ্রব্যের আকৃতির সাথে কোনও প্রাণময় জিনিসের মিল খুঁজে পেলে শিশু তা খেতে চায় না। কারণ সে মনে করে এর দ্বারা সে প্রাণহানি ঘটাচ্ছে। অর্থাৎ এরূপ পরিস্থিতিতে তার আক্রম-বৃত্তিতে নাড়া লাগে; ফলে সে তার আক্রম-বৃত্তি নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টায় না-

খাওয়ার পদ্ধতি গ্রহণ করে। মায়ের আচরণ ও কথাবার্তা যাতে শিশুর মনে খাওয়া সম্বন্ধে অপরাধ-বোধের ও প্রাণহানি সম্বন্ধে ভুল ধারণার সৃষ্টি না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে শিশুকে খাদ্যবস্তু ধরতে, নাড়াচাড়া করতে, এমন কি সময় সময় ঘাটাঘাটি করতে দিতে হবে। এই স্পর্শের মধ্য দিয়ে শিশু একটা বিশেষ সুখ অনুভব করে। শিশুর নিজের মল-মূত্র ঘাটাঘাটি করার একটা সহজাত প্রবৃত্তি থাকে। এর মধ্যে সে একটা সুখ পায়। খাদ্যদ্রব্য নাড়াচাড়ার মধ্যেও শিশু অনুরূপ সুখ পায়। এই সুখের মধ্যে পায়ুসুখ (anal pleasure) কিছুটা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কারণ খাদ্যবস্তুর সাথে সে মল-মূত্রের কিছুটা মিল খুঁজে পায়। যেমন রং, আকৃতি, তাপ ইত্যাদির দিক থেকে। শিশুর পায়ুসুখ ও খাদ্যবস্তু-স্পর্শের সুখকে যদি জোরপূর্বক অবদমন করানো হয়, যদি এর সাথে অতি মাত্রায় নোংরা-বোধ যুক্ত হয়ে যায়, তাহলে খাদ্যবস্তু সম্বন্ধেও শিশুর নানা বিরূপ ও ঘেন্নার ভাব জাগতে পারে। কাজেই শিশুকে তাড়াতাড়ি খাবার টেবিলের আচরণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শেখাবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। শিশুকে সভ্য ও ভদ্র করে তোলার এই কাজ ধীরে ধীরে এবং যথেষ্ট স্বাধীনতার (শিশুর) সাথে অগ্রসর হ'তে দেওয়াই বিধেয়।

শিশু-জীবনের অনেক ভুল ধারণা পরবর্তী জীবনে খাওয়ার সমস্যার মধ্য দিয়ে এবং অত্যন্ত অসুস্থ মানসিকতার মধ্য দিয়ে আত্ম-প্রকাশ করে। পরিবেশের লোকজনদের কথাবার্তা, গল্পকাহিনী শুনে শিশুদের অনেক সময় এরূপ ধারণা হয় যে মানুষ গর্ভধারণ করে মুখের সাহায্যে। এর সঙ্গে শিশুরা খাওয়ার একটা যোগাযোগ স্থাপন করে নেয়। যেমন, রূপকথার রাণীদের গাছের শেকড় বাটা খেয়ে সন্তান হ'লো। ছোট রাণীর ভাগে শেকড় না থাকায় শিল-ধোয়া জল খেয়ে তার বানর বাচ্চা হলো। পুরুষ ও মেয়ে শিশু উভয়েই মনে করে কিছু খাওয়ার ফলে তাদের পেটে সন্তান হতে

পারে। এর থেকে নানা রকম উদ্বেগ দেখা দেয়। খাওয়া সম্বন্ধে ভয় দেখা দেয়। ফলে পেটের অসুখ, বমি, শেষ পর্যন্ত খাওয়া ত্যাগ। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে এই উদ্বেগ নানা রোগ-লক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। শিশু-জীবনের খাওয়ার সমস্যা বয়স্ক জীবনে নানা প্রকার মানসিক-শারীরিক (psycho-somatic) রোগের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বয়স্ক জীবনের অনেক পেটের রোগ (যেমন কোন কোন পাকস্থলীর রোগ, কোন কোন অন্ত্রের রোগ, হজমের গোলমাল) এবং তার থেকে সঞ্জাত বহু কঠিন রোগের উৎস শৈশবের খাওয়ার সমস্যা। মানসিক রোগীর মনঃসমীক্ষায় এর প্রমাণ মিলেছে।

যাহোক, শিশুর খাওয়ার সমস্যা, তা শারীরিক অথবা মানসিক, যে কোন কারণেই উদ্ভূত হোক না কেন, কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। শারীরিক কারণসঞ্জাত সমস্যাও মানসিক সমস্যায় পর্যবসিত হতে পারে। অনেক সময় কোন অপরিহার্য কারণে খাওয়ার সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন, মায়ের অসুস্থতার জন্য সন্তানের বুকের দুধ খাওয়ায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য উপায়ে যথাশীঘ্র সম্ভব এর প্রতিকার করতে হবে। খাওয়ার সমস্যা প্রধানতঃ মায়ের মনোভাব ও আচরণকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এ ব্যাপারে মায়েদের যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। খাওয়ার ব্যাপারে শিশুদের কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলা মানতে বাধ্য না করাই ভাল। এ ব্যাপারে যথেষ্ট নমনীয় নীতি গ্রহণ করতে হবে। সমস্যা দেখা দিলে প্রয়োজনমত শারীরিক রোগের বা মানসিক রোগের চিকিৎসকের বা মনঃসমীক্ষকের পরামর্শ নিতে হবে। বহুক্ষেত্রেই এ ব্যাপারে মায়েদেরও মনঃসমীক্ষকের পরামর্শ নেওয়া দরকার এবং পরিস্থিতি জটিল হলে তাদেরও মনঃসমীক্ষার প্রয়োজন আছে।

শিশুর মল-মূত্র ত্যাগ

শিশু জন্মাবার পূর্ব মুহূর্তে ছিল মাতৃগর্ভে ; একেবারে অন্য পরিবেশে, অন্য জগতে। যে ছিল একটি কোষ মাত্র, সে প্রায় চল্লিশ সপ্তাহ ধরে মাতৃগর্ভে লালিত হয়ে এই বাইরের জগতে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। কিন্তু এই প্রস্তুতি পর্বে শিশুর নিজের কোন দায়িত্ব নেই, নেই কোন প্রচেষ্টা। এমন কি প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য প্রাথমিক প্রচেষ্টা—শ্বাস গ্রহণ ও আহার গ্রহণ, তাতেও শিশুর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। মাতৃ-গর্ভে শিশু পরম নিশ্চিন্তে মাতৃ-নির্ভর হয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।

মাতৃগর্ভে এই নিশ্চেষ্ট, কর্মহীন ও নিশ্চিন্ত জীবন-যাপনের পর যে এই পার্থিব ও সামাজিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করল, তাকে জন্ম মুহূর্ত থেকেই বেঁচে থাকার জন্য উদ্যোগী হতে হয়। কারণ মাতৃগর্ভের পরিবেশ শিশুর উপযেগী করে তৈরি; আর এই নতুন পরিবেশে শিশুকে ধীরে ধীরে পরিবেশের উপযোগী হয়ে উঠতে হয়। কিন্তু এই উপযোগিতা এক মুহূর্তেই আসে না। মানব শিশুর ক্ষেত্রে এর জন্য দীর্ঘ সময় দরকার। মানব শিশুর শৈশব এর জন্যই নির্ধারিত, শৈশবই এই প্রস্তুতি পর্বের সময়। যেমন মাতৃগর্ভে চলে শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রস্তুতি, তেমনি শৈশবকালে চলে তার ভবিষ্যৎ জীবনে অবতীর্ণ হওয়ার প্রস্তুতি।

কাজেই জন্মাবার পরই শিশুর নিজের শরীরের উপর, নিজের প্রয়োজনবোধের উপর, নিজের কর্ম-প্রচেষ্টার উপর কোন রকমই নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে জীবন-সংগ্রামে নামতে হয়। তাই মুহূর্তে মুহূর্তে তার প্রচেষ্টার ধরনে, তার শরীরের নড়া-চড়ার ধরনে যেপরিবর্তন দেখা যায়, তার মধ্যে একটা উদ্দেশ্য ফুটে উঠতে থাকে। তাই জন্মের কয়েক ঘণ্টা পরেই শিশুর ঠোঁট, জিভ

নড়া-চড়ার মধ্যে একটা চোষার প্রবণতা দেখা যায়। এইভাবে একের পর এক, এবং একটি থেকে আর একটি কর্ম-প্রচেষ্টা দেখা দিতে থাকে। মাতৃ-গর্ভে তাকে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করতে হয় না, আহার করতে হয় না, মল-মূত্র ত্যাগ করতে হয় না। ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথেই শুরু করতে হয় শ্বাস-প্রশ্বাস, তাকে সমস্ত শারীরিক প্রচেষ্টা এই কাজের দিকে ধাবিত করতে হয়। শিশুর-জীবনে এ এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা—কর্ম-প্রচেষ্টা, জীবন-সংগ্রাম ও নতুনত্বের দিক থেকে। এর পরই আসে আহারের তাগিদ। আহারের সাথেই যুক্ত রয়েছে মল-মূত্র ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা।

প্রাণী মাত্রেরই বেঁচে থাকার জন্য খাওয়ার যেমন প্রয়োজন, মল-মূত্র ত্যাগের প্রয়োজনীয়তাও ঠিক তদনুরূপ। শরীরের অভ্যন্তরের অপ্রয়োজনীয় খাদ্যাবশেষ এবং শরীরের বিভিন্ন প্রক্রিয়াসঞ্জাত আবর্জনাসমূহ যথাসময়ে বেরিয়ে না গেলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। শরীরের সুস্থ ও স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার বাধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু মল-মূত্র ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা কেবল মাত্র শরীরের অপ্রয়োজনীয় পদার্থ বহিষ্করণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, যেমন খাদ্যগ্রহণের প্রক্রিয়াসমূহ কেবলমাত্র ক্ষুন্নিবৃত্তির কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মল-মূত্র ত্যাগের সাথে অপর কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক অনুভূতি এবং সামাজিক বোধ মিশে আছে ব'লে এই প্রক্রিয়াসমূহের সুষ্ঠু কার্যকারিতার সাথে শিশুর শারীরিক-মানসিক ক্রমবিকাশ ধারা জড়িত। এই কারণেই এই প্রক্রিয়াসমূহের স্বাভাবিক বিকাশধারা ব্যাহত হলে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশধারা প্রভাবিত হয়। আসলে শরীরবৃত্তের দিক থেকে দেখতে গেলে দেখা যায় যে মুখ, মলনালী (rectum) এবং লিঙ্গদ্বার ও মূত্রনালী (urethra) সমূহ একই ধরণের টিশু (tissue—দেহযন্ত্রের উপাদান) থেকে সৃষ্ট। কাজেই এই তিনটি স্থানের অনুভূতির মধ্যে কিছুটা মিল থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ মুখের সুখানুভূতি গ্রহণের যে ক্ষমতা রয়েছে, অপর দু'টি অঙ্গেরও তা রয়েছে। এই কারণেই

মল ও মূত্র ত্যাগ ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে একটা সুখবোধ মিলে-মিশে রয়েছে।

শিশুর অন্যান্য কর্ম-প্রচেষ্টার বিকাশের তুলনায় তার মল-মূত্র ত্যাগের প্রচেষ্টার বিকাশধারা অপেক্ষাকৃত মন্থর। এই প্রচেষ্টা শরীরের অভ্যন্তরের কতগুলি অনৈচ্ছিক (involuntary) প্রক্রিয়ার উপরে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ বিস্তারের উপর নির্ভরশীল। মল-মূত্র ত্যাগের প্রক্রিয়ার সাথে শরীরের অভ্যন্তরের এমন কতগুলি মাংসপেশী এবং দেহ-যন্ত্র যুক্ত রয়েছে যেগুলি বাইরের থেকে দেখা য়ায় না। কাজেই শিশু তার বাইরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর যত সহজে নিয়ন্ত্রণ আয়ত্ত করতে পারে, শরীর-অভ্যন্তরের কোন মাংসপেশী ও দেহযন্ত্রের উপর (যা প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিক মাংসপেশী বা যন্ত্র) তত সহজে নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করতে পারে না।

শিশুর প্রধান খাদ্য মাতৃ-দুগ্ধ, গো-দুগ্ধ বা কৃত্রিম দুগ্ধ। খাদ্যবস্তু শিশুর মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হলেই তার কতকগুলি অনুভূতি হয়। এই অনুভূতিসমূহ সুখকর। তাই খাদ্য-গ্রহণের সাথে এই সুখকর অভিজ্ঞতা মিশ্রিত হয়ে থাকে। মুখের খাদ্যবস্তু খাদ্যনালী দিয়ে পাকস্থলীতে যায়। তাই গিলে ফেলার পর খাদ্যবস্তুর পরিণতি সম্বন্ধে শিশুর কোনও ধারণা থাকে না। তার কাছে এ অনেকটা হারিয়ে যাওয়ার মত মনে হয়। কিন্তু খাদ্যবস্তু পাকস্থলীতে সঞ্চিত হবার পর শিশুর আর একটা অনুভূতি হয়। পরিপূর্ণ পাকস্থলী শিশুর কাছে একটা পরিতৃপ্তি নিয়ে আসে। খাদ্যবস্তু আবার স্থানান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে এই অনুভূতিরও পরিসমাপ্তি ঘটে। পাকস্থলীতে নানা প্রকারের জারক রস মিশ্রিত হয়ে খাদ্যবস্তু জীর্ণ হয় এবং অন্ত্রের দিকে যেতে থাকে। এই সময় খাদ্যবস্তুর নানা রূপান্তর ঘটতে থাকে। এই রূপান্তরিত খাদ্যই শরীর গঠনের কাজে রক্তের সাথে মিশে গিয়ে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে খাদ্যবস্তুর সবটুকুই শরীর

গঠনের কাজে নিঃশেষিত হয়ে যায় না বা হজম হয় না ; এমন কি তা মাতৃ-দুগ্ধ হলেও না।

খাদ্যবস্তু পাকস্থলী ছেড়ে চলে যাবার পর শিশু তার সম্বন্ধে আর কিছু জানতে পারে না, বুঝতে পারে না। খাদ্যবস্তুর এই পরিণতি শিশুর কাছে রহস্যাবৃত। কিন্তু অজীর্ণ ও অপ্রয়োজনীয় খাদ্যাংশ যখন মল-মূত্র রূপে আবার শরীর থেকে বেরিয়ে আসে তখন শিশু আবার অন্য কতকগুলি অনুভূতির প্রতি সচেতন হয়ে ওঠে। তিন চার বছর বয়স হলেই শিশু খাদ্যবস্তুর এই পরিণতি সম্বন্ধেও সচেতন হয়ে ওঠে। ভুক্তাবশেষ বৃহদন্ত্রের শেষ প্রান্তে জমতে থাকে ও একটা চাপ সৃষ্টি করে। সঙ্গে সঙ্গে মলনালীতে আন্দোলনের সৃষ্টি হয় ও মল বেরিয়ে আসে। মল বেরিয়ে আসার জন্য বৃহদন্ত্রের শেষ ভাগে বেশ কিছুটা মল জমা চাই। তা না হলে চাপ সৃষ্টি হয় না। তাই শিশুকে কয়েকবার খাওয়াবার পর যখন কয়েকবারের অজীর্ণ খাদ্যাংশ সেখানে জমা হয় তখনই কেবল মাত্র বৃহদন্ত্রের চাপ ও মলনালীতে আন্দোলন সৃষ্টি হয় ও মল বেরিয়ে আসে। কাজেই যারা শিশুকে যখন তখন মল ত্যাগ করাবার জন্য (শিক্ষণের উদ্দেশ্যে) প্রবৃত্ত হন তাদের মনে রাখতে হবে যে তারা শিশুর উপর অনর্থক মানসিক ও শারীরিক চাপ সৃষ্টি করছেন। মূত্র সঞ্চিত হওয়ার পর মূত্রথলি ও মূত্রনালীতেও শিশু অনুরূপ চাপ অনুভব করে। মল মূত্র ত্যাগের এই সকল প্রক্রিয়াসমূহের সঙ্গে যুক্ত অনুভূতিগুলি শিশুর কাছে সুখকর। প্রাথমিক অবস্থায় শিশুর এই সমস্ত প্রক্রিয়ার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। খুব ধীরে ধীরে সে এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করতে থাকে।

শিশু খাদ্য গ্রহণ করবে ; খাদ্যবস্তুর একটা অংশ হজম হয়ে শরীর গঠনের কাজে লাগবে ; অজীর্ণ অংশ মল-মূত্র আকারে বেরিয়ে আসবে—শরীরবৃত্তের এই প্রক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবেই চলতে থাকবে, এর মধ্যে আবার বিশেষত্ব কী আছে, এটাই মনে হওয়ার কথা। শারীরবৃত্তের এই প্রক্রিয়াসমূহ স্বাভাবিক ভাবেই চলত যদি না এর মধ্যে অন্য কোন

নিয়ম বা প্রক্রিয়ার হস্তক্ষেপ ঘটত। বাস্তব ক্ষেত্রে এই হস্তক্ষেপ ঘটবেই। এই বিরাট এবং বৈচিত্রবহুল জগতে কোন একটি এলাকার (যেমন শারীরবৃত্ত) নিয়মাবলী এবং প্রক্রিয়াসমূহ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রত্যেক এলাকার (যেমন জ্ঞানের বিভিন্ন দিক,—শারীরবৃত্ত, মনস্তত্ব, সমাজতত্ব, রসায়ন ইত্যাদি) নিয়ম ও প্রক্রিয়াগুলি পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে গড়ে উঠেছে। একটি আর একটি থেকে পৃথক নয়, বরং পরস্পর নির্ভরশীল। কারণ এই জগত একটি সুসংহত সামগ্রিক প্রণালী। তাই শিশুর মল-মূত্র ত্যাগের ব্যাপারটাকে কেবলমাত্র শারীরবৃত্তের দিক থেকে দেখলে চলবে না। মনস্তত্ব ও সমাজতত্বের প্রভাব এর উপর কীভাবে আসে তাও আমাদের বুঝতে হবে।

আমাদের সামাজিক ও পার্থিব জীবনে নানা কারণে শিশুর খাদ্য গ্রহণ, হজম প্রক্রিয়া ও মল-মূত্র ত্যাগের স্বাভাবিকতার মধ্যে বিঘ্ন দেখা দেয়। শিশু অসুস্থ হলে, অহেতুক ভাবে তাকে উত্তেজিত করলে তার মল-মূত্র ত্যাগের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে যায়। হজমের প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটলেও এই স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে যায়। খাদ্য যখন পাকস্থলীতে থাকে এবং সেখানে যখন হজম প্রক্রিয়াসমূহ পূর্ণ গতিতে চলতে থাকে তখন যেন শিশুকে কোনরূপ বিরক্ত বা উত্তেজিত করা না হয়। তার আশেপাশে কোলাহল সৃষ্টি করে তার হজমের ব্যাঘাত সৃষ্টি যেন না করা হয়। মনে রাখতে হবে যে খাদ্যবস্তু মুখে দেওয়া থেকে শুরু করে তার কিছু অংশ মল-মূত্র রূপে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত শরীরের অভ্যন্তরে নানা প্রক্রিয়া চলতে থাকে; এর কিছু কিছু প্রক্রিয়া শিশু অনুভব করতে পারে। এই অনুভূতির মধ্যে একটা আরাম বোধ রয়েছে। এর মধ্য দিয়ে শরীর সম্বন্ধে তার চেতনা হতে থাকে। এই চেতনার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে সে শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করতে শেখে। কাজেই এই অনুভূতিতে ব্যাঘাত ঘটলে শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশধারায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে।

দেখা গেছে যে শিশু এক-দেড় বছর বয়স প্রাপ্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত মল-মুত্র ত্যাগের উপর কোনরূপ নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা লাভ করতে পারে না। কারণ তার মলনালী ও মূত্রনালীর পেশীসমূহের উপর তখনও কোনরূপ নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা তার আসে না। যেমন কয়েক মাসের শিশুর হাতের মধ্যে কিছু গুজে দিলে সে ইচ্ছামত ঐ জিনিসটি ধরে রাখতে বা ছেড়ে দিতে পারে না। হাতের পেশীসমূহ তখনও তার নিয়ন্ত্রণে আসেনি। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এ ক্ষমতা আসে। তেমনি মল-মুত্রও সে ইচ্ছামত ধরে রাখতে বা ত্যাগ করতে পারে না। ধীরে ধীরে সে এ ক্ষমতা লাভ করে। মল-মুত্র ত্যাগের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ কিছুটা সঙ্গতি রেখেই চলে বলে অনেক মনোবিজ্ঞানী সন্দেহ করেন। কাজেই একটি ক্ষেত্রে বিঘ্ন দেখা দিলে তা অপর ক্ষেত্রের উপরও প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে শরীরের ক্ষমতার বিকাশ ঘটে। উপযুক্ত সময় (বয়স) না হলে যেমন শিশুকে জোর করে হাঁটতে শেখান যায় না, তেমনি উপযুক্ত সময় না হলে শিশুকে মল-মুত্র ত্যাগের উপর নিয়ন্ত্রণের শিক্ষণ দেওয়া যায় না। অত্যুৎসাহী হয়ে শিশুকে সভ্য বানাতে গেলে হিতে বিপরীতে হবে।

অনেক মায়েরা শিশু বার বার বিছানা নোংরা করবে, বার বার বিছানা ধুতে হবে, পায়খানা করে নোংরার মধ্যে শুয়ে থাকবে—এই সকল বিবেচনা থেকে শিশুকে খাওয়াবার পরই মল ত্যাগ করার জন্য ধরেন। অথবা প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে মল ত্যাগ করাবার জন্য চেষ্টা করেন বা শিক্ষা দেন। এ'সকল প্রচেষ্টার পেছনের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ত কিছুটা পরিশ্রম বাঁচানো। কিন্তু এরূপ করে কিছুমাত্র লাভ নেই। কারণ এরূপ শিক্ষা গ্রহণ করার মত ক্ষমতা হলেই কেবল মাত্র এই শিক্ষণ ফলপ্রসূ হয়। বরং উপযুক্ত সময়ের পূর্বেই এরূপ করলে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে হস্তক্ষেপ করা হবে, যার

পরিণতি শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর। এছাড়া শিশুর মল-মূত্র ত্যাগের ব্যাপারে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। যেমন, শিশুর খাওয়া কেবল মাত্র ক্ষুন্নিবৃত্তিই ঘটায় না, খাওয়া শিশুর সাথে তার মায়ের সম্পর্ক স্থাপনের একটা বিশেষ মাধ্যমও। তেমনি মল-মূত্র ত্যাগ করার মধ্য দিয়েও শিশু তার মায়ের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ পায়। খাওয়া এবং মল-মূত্র ত্যাগ ছাড়া শিশুর কাছে বড়দের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম হিসাবে আর কীই বা আছে? আমরা বড়রা একে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য জিনিস-পত্র উপহার দিই ও চাই, টাকা পয়সা দিই ও চাই, কথা বলি, ভালবাসার কথা শোনাই ও শুনি, সেবা করি ও সেবা গ্রহণ করি ইত্যাদি আরও কত পদ্ধতি অবলম্বন করি। শিশুর পক্ষে এর কোনটাই সম্ভব নয়; এ সকল ক্ষমতা তার নেই। তার তুণে মাত্র কয়েকটি তীর। খাওয়া এবং মল-মূত্র ত্যাগ তার মধ্যে দু'টি। যাঁরা লক্ষ্য করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই দেখেছেন, ছোট শিশু বিছানায় শুয়ে আছে, পায়খানা বা প্রস্রাব পেয়েছে বা করে ফেলেছে। তখন সে মুখ দিয়ে নানা রকম শব্দ করতে থাকে। (ভাবখানা যেন মাকে উদ্দেশ্য করে বলছে "আমি প্রস্তুত, তুমি এসো", বা "করে ফেলেছি, তুমি আসবে কি?") এ সকল শব্দ শুনে যোগ্যা এবং বুদ্ধিমতী মা এগিয়ে আসেন। তিনি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন। তিনি এগিয়ে আসেন এজন্য নয় যে বিছানাপত্র সব নোংরা করে ফেলল, আবার ধুতে হবে। তিনি কখনই এজন্য উদ্বেগ বা উত্তেজনা দেখান না। তিনি এগিয়ে আসেন. কারণ এই সময় শিশুকে সাহায্য করা দরকার। আর এ ব্যাপারটা শিশুর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ মায়ের কাছেও তা গুরুত্বপূর্ণ।

অনেক মা আছেন যাঁরা শিশুকে স্বস্তির সঙ্গে কোলে নিতে ভয় পান, পাছে শিশু তাঁর কাপড়-চোপড় নোংরা করে দেয়। এই সকল

মায়েরা শুরুতেই শিশুর সাথে তাঁর সম্পর্কের ভিতটা নড়বড়ে করে রাখেন। ফলে শিশুর মনে নানা উদ্বেগ, ভয়, অনিশ্চয়তাবোধ দেখা দেয়, যার থেকে নানা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যহীনতা দেখা দিতে পারে। এর থেকে শিশু মল-মূত্র ত্যাগ করাটাকে একটা অবাঞ্ছিত ব্যাপার বলে ঘৃণা করতে থাকে যার ফল খুবই ক্ষতিকর। অনেকে আছেন যাঁরা অতি তাড়াতাড়ি শিশুকে নির্দিষ্ট জায়গায় বা পাত্রে পায়খানা-প্রস্রাব করতে শেখাবার চেষ্টা করেন। এর ফলে শিশুর মনে ভয় দেখা দিতে পারে এবং বেগ হলেও শিশু পায়খানা বা প্রস্রাব আটকে রাখার চেষ্টা করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যত্র-তত্র করে ফেলতে বাধ্য হয়। এরূপ ঘটনা ঘটলে সে আরও বিহ্বল হয়ে পড়ে। এরূপ শিক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টার ফলে এমন ঘটনাও দেখা গেছে যে শিশু চোদ্দ-পনের দিনের মধ্যে মল ত্যাগ করছে না। শেষে তাকে নানা কৃত্রিম উপায়ে মল ত্যাগ করাতে হয়েছে। কারণ সে ঠিক মত খেতে পারছিল না এবং শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। এরূপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে একটা সুখকর অভিজ্ঞতা বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়।

ছোট্ট শিশু কিছু সময় পরই পায়খানা ও প্রস্রাব করে থাকে। তার মল-এর মধ্যে জলীয় অংশের আধিক্য থাকে ; কারণ সে মল ধরে রাখতে পারে না বলে মলনালীর মধ্যে এর জলীয় অংশ শোষিত হওয়ার সময় পায় না। কিন্তু কিছুদিন পরে যখন মল অপেক্ষাকৃত কঠিন হতে থাকে তখন ঐ মল নালীর মধ্যে অধিকক্ষণ ধৃত থাকে। ফলে শিশু আর একটা নতুন অনুভূতি উপলব্ধি করতে আরম্ভ করে। এই কঠিন মল যখন কিছু সময় ধৃত থাকার পর বেরিয়ে আসে তখনও তার একটা অনুভূতি হয়। এ সকল অনুভূতি সুখকর। প্রস্রাব ধরে রাখা এবং তা বেরিয়ে আসার মধ্যে অনুরূপ সুখকর অনুভূতি রয়েছে। শিশুর এই সুখভোগ ও ধরে রাখার প্রবণতাকে মায়েদের কাজে লাগাতে হবে। এই সুখভোগের সাথে সাথে সে যখন

মল-মূত্র ত্যাগের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মায়ের নজর লাভ করতে থাকবে তখন তাকে এ ব্যাপারে শিক্ষা দেওয়া সহজ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ তার প্রয়োজনের সময় মায়ের সাহায্যের মধ্য দিয়ে সে মায়ের ভালবাসার সম্পর্ক অনুভব করতে থাকবে ও এই পরিস্থিতির মধ্যে মল-মূত্র ধরে রাখা উপযুক্তভাবে পুরস্কৃত হবে। মল-মূত্রের বেগ হলেই সে মায়ের জন্য অপেক্ষা করতে চাইবে এবং মা না আসা পর্যন্ত ধরে রাখার চেষ্টা করবে। এইভাবে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা বাড়তে থাকবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে মায়েদের অবহেলা ও শিশুর সাহায্যে অহেতুক বিলম্বের মধ্য দিয়ে এই পরিস্থিতিগুলি যেন নষ্ট হয়ে না যায়। শিশুর জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিগুতিলিতে যেন মা-বাবা বা মাতৃস্থানীয়া ব্যক্তিরাই এগিয়ে আসেন। শিশুর সাথে আবেগের সম্পর্ক-শূন্য, মাইনে করা আয়াদের উপর যেন শিশুর মল-মূত্র ত্যাগের পরিস্থিতিগুলি সম্পূর্ণ ছেড়ে না দেওয়া হয়। এরূপ করলে মায়েরা তাদের সন্তানের সাথে যথাযথ সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন এবং এর ফলে শিশুর ব্যক্তিত্বে আসতে পারে ভার-সাম্যহীনতা।

ছোট্ট শিশুর মল-মূত্র ত্যাগের সময় তাড়া-হুড়া করা কোনক্রমেই উচিত নয়। তাকে এর জন্য উপযুক্ত সময় দিতে হবে। এই প্রক্রিয়া-গুলির মধ্যে যে সুখানুভূতি রয়েছে তা তাকে উপভোগ করতে দিতে হবে। অযথা তাড়াতাড়ি করতে গেলে শিশু বিহ্বল হয়ে পড়বে। আবার ছোট্ট শিশুকে মল-মূত্রে ভেজা বিছানায় রাখা কোনক্রমেই ঠিক নয়। এতে যেমন শিশুর অস্বাস্ত বোধ হতে থাকে, অন্য দিকে শিশুর গায়ের চামড়া নরম থাকায় ভেজা বিছানায় থাকার জন্য শিশুর শারীরিক ক্ষতি হতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রেই শিশুর প্রস্রাব করার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে চার-পাঁচ বছরও কেটে যেতে পারে। বিশেষতঃ রাত্রে বিছানায়

প্রস্রাব করার ব্যাপারে। দিনের বেলা প্রস্রাব করার উপর নিয়ন্ত্রণ অনেক আগেই এসে যায়। বিছানা ভেজান'র উপর নিয়ন্ত্রণ আসতে শিশুর চার-পাঁচ বছর বা আরও বেশি সময় কেটে গেলে ভয়ের কিছু নেই; কারণ অনেক ক্ষেত্রেই এর সাথে শিশুর অনেক রকমের আবেগ যুক্ত থাকে। কাজেই প্রস্রাব করার উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে গেলে শিশুর এই আবেগের দিকটায় নজর দেওয়া দরকার। মল-মূত্র ত্যাগের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সকল শিশুর একই সময়ে আসে না। এ ব্যাপারে শিশুতে শিশুতে পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। আবার শিশু বয়সে এই নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা একবার এলেই যে তা ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে, তা নয়। এমনও হতে পারে যে হয়ত দু'বছর বয়সেই শিশু প্রস্রাব করার ব্যাপারে খুব সতর্ক হয়ে গেল, বিছানা ভেজান বন্ধ করে দিল। কিন্তু কিছু দিন পরে আবার এ ব্যাপারে ত্রুটি দেখা দিতে পারে; আবার বিছানা ভেজান শুরু করতে পারে। একবার এ ক্ষমতা আয়ত্ত এলেও মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম দেখা দিতে পারে।

প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আয়ত্ত করার অনেক আগেই শিশুরা মলত্যাগ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আয়ত্ত করে। যদিও এ ব্যাপারেও শিশুতে শিশুতে যথেষ্ট প্রভেদ থাকাই স্বাভাবিক। এ ব্যাপারেও অর্জিত নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা মাঝে মাঝে শিথিল হয়ে যেতে পারে। এখানে মনে রাখতে হবে যে উভয়বিধ প্রক্রিয়ার উপর অর্জিত নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা প্রয়োগে যদি শিশু কখনও শিথিলতা দেখায় তাহলে তা নিয়ে যেন তাকে অযথা বিরক্ত ও অপমানিত না করা হয়। এ জাতীয় শিথিল মুহূর্তে এমনিতেই শিশু লজ্জিত হয়ে পড়ে। কাজেই এ সময়ে তার সমস্যা সহানুভূতির সাথে বিচার করতে হবে। এরূপ শিথিলতার পিছনে নিশ্চয়ই কোন শারীরিক অথবা মানসিক কারণ রয়েছে বলে বুঝতে হবে। তার শরীর অসুস্থ হতে পারে, খাওয়া-দাওয়ায় অনিয়ম হতে পারে, অত্যধিক জলীয় পদার্থ পান করতে পারে, স্কুলে যেতে

আরম্ভ করার জন্য বেশি পরিশ্রম হতে পারে বা স্কুলে যাওয়ার অনিচ্ছা হতে পারে। আবার বাড়ীতে নতুন ভাই-বোনের জন্ম হয়েছে, সেজন্য তার আবেগ-জগতে নানা প্রতিক্রিয়ার ফলে এরূপ হতে পারে। মায়ের অসুস্থতার জন্য মা হাসপাতালে গেলেন, সেজন্য হতে পারে। মা-বাবার যথাযথ সম্পর্কের অভাবের জন্য (যার ফলে শিশুর মনে নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়) হতে পারে। বাড়ীতে কোন রকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, যার ফলে বাড়ীর সুস্থ আবেগের আবহাওয়া নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তার জন্যও হতে পারে। গত যুদ্ধের সময় বৃটেনে যখন শিশুদের নিরাপত্তার জন্য তাদের মা-বাবার কাছ থেকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল তখন ঐ শিশুদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এই শিথিলতা দেখা দিয়েছিল। মা-বাবার ভালবাসা পাওয়ার ব্যাপারে যদি শিশুর মনে অভাববোধ জাগে তাহলেও এই শিথিলতা দেখা দিতে পারে। আবার বড়দের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যও শিশু অনেক সময় মল-মূত্র নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে অবচেতনভাবে শিথিলতা দেখায়। সে পরোক্ষ ভাবে প্রমাণ করতে চায় যে সে এখনও শিশু রয়েছে; এখনও তার প্রতি সকলের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। বাড়ীতে নতুন শিশুর আবির্ভাবের ক্ষেত্রে বা পিঠাপিঠি ভাইবোনের মধ্যে রেষারেষির ক্ষেত্রে এই শিথিলতা অনেক বেশি দেখা যায়। কাজেই শিথিলতা দেখা দিলেই শিশুকে সমালোচনা করে লাভ নেই। তার সমস্যাগুলোর সমাধানে তাকে সাহায্য করাই তখন একমাত্র কর্তব্য। এ ব্যাপারে প্রয়োজন হলে মনঃসমীক্ষকের সাহায্য নিতে হবে। নতুবা লজ্জায় ও অপমানে শিশু সমস্ত ব্যাপারটা গোপন করার চেষ্টা করবে, মিথ্যা কথা বলবে এবং বলতে শিখবে; অন্যের উপর দোষারোপ করবে। এই জন্যই এরূপ ঘটনাও দেখা গেছে যে বিছানায় প্রস্রাব করার পর শিশু খুব জোরের সঙ্গে বলছে যে বেড়াল প্রস্রাব করে গেছে।

মল-মূত্র নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্জনের ব্যাপারে আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি, ভাবধারা এবং মা-বাবার ধারণাসমূহ শিশুর উপর যথেষ্ট প্রভাব

বিস্তার করে। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়া দু'টি কেবলমাত্র শারীরিক প্রক্রিয়াই নয়, এ'দুটি মানসিক প্রক্রিয়াও। শিশু নিজে থেকেই মল ও মূত্রকে নোংরা বলে ভাবতে শেখে না। বরং সে মল ও মূত্র ঘাটাঘাটি করতে ভালবাসে। এ বস্তু দু'টি তার শরীর সঞ্জাত, এদু'টি তারই সৃষ্ট। কাজেই এর প্রতি তার একটা আকর্ষণ থাকে। আবার এদু'টি বহিষ্করণের পূর্বে একটা শারীরিক-মানসিক চাপ (tension) এবং বহিষ্করণের পরে এই চাপের নিবৃত্তি ও আরাম বোধ হয়। কাজেই মল-মূত্রের প্রতি ছোট্ট শিশুর আকর্ষণ থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু শিশুকেও এই সমাজ-সংস্কৃতির উপযোগী হয়ে উঠতে হয়। তাই সে ধীরে ধীরে এ বস্তুগুলিকে নোংরা ভাবতে শেখে। আবার পায়খানা-প্রস্রাবে শরীর ভিজে থাকলে তার একটা শারীরিক অস্বস্তিও হয়। তাই সে এগুলিকে পরিহার করে, মল-মূত্র ত্যাগের প্রক্রিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় মল-মূত্র ত্যাগ থেকে শিশু যে সুখ অনুভব করে তা তাকে উপভোগ করতে না দিয়ে অহেতুক ব্যস্ততার সঙ্গে তাকে সভ্য করে তোলার চেষ্টা করা হলে তার ক্ষতিই সাধন করা হবে। পায়খানা-প্রস্রাব সম্বন্ধে তার অহেতুক ভয় দেখা দেবে, নোংরা সম্বন্ধে অহেতুক সচেতনতা দেখা দেবে এবং এর থেকে তার ব্যক্তিত্বে নানা অস্বাস্থ্যকর উপসর্গ দেখা দিতে পারে। পায়খানা প্রস্রাব সম্বন্ধে কোন কোন মা-বাবার অত্যধিক নোংরাবোধই শিশুর এরূপ ক্ষতি সাধন করে থাকে।

মনঃসমীক্ষার মধ্য দিয়ে দেখা গেছে যে মল-মূত্র ত্যাগের সাথে যৌন অঙ্গগুলি সংযুক্ত থাকার জন্য আমাদের সমাজে মল-মূত্র সম্বন্ধে এত সতর্কতা, গোপনীয়তা ও নোংরাবোধ গড়ে উঠেছে। মল-মূত্র সম্বন্ধে ধারণাসমূহের মধ্যে যৌনতা (sex) সম্বন্ধে সমাজের ও বড়দের মনোভাব ও ধারণাসমূহের প্রভাব প্রতিফলিত। আবেশিক ও অনুকর্ষী বায়ু-রোগগ্রস্ত (obsessive-compulsive psychc-neurotic)

রোগীদের নোংরা ও মল-মূত্র সম্বন্ধে অত্যধিক সচেতনার মধ্যে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলেছে। মল-মূত্র সম্বন্ধে অত্যধিক ও অহেতুক নোংরা-বোধ, এগুলির দ্বারা শরীরের ক্ষতি হতে পারে ইত্যাদি ধারণা যৌনতা সম্বন্ধে সামাজিক ধারণারই প্রভাব। অর্থাৎ যৌনতা নোংরা, যৌনতা ক্ষতি করতে পারে ইত্যাদি ধারণারই প্রভাব। যেন মল-মূত্র আড়াল করে যৌনতাকে আড়াল করা হচ্ছে। মল-মূত্র যৌন অঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে আসে, মল-মূত্র ত্যাগ করার সাথে যৌন অঙ্গের কথা মনে করতে পারে। তাই শিশুকাল থেকেই আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি আমাদের মনে মল-মূত্র সম্বন্ধে সতর্ক গোপনীয়তা ও লজ্জার মানসিকতা জাগিয়ে তোলে। একটি সাধারণ ঘটনার উল্লেখ করা যাক। স্কুলের ছেলে-মেয়েরা পায়খানা বা প্রস্রাব করার জন্য ক্লাশের বাইরে যেতে হলে তারা শিক্ষক-শিক্ষিকার অনুমতি চাইবার সময় বলে থাকে "বড় বাইরে যাব" বা "ছোট বাইরে যাব"। খুব বেশি হলে বলে, "বাথরুমে যাব।" এটা তাদের শেখান হয়। মেয়েদের মধ্যে পায়খানা-প্রস্রাব করার সরাসরি উল্লেখ আরও কম। এই প্রক্রিয়ার সরাসরি উল্লেখ সভ্যতাবিরুদ্ধ। অথচ আমরা খেতে যাওয়ার সময় বলি না যে "রান্না-ঘরে যাই"। অনেকেই নাকের কফ রুমালে মুছে অনায়াসেই তা পকেটে রেখে দেন। কিন্তু তাঁরাই বাড়ীর কোন শিশু পায়খানা করে প্যান্ট নষ্ট করে দিলে বা রাস্তায় চলতে গিয়ে মলে পা দিলে তাকে স্নান করিয়ে ছাড়েন। কাজেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দোহাই দিয়ে মল-মূত্র সম্বন্ধে এরূপ ধারণা অবলম্বন করা অবৈজ্ঞানিক। এরূপ পরিবেশে লালিত-পালিত হয়ে শিশুরা স্বভাবতই মল-মূত্র সম্বন্ধে একটা অবৈজ্ঞানিক মনোভাব অর্জন করে; যে সমস্ত পরিবারের মধ্যে এই মনোভাব মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে সে সমস্ত পরিবারের শিশুদের মধ্যে সহজ মনোভাবটি অতিমাত্রায় অবদমিত হয়ে একটা অবৈজ্ঞানিক মনোভাব গড়ে ওঠে। মনে রাখতে হবে যে মল-মূত্র সম্বন্ধে সহজ স্বাভাবিক মনোভাব এবং মল-মূত্র ত্যাগের সাথে যুক্ত সুখকর অনুভূতি-

গুলি শিশু বয়সে অতিমাত্রায় অবদমিত হলে তার দ্বারা শিশুর স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ খর্ব হতে পারে। এমন কি এর ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে সে নানা রকমের মানসিক-শারীরিক রোগের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। বহু কোষ্ঠ-কাঠিন্য (constipation) ও আমাশয় রোগ-গ্রস্ত লোকের মনঃসমীক্ষণ চিকিৎসায় এর প্রমাণ মিলেছে। তাই এই জাতীয় অনেক শারীরিক রোগের প্রকৃত চিকিৎসা মনঃসমীক্ষা। কাজেই মনে রাখতে হবে যে মা-বাবারা যদি তাদের নিজেদের ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে শিশুর মল-মূত্র ত্যাগ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে অহেতুক তাড়াহুড়া করেন, ভয় দেখান বা শাস্তি প্রয়োগ করেন তাহলে একটা স্বাভাবিক বিকাশমান প্রক্রিয়ার উপর হস্তক্ষেপ করা হবে। যার ফলে শিশুর মানসিক বিকাশও খর্ব হতে থাকবে; শিশু তার ভবিষ্যৎ জীবনে সকল প্রকার যৌন সুখ ও অন্যান্য সুখ ভোগের ইচ্ছা খর্ব করতে থাকবে। সকল রকম স্বাধীনতাকেই সে বিপদজনক মনে করতে পারে; সব ব্যাপারেই খুঁতখুতে, খিটখিটে, অত্যধিক নিয়ম-মাফিক হয়ে পড়তে পারে যা স্বাভাবিক কাজের ছন্দকে ব্যাহত করে। নিজের প্রতি ও অন্যের প্রতি তার একটা শাস্তিদাতার মনোভাব গড়ে উঠতে থাকে। সে নিজেকে নোংরা, অপদার্থ, অযোগ্য মনে করতে থাকে; নিজের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিতে বিচলিত হয়ে পড়ে ও নিজেকে অমার্জনীয় মনে করে। কাজেই সমস্ত ব্যাপারটা বড়দের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে না দেখে বা বড়দের মূল্যবোধ দিয়ে বিচার না করে শিশুর প্রয়োজন ও তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে হবে। যে ব্যাপারটা শিশুর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যে ব্যাপারের মধ্য দিয়ে ছোট্ট শিশু তার মা-বাবার সাথে যোগাযোগের সুযোগ পায়, যে ব্যাপারটা শিশুর শারীরিক ও মানসিক অনুভূতির একটা বিরাট অংশ দখল করে থাকে, সে ব্যাপারটাকে এত তুচ্ছ ভাবে, এত ভুল ভাবে গ্রহণ করলে আমরা আমাদের শিশুদের ক্ষতি করব। শিশু-মনের একটা অংশ দখল করে রাখে এই মল-মূত্র ত্যাগ প্রক্রিয়া। শিশু এ নিয়ে নানা

পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। বিশেষ করে মূত্র ত্যাগের ব্যাপারে পুরুষ শিশুর পরিস্থিতি মেয়ে শিশু অপেক্ষা ভিন্নতর। তার মূত্র ত্যাগের দেহযন্ত্র তার কাছে এত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং সে এত সহজেই তা নাড়াচাড়া করতে পারে যার ফলে প্রস্রাব করাটা তার কাছে আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়ায়। শিশুকে তার দৈহিক প্রক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কিছুটা সুযোগ না দিলে সে নিরুৎসাহী ও অলস প্রকৃতির হয়ে পড়তে পারে।

মল-মূত্র সম্বন্ধে উপরে আলোচিত ধারণাসমূহ বোধ হয় প্রধানতঃ শিক্ষিত সমাজেই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। যৌনতা সম্বন্ধেও এরা একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। সাধারণ দরিদ্র কৃষক ও মজুর শ্রেণীর মধ্যে যৌনতা ও মল-মূত্র সম্বন্ধে মানসিক বাধা অপেক্ষাকৃত কম। তারা এগুলোকে এতটা গোপনীয় মনে করে না। তাদের ভাষায় যৌনতার উল্লেখ তেমন আবৃত নয়। ফলে মল-মূত্র সম্বন্ধেও তাদের তেমন নোংরাবোধ ও ছোঁয়-ছানির ভয় দেখা যায় না। পৃথিবীতে এখনও বহু সমাজ রয়েছে যাদের মধ্যে যৌনতার প্রকাশ আধুনিক সমাজের মত ততটা বাধাপ্রাপ্ত নয়। এদের মধ্যে শিশুদের মল-মূত্র ত্যাগ প্রক্রিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা আনয়নের তাগিদ আধুনিক সমাজের অপেক্ষা বিলম্বিত। কাজেই এদের শিশুরা মল-মূত্র ত্যাগের সাথে যে সুখবোধ, তা অধিক দিন ধরে উপভোগ করার সুযোগ পায়। আমাদের দেশের গ্রাম-গাঁয়ের সংস্কৃতির মধ্যেও শিশুদের এই সুযোগ অপেক্ষাকৃত অধিক। এই সংস্কৃতির ছাপ এই সকল সমাজের মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ধারার মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের মানুষের ব্যক্তিত্বের উপর এ ব্যাপারটা হয়ত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। আমরা শহরাঞ্চলের মানুষের মধ্যে পেটের রোগের আধিক্য দেখতে পাই। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে—একি কেবলই দূষিত পানীয় জলের জন্য? কেবলই খাওয়া-দাওয়ার জন্য? না এর সাথে মানসিক গঠনের কিছু

যোগ রয়েছে ; যে মানসিক গঠনের উপর মল-মূত্র ত্যাগ সম্বন্ধে ধারণা ও শিক্ষণ প্রণালী প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রশ্নের উত্তরের সঠিক অনুসন্ধানের জন্য শারীরিক রোগের চিকিৎসক ও মনঃসমীক্ষকদের একসঙ্গে গবেষণায় ব্রতী হওয়া দরকার। তা না হলে আমরা বিস্তর ওষুধ গিলেও এর কিছু সুরাহা করতে পারব না এবং প্রকৃত রোগ নির্ণয়ও সম্ভব হবে না। রোগ চিকিৎসায় এই 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' অবস্থায় চলা কি বিজ্ঞানসম্মত ?

অনেক সময় দেখা গেছে চার-পাঁচ বছর বয়সের শিশুরা মল-মূত্র ত্যাগ করাকে আক্রমের (aggression) বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে থাকে, বিশেষ করে মা-বাবার প্রতি আক্রমের। অধিক বয়স পর্যন্ত বিছানায় প্রস্রাবের কারণসমূহের মধ্যে এটিও একটি। গ্রাম-গাঁয়ে বা অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ রূপে বলতে শোনা যায় 'তোর মুখে হাগি' বা 'তোর মুখে পেচ্ছাপ করি'। শিশুর মধ্যে যদি এই আক্রমের প্রকাশ দেখা যায় তা হলে পায়খানা-প্রস্রাব করা নিয়ে তাকে যতই শাস্তি দেওয়া হোক, তাতে কোনই লাভ হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্যে মূল কারণটি অপসারণ করতে হবে।

সর্বোপরি মনে রাখতে হবে যে শিশুকে নিশ্চয়ই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য মল-মূত্র নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা অর্জনের শিক্ষা দিতে হবে, কিন্তু উপযুক্ত সময়ে। অর্থাৎ যখন তার শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা এই শিক্ষাগ্রহণের যোগ্য হবে। অতি শৈশবে শিশু যে কেবল শারীরিক ক্ষমতায়ই অপটু থাকে, তাই নয়। মল-মূত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য তার মানসিক ক্ষমতাও থাকে না। অর্থাৎ পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলার মত, সমাজ-সংস্কৃতির মূল্যবোধ গ্রহণ করার মত মানসিক ক্ষমতা তার থাকে না ; তার অহং-শক্তির বিকাশ তদনুরূপ হয় না। ফলে মনের দিক থেকেও এই শিক্ষা সে গ্রহণ করতে পারে না। তার কাছে কতগুলি অর্থহীন অভ্যাসের মূল্য নেই। সময় যখন

আসবে তখন শিশু নিজের থেকেই এই নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা অর্জনের জন্য উদ্যোগী হবে। কারণ মল-মূত্র নিয়ন্ত্রণের একটা প্রবণতাও শিশুর মধ্যে থাকে। নির্দিষ্ট জায়গায় কিছুটা গোপনীয়তার মধ্যে মল-মূত্র ত্যাগ করার প্রবণতাও শিশুর বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে আপনা থেকেই দেখা দিতে থাকে। এমন কি অনেক পশুর মধ্যেও এ ব্যাপারে গোপনীয়তা অবলম্বন করতে দেখা যায়। শিশু যে মল-মূত্র ত্যাগ করার ও ঘাটাঘাটি করার মধ্য দিয়ে কেবল সুখই লাভ করে তা নয়। এই প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ না করলে যে তার অসুবিধাও আছে তা সে ধীরে ধীরে অনুভব করতে থাকে। তাই সে মল-মূত্র নিয়ন্ত্রণ করতেও চেষ্টা করে। সময়মত এই সহজাত প্রবণতাকে শিক্ষণের দ্বারা ত্বরান্বিত ও পরিমার্জিত করতে হবে। এ ব্যাপারে দু'চার মাস আগে পরের ব্যবধানে কিছুই আসে যায় না।

শিশুর শেখা

বেঁচে থাকতে হলে শিখতে হয় ; অর্থাৎ পরিবেশের সাথে কিভাবে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকতে হবে, পরিবেশকে কিভাবে নিজের প্রয়োজন মেটাবার কাজে লাগান যেতে পারে তা ধীরে ধীরে শিখে নিতে হয়। উচ্চতর প্রাণীদের বেলাতেই যত শেখার ঝামেলা ; নিম্নতর প্রাণীশ্রেণীর শরীরযন্ত্রে এমন কতকগুলি প্রতিবর্ত (reflex)-মূলক ব্যবস্থা রয়েছে যাতে তাদের অত শেখার ঝামেলার মধ্যে যেতে হয় না। তারা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ছক কাটা ধারায় যন্ত্রের মত প্রতিবেদনের বা প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জীবনধারাকে বয়ে নিয়ে যায়। প্রাণী-শ্রেণীর মধ্যে মানুষই উচ্চতম। প্রাণচেতনার বহিঃপ্রকাশ তার মধ্যেই জটিলতম ও মধুরতম ভাবে প্রস্ফুটিত। কাজেই শুধুমাত্র প্রতিবর্তমূলক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে তার জীবন ধারা গড়ে ওঠেনি। তাকে সব কিছু নিজের মত করে শিখে নিতে হয়। তাই মানব শিশুর জন্মমুহূর্ত থেকেই শুরু হয় শেখা, আর এই শেখার কাজ চলতে থাকে সমগ্র জীবন ধরে, এবং মানব প্রজাতির বিবর্তন ধারার যুগ যুগ ধরে।

অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও কাজের বা প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যখন আমাদের আচরণে যথাযথ পরিবর্তন আসে তখন তাকে বলে থাকি শেখা। পশ্চিমদেশীয় কোন কোন আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর মতে (যেমন D. K. Spelt, 1938 ; Conditioned responses in the human fetus in utero ; Psychol. Bulletin ; 35 এবং 1948 ; The conditioning of the human fetus in utero ; J. of Experimental Psychol. 38.) শিশুরা মাতৃগর্ভে অবস্থান কাল থেকেই শিখতে আরম্ভ করে। মাতৃগর্ভে শিশুর সাত থেকে ন' মাস অবস্থানকাল সময়ে মায়ের উদরের কাছে এক রকম বাদ্যযন্ত্রের শব্দ করে গর্ভস্থ শিশুর প্রতিক্রিয়া-

সমূহ লক্ষ্য করা হয়েছে। এই প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটি বিশেষ ধরন (pattern) নজর করা গেছে, যা নাকি সাপেক্ষ প্রতিবর্তকের (conditioned reflex) সমতুল্য। এই সকল প্রতিক্রিয়া গর্ভস্থ শিশুর অভ্যাসে পর্যবসিত হয়।

এরপর নবজাত শিশুদের নিয়ে পরীক্ষা করে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত-মূলক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হয়েছে। দুই থেকে ন'দিন বয়সের শিশুদের দুধ খাওয়ার সময় পাঁচ-ছ'দিন ধরে একটা বাজনার শব্দ করে দেখা গেছে যে পরে কেবলমাত্র বাজনার শব্দেই শিশু দুধ খাওয়ার সময়কার মুখের চোষার ভঙ্গিসমূহ প্রদর্শন করে (D. P. Marquis, 1931 ; Can conditioned reflexes be established in the new-born ? J. of Genetic Psychol ; 39.)।

উপরের এই সমস্ত আধুনিক পরীক্ষাসমূহের দ্বারা এটা বোঝা যাচ্ছে যে সদ্যোজাত শিশু এমনকি মাতৃগর্ভস্থ শিশুরও শেখার ক্ষমতা থাকে। সেও বাইরের পরিবেশের উদ্দীপকসমূহের প্রতি সাড়া দেয় এবং নিজের আচরণ প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমার্জিত করে। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের প্রাচীনপন্থীদের দ্বারা গর্ভবতী নারীর আচরণবিধি নিয়ন্ত্রণের কিছু কিছু নির্দেশ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গর্ভবতী নারীর যদৃচ্ছা আচরণ, চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি গর্ভস্থ শিশুর পক্ষে হিতকর নয়। এমন কি গর্ভবতী নারীর কোন কোন উত্তেজনাপূর্ণ মানসিকতাও গর্ভস্থ শিশুর পক্ষে হানিকর হতে পারে বলে সন্দেহ করা যেতে পারে। কাজেই শিশুর শিক্ষায় মায়ের আচরণ এবং পরিবেশের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ শিশু জন্মাবার আগে থেকেই বিশেষ প্রয়োজন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানী ও ফ্রয়েড প্রমুখ বিজ্ঞানীদের মতে শিশুর গর্ভস্থ কাল থেকে পাঁচ-ছ'বছর বয়স পর্যন্তই হলো শিশুর জীবনের আসল শিক্ষাকাল। এই সময়কার শিক্ষার উপরই তার ভাবীকালের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে এবং এটাই হলো ভাবীকালের শিক্ষার ভিত্তি ; আর এই ভিত্তির দৃঢ়তাবিধানে মায়ের অবদান অসামান্য।

একটি শিশু তার জন্ম মুহূর্ত থেকেই শিখতে থাকে। কিন্তু তার শেখার ধরন আমাদের বড়দের সাথে মেলে না, কারণ বাইরের জগতের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি বড়দের থেকে আলাদা। মনে রাখতে হবে বড়দের দৃষ্টিভঙ্গির পরিপক্বতা শিশুদের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই শিশুর আচার-আচরণ এবং বাইরের জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির দ্রুত পরিবর্তন ও পরিমার্জনের জন্য অহেতুক শিক্ষার চাপ সৃষ্টি করে লাভ নেই। যে মানসিক পরিপক্বতা শিক্ষার জন্য প্রয়োজন আমাদের তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এই মানসিক পরিপক্বতা একটি শিশু ঠিক কত মাস বয়সে লাভ করবে বলা কঠিন। বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে এর কিছু কিছু তারতম্য দেখা যায়। তবে একটা গড় বয়স নিশ্চয়ই অনুমান করা যায়। কেবলমাত্র বয়স ও বুদ্ধিবৃত্তিই নয়, শরীরযন্ত্র ও মানসযন্ত্রের পরিপক্বতাও শিক্ষার জন্য প্রয়োজন। কাজেই শিক্ষার ভিত্তি স্বরূপ আবেগের পরিপক্বতাও বিশেষ প্রয়োজন।

শিশু হাঁটতে ও কথা বলতে শেখার আগেই সে তার দৈনন্দিন জীবনের চারপাশের যে সকল বস্তুসামগ্রীর সংস্পর্শে আসে সে-সকল সম্বন্ধে জানতে চায়, বুঝতে চায়—জিনিসগুলি কি, সেগুলি সে কিভাবে ব্যবহার করতে পারে, সেগুলির আচরণ কিরূপ ইত্যাদি। শিশু তার শেখার প্রথম পর্বে বিভিন্ন জিনিস সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে ধরা-ছোঁয়ার মধ্য দিয়ে। তার কাছে জ্ঞানলাভের আরেকটি সহজ উপায় হলো মুখের সাহায্যে পরখ করা ; অর্থাৎ সে হাতের কাছে যা কিছু পাচ্ছে তাই একবার মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে দেখতে চায় জিনিসটি কি ধরনের। মুখের স্পর্শ শিশুর শেখার জীবনের প্রথম ও প্রধান তোরণদ্বার। জন্মাবার পর থেকেই শিশু স্পর্শ ও দেখার মধ্য দিয়ে বস্তুজগতের সাথে পরিচিত হয়। একই বস্তুর আকৃতি কাছে ও দূরে অবস্থানের জন্য যে বিভিন্ন আকার ধারণ করে, এটা শিশু কয়েকমাস বয়স থেকেই বুঝতে আরম্ভ করে। তার দৃষ্টির বাইরে

কোন জিনিস চলে গেলেও যে ঐ বস্তুর অস্তিত্ব বজায় থাকে এটাও শিশু তার জীবনের প্রথম বছরেই শেখে। তাই শিশুর কয়েকমাস বয়স থেকেই তাকে নানা আকৃতি ও রঙের জিনিসের সাথে পরিচয় করানো দরকার। শিশুর কাছে একই জিনিস সবসময় না রেখে, জিনিসগুলিকে অদলবদল করে তার কাছে উপস্থিত করতে হবে। এই সময় থেকেই শিশুর সাথে লুকোচুরি খেলা, বিশেষ করে শিশুর মায়ের, দরকার। মা তার কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন, একটু পরেই আবার আবির্ভূত হচ্ছেন—এটা শিশুকে অবাক ও মুগ্ধ করে।

একবছর বয়স প্রাপ্ত হওয়ার আগে থেকেই শিশু বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক বুঝতে শেখে, যদিও কার্যকারণ সম্পর্কবোধ দৃঢ় হতে আরও কয়েক বছর কেটে যায়। মনে রাখতে হবে, শিশুর জগৎ ইন্দ্রজাল বা জাদুর জগৎ। তাই অনেক সময় দেখা যায়, সে কেবল মুখের শব্দ বা হাত-পা নাড়াচাড়ার মধ্য দিয়েই তার বাঞ্ছনীয় জিনিস পেতে চায়। ধীরে ধীরে সে বুঝতে শেখে যে কিছু পেতে গেলে তার প্রয়োজনীয় শর্তগুলি পূর্ণ হওয়া দরকার। এটা বুঝতে বুঝতে শিশুর দ্বিতীয় বছর গড়িয়ে যায়। এই সময় একটি শিশুকে নজর করলে দেখা যাবে যে, সে প্রতি ঘটনা কিভাবে ঘটছে তা বিশেষ মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করছে।

প্রথম বছর শিশুর প্রধান ভাষা হল কান্না। ঐ সময় সে তার এই ভাষাকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে শেখে। যেমন খিদে পেলে সে কাঁদে। দ্বিতীয় বছর থেকেই সে প্রকৃত অর্থেই ভাষা ব্যবহার করতে শেখে। ছোট শিশু মুখে নানারকম শব্দ করে। এগুলি আসলে বড়দের বাক্যেরই অনুরূপ অর্থবহ, নানা ভাবপ্রকাশের বাহক। এই সময় ছোট ছোট শিশুর সাথে নানারকম শব্দ বা ছোট ছোট বাক্যের সাহায্যে কথা বলা দরকার। এই সময়ই তাকে বিভিন্ন জিনিসের, বিভিন্ন লোকের নাম শেখাতে হবে। ধীরে ধীরে

'এটা কি', 'ওটা কি' ইত্যাদি প্রশ্নের সাহায্যে তার ভাষাশিক্ষা ও পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় আরো দৃঢ় করতে হবে। তৃতীয় বছরে পদার্পণ করতে করতেই শিশুরা পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ও লোকের আকৃতি, ব্যবহার, রং, শব্দ (যেমন গলায় আওয়াজ) প্রভৃতি অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করতে শেখে। একই ধরনের বস্তুকে একই নাম দেয়, যেমন, সকল বড় ছেলেরাই 'দাদা'। এই সময় শিশু সাধারণতঃ বস্তু বা লোকের সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা গড়ে তোলে। তাদের খুঁটিনাটি লক্ষণগুলি তার কাছে তেমন আকর্ষণীয় নয়। কাজেই মনে রাখতে হবে, তাকে কোন কিছুর খুঁটিনাটি শেখাতে যাওয়া ভুল। তা আয়ত্ত করা তার ক্ষমতার বাইরে। এই সময়েই তার পরবর্তী কালের প্রয়োজনীয় শিক্ষার, বিশেষ করে বিদ্যালয়ের শিক্ষার, ভিত্তি গড়ে ওঠে। এই ভিত্তির উপরেই জগতের বস্তুরাজির শ্রেণীবিভাগ (classification), ধারণা (idea), অবধারণা (concept) প্রভৃতির বোধ সংগঠিত হয়। শিশুর শিক্ষায় তাই উপদেশ বা নির্দেশ অপেক্ষা অভিজ্ঞতার মূল্য অধিক। তার কাছে সব কিছুই বাস্তবভাবে উপস্থিত করতে হবে এবং সবকিছু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে। তাকে সব কিছু দেখতে, শুনতে, স্পর্শ করতে, আঘ্রাণ নিতে ও স্বাদ গ্রহণ করতে শেখাতে হবে। এই প্রসঙ্গে মন্তেসরী শিক্ষা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে ধাপে ধাপে অভিজ্ঞতা লাভের সুব্যবস্থা রয়েছে। তাকে নিজের হাতে সব কিছু করার ও আবিষ্কার করার সুযোগ করে দিতে হবে। দেখতে হবে শিশু যেন আবিষ্কারকের ভূমিকা নিতে পারে। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার পদ্ধতি এরূপই হওয়া দরকার। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় খুব দামী উপকরণের প্রয়োজন নেই। পরিবেশে সহজলভ্য জিনিসপত্র ; যেমন কাদামাটি, বালি, নুড়ি, মাটির পুতুল, গাছপালা, জল, মোম, ভাঙ্গা ও ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র প্রভৃতির সাহায্যেই একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। (এই প্রসঙ্গে সুসান আইসাকস

[Susan Isaacs]—এর Intellectual Growth In Young Children বইখানি বিশেষ অনুধাবন যোগ্য।) এইভাবে শিশু ধীরে ধীরে প্রকৃতি, জীব ও বস্তুর ধর্ম অনুধাবন করতে শিখবে। এই শিক্ষায় অসঙ্গতি থাকলে তা পরবর্তীকালে বয়স্ক জীবনে নানা অসঙ্গতির কারণ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এখানে আবার পূর্ব্বের কথার স্মরণ দরকার। শিশুরা দু'বছরের মধ্যেই বিভিন্ন জিনিসের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখে ফেলে ঠিকই। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে শিশুকে কখনও কোন বস্তুর বিস্তারিত খুঁটিনাটি ব্যাপারের মধ্যে যেন অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা না করা হয়। পাঁচ-ছ বছর বয়স প্রাপ্ত হওয়ার আগে শিশুরা একটা জিনিসের বিভিন্ন অংশের মধ্যের সম্পর্ক বুঝতে শেখে না। এর জন্য যে মানসিক পরিপক্বতা দরকার তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। কোন ব্যক্তির সাথে তার নামের যে একটা সম্পর্ক আছে, এটা বুঝতে তার সময় লাগে। এ-সম্বন্ধে ফরাসী মনোবিজ্ঞানী পিয়াঁজে (Piaget) একটি সুন্দর গবেষণালব্ধ ফলের কথা বলেছেন। এরূপ দেখা গেছে, একটি দেড় বছরের শিশু তার বাবাকে যখন পড়ার ঘরে বসে থাকতে দেখত কেবল তখনই সে তাকে 'বাবা' বলে নির্দেশ করতে পারত। অন্য সময় তাকে 'বাবা' বলে নির্দেশ করত না। অর্থাৎ ব্যক্তির সাথে তার নামের যে সম্পর্ক আছে তা সে তখনও বুঝে উঠতে পারে নি।

শিশুর শিক্ষায় ছবির বইয়ের মূল্য অপরিসীম, কিন্তু উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা মনে রাখতে হবে, শিশুকে যে সমস্ত ছবির বই দেওয়া হবে, বিশেষ করে চার-পাঁচ বছর বয়সের আগে, সেগুলির ছবি যেন জটিল ধরণের না হয়, অর্থাৎ ছবিতে যেন কোন কিছুই খুব বিস্তারিত ও খুঁটিনাটিসহ না থাকে, এবং ঐ সকল ছবির ভাবও যেন খুব জটিল না হয়। ছবির রঙের ব্যাপারেও এই জটি । বর্জন করতে হবে। খুব ছোট শিশুর পক্ষে

মোটা দাগের ও অল্প রঙের সহজ ছবিই উপযোগী। অনেক বিষয়-বস্তু সমন্বিত একটি জটিল ছবি দশ এগার বছর বয়স প্রাপ্ত হওয়ার আগে সাধারণতঃ শিশুদের পক্ষে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না।

চার-পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর ভাষাশিক্ষার ব্যাপারে মনে রাখতে হবে যে শিশু তার প্রাথমিক ভাষা শেখে তার মায়ের কাছে এবং বাড়ীর পরিবেশ থেকে। কাজেই উচ্চারণ এবং শব্দসম্ভার আয়ত্তের দিক থেকে শিশুর ভাষার ওপর মায়ের ও বাড়ীর প্রভাব পড়বেই। অনেক সময় দেখা যায় যে পরিবারগত উচ্চারণের জন্য শিশুর ভাষা তার প্রাক-প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ বুঝতে অসুবিধা বোধ করেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এরূপ ক্ষেত্রে ধৈর্য্য ও সহানুভূতির সাথে শিশুকে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। এই স্তরে শিশু যদি মনে করে যে তাকে কেউ বুঝতে পারছে না, তাহলে তা তার মনে আঘাত করবে ও নানা প্রকারের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। দু'বছর বয়স হলে শিশু সাধারণতঃ দু'তিনটি শব্দ নিয়ে বাক্য বলতে পারে। ছ-সাতটি শব্দ নিয়ে বাক্য তৈরী করার কৌশল আয়ত্ত করতে তার প্রায় সাত-আট বছর কেটে যায়।

ভাষাশিক্ষার ব্যাপারে শিশুরা বড়দের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। কাজেই যে-সকল মা-বাবা এবং বাড়ীর অন্যান্য বড়রা সঠিক উচ্চারণ, যথাযথ ব্যাকরণ ও উপযুক্ত শব্দ-ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য না করে নিজেদের মধ্যে কথা বলেন, তাঁদের শিশুরা ভাষা শেখার দিক থেকে পিছিয়ে পড়তে পারে। আজকাল ছোট পরিবারের অনেক মা-বাবা উভয়েই চাকরী করেন। তাদের ছোট শিশুরা বেশিরভাগ সময় অশিক্ষিত আয়া বা কাজের লোকের কাছে থাকতে বাধ্য হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ সকল শিশুরা ভাষাশিক্ষায় পিছিয়ে পড়তে বাধ্য। এবং বহু ক্ষেত্রেই এরা দুর্বল ও ভুল ভাষা আয়ত্ত করে। ফলে বিদ্যালয়ে ভাষার পাঠে এরা বিশেষভাবে পিছিয়ে পড়ে। ভাষা শেখার ব্যাপারে শিশুদের পক্ষে বড়দের সাহচর্য বিশেষ প্রয়োজন। তাদের সাথে কথা বলার

ব্যাপারে বাড়ীর বড়দের নিজেদের মধ্যে এবং শিশুর সাথে কথা বলার সময় ভাষা প্রয়োগে বিশেষ সতর্ক হতে হবে। মা-বাবার ভাষা প্রয়োগ বা কথা বলা যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহলে শিশুর ভাষা প্রয়োগও ত্রুটিপূর্ণ হবে। রুশদেশের মনোবিজ্ঞানী এ. আর. লুরিয়া এবং এফ্. আই য়ুডোভিচের (A. R. Luria and F. I. Yudovich) একটি অনুসন্ধানে জানা যায় যে একটি জননীর কথা বলা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় তাঁর দু'টি সন্তানের ভাষা শেখার গতি ভয়ানক মন্থর গতি সম্পন্ন হলো। ফলে তারা প্রাক্-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সাথে ঠিকভাবে মিশতে পারত না; কারণ তারা নিজেদের মনের ভাব অন্যকে ঠিকভাবে বোঝাতে পারত না। অনেক সময় অঙ্গভঙ্গির সাহায্য নিতে হতো। অনেক মনোবিজ্ঞানীর মতে খুব আদুরে শিশুদেরও অনেক সময় ভাষাশিক্ষায় পিছিয়ে পড়তে দেখা যায়। তারা নিজেদের মনের ভাব ঠিকমতো প্রকাশ করতে শেখে না। কারণ তারা নিজেদের প্রয়োজন উপলব্ধি ও ব্যক্ত করার আগেই সব-কিছু পেয়ে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ ক্ষেত্রও সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। ফলে বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের গতিও শ্লথ হওয়া অসম্ভব নয়। ছোট বয়স থেকেই শিশুকে উপযুক্ত উচ্চারণ ও যথাযথ শব্দপ্রয়োগের জন্য উৎসাহ দিতে হবে এবং ঠিক সময় ঠিক শব্দটি বলে দিয়ে সাহায্য করতে হবে। শিশুর সাথে কথা বলার সময় ধীরে ধীরে, পরিষ্কার ও সুন্দরভাবে কথা বলতে হবে, ছড়া ও ছোট কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে হবে ও তাকে দিয়ে বলাতে হবে।

সংখ্যা শেখার ব্যাপারে শিশুদের অহেতুক চাপ দেওয়া ঠিক নয়। কারণ সংখ্যা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা গড়ে উঠতে শিশুদের মানসিক পরিপক্বতা চাই। সংখ্যা ও বস্তু যে এক নয়, সংখ্যা যে একটি বিমূর্ত ধারণা—এ বুঝতে শিশুর সময়ের প্রয়োজন। বয়সের সাথে সাথে সে যখন এই পরিপক্বতা অর্জন করে, তখন সহজেই সংখ্যার তাৎপর্য্য বুঝতে

পারে। এ জন্য অযথা ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই। পাঁচ বছরের আগেই জোর করে শিশুকে সংখ্যা মুখস্থ করানো যেতে পারে। কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হয় না; বরং শিশুর উপর অযথা চাপ সৃষ্টি করা হয়।

শিশুর শেখার ব্যাপারে শিক্ষার আরো কয়েকটি দিকের প্রতি নজর রাখতে হবে। সেগুলি হল শিশুর মনে রাখার ক্ষমতা, তার কোন সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা ও সামাজিক বোধ।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, শিশু এক বছর বা তার কিছু আগে থেকেই পূর্বের কোন বিশেষ ঘটনা, অভিজ্ঞতা বা বস্তু মনে রাখতে পারে। আগে একটি খেলনা দিয়ে খেলেছে, কয়েকদিন পরে ঐ খেলনাটি অন্য খেলনার সাথে মিশিয়ে অন্য জায়গায় রাখলে বারো-তেরো মাস বয়সের শিশু তা চিনতে পারে। এতেই বোঝা যায় তার স্মৃতিশক্তির যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছে। কাজেই খুব শৈশব থেকেই স্মৃতিশক্তি চর্চার প্রয়োজন হয় এরূপ খেলা শিশুকে দিতে হবে। এই জন্য একটু বড় হলে পর শিশুকে নানারকমের ছড়া ও সহজ গান শোনান ও শেখান স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে।

খুব ছোট বয়স থেকেই শিশুদের সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা থাকে। দু'বছর বয়সে পড়ার মুখেই তাদের মধ্যে এই ক্ষমতার বিকাশ ঘটতে দেখা যায়। যেমন, মা হয়তো অন্য ঘরে কাজ করছেন। শিশু সেখানে যাবার সহজ রাস্তাটি খুঁজে বের করতে পারে। তাই এই সময় থেকেই শিশুকে নানারকমের সমস্যামূলক পরিস্থিতির (শিশুর উপযোগী) মধ্যে ফেলা দরকার। এদিক থেকে লুকোচুরি খেলা, বা তার খেলনা লুকিয়ে রেখে তাকে তা বের করতে দেওয়া খুব ভালো পদ্ধতি। তবে এরূপ খেলা যেন একসঙ্গে বেশিক্ষণ না চালান হয়। তাতে শিশু ক্লান্ত ও বিভ্রান্ত বোধ করতে পারে।

শিশু স্বভাবতই অনুকরণ প্রিয়। এটা তার সামাজিক-বোধ বিকাশেরও লক্ষণ। কাজেই যে শিশু কোন ব্যাপারেই অন্যের অনুকরণ

করতে পারে না, বুঝতে হবে তার সামাজিক বোধের বিকাশে ব্যাঘাত ঘটেছে। অনুকরণের মধ্য দিয়েই সে অপরের সাথে একাত্মানুভূতির আনন্দ উপভোগ করে। ধীরে ধীরে সে বড়দের মত হতে চায়, এবং তাদের মত হতে শেখে। এইভাবে সে তার নিজের আচরণের উপর নিয়ন্ত্রণ আনে। কাজেই শিশুকে তার সামাজিক বোধ বিকাশে উৎসাহিত করতে হবে। শিশুর প্রাক্-বিদ্যালয়ের স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় এই বোধকে কাজে লাগাতে হবে। এই জন্য প্রশংসা, ভালবাসা ও পুরস্কারের দ্বারা তাকে উৎসাহিত করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। ছোটবেলা থেকেই প্রত্যেক শিশুকে অন্য শিশুর সাথে মেলামেশার সুযোগ করে দেওয়া দরকার।

শিশুর শারীরিক বিকাশধারার সাথে তার মানসিক বিকাশধারা সম্পৃক্ত। কাজেই শিশুর স্বাভাবিক শারীরিক বিকাশ ও পরিপক্কতার উপর তার শেখার কাজ বহুলাংশে নির্ভর করে। সে'জন্য শিশুর স্বাভাবিক শারীরিক বিকাশে যাতে কোনরূপ প্রতিবন্ধ সৃষ্টি না হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। সেদিক থেকে শিশুর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথাযথ সঞ্চালনের দক্ষতা অর্জন করাও তার শিক্ষাধারার অঙ্গীভূত। জন্মমুহূর্ত থেকেই একটি মানবশিশুর শরীরযন্ত্র ধীরে ধীরে পরিপক্কতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ক্রমে সে তার নার্ভ, পেশী ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আয়ত্ত করতে থাকে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও দৃঢ় হতে থাকে। শিশুর জন্মের পর থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত তার শরীরযন্ত্রের বিকাশ খুব দ্রুত হতে থাকে। কাজেই এই বিকাশ-ধারার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে শিশুকে নানারকম উদ্দীপক দেওয়া দরকার। অর্থাৎ লক্ষ্য রাখতে হবে তার অঙ্গ সঞ্চালন যেন যথোপযুক্ত হয়। তাকে সবসময় জামা-কাপড়ে ঢেকে বিছানায় শুইয়ে রাখা ঠিক নয়। এই ক্রম-বিকাশের সময় তাকে খুব আঁটসাঁট পোশাক পরিয়ে রাখা ঠিক নয়, বিশেষ করে আমাদের এই গরম

দেশে। তাতে তার প্রয়োজনীয় অঙ্গ-সঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তাকে হাত-পা ছুঁড়তে, গড়াতে, হামাগুড়ি দিতে, বসে বসে চলতে এবং সময় হলে যথেষ্ট ছুটোছুটি করতে দিতে হবে। খেলাধুলার মধ্যে বল ছোঁড়ার খেলা দু'তিন বছরের (তার থেকে কম বয়সেরও) শিশুর বিশেষ উপযোগী। এতে তার পেশী ও নার্ভ-সমূহের ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দ্রুত বাড়ে। এই প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় আলো-হাওয়া-খাদ্যের কথাও মনে রাখতে হবে।

অনেকে মনে করেন সংবেদজ ক্রিয়ার (sensory motor) দক্ষতা অর্জনে ছেলে-শিশুরা মেয়ে-শিশুদের থেকে অগ্রণী। অর্থাৎ এ ব্যাপারে ছেলে-শিশুদের ক্ষমতা বেশী। কিন্তু বিভিন্ন গবেষকের পরীক্ষালব্ধ ফলাফল বিচার করলে দেখা যায় যে এরূপ মতামত যুক্তি সঙ্গত নয়। কারণ গবেষণায় ছেলে-শিশু ও মেয়ে-শিশু—উভয়ের অনুকূলেই ফলাফলের নির্দেশ দেখা গেছে। কাজেই এ বিষয়ে এখনও নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। এ' প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে, সংবেদজ ক্রিয়ার দক্ষতা অর্জনে সহজাত বুদ্ধিবৃত্তির অবদান যথেষ্ট। অপেক্ষাকৃত অধিক বুদ্ধিমান শিশুরা এই সকল দক্ষতা সহজেই অর্জন করে। এখানে আরও একটি শর্তের কথা মনে রাখতে হবে। তা হ'ল সুস্থ শরীর। অসুস্থ শিশুর উপরে এ' ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করা, বা তার অপারগামিতার জন্য তাকে সমালোচনা করা ঠিক হবে না। এতে সে মানসিক দিক থেকে আরও পঙ্গু হয়ে পড়তে পারে। কাজেই শিশুদের শেখার ব্যাপারে অভিজ্ঞতা লাভ, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, ক্রিয়াজ দক্ষতা (motor skill) ও শরীর যন্ত্রের পরিপক্বতার (maturation) কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে। শেখাতে চাইলেই শেখান যায় না, যদি শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় পরিপক্বতা না থাকে। তাই বিশেষ বয়সে বিশেষ বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। অতএব এ'কথাও মনে রাখতে হবে, শিক্ষার জন্য উপযুক্ত সময়ে

যথাযথ সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার। শিশুর শেখায় পরিপক্কতা ও চর্চা—দুই-ই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুর শেখায় পরিবেশের কথা বলা হয়েছে। এ' ব্যাপারে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখা দরকার। শিশুর পরিবেশের সাথে যুক্ত হয়েছে তার আবেগ জীবন। তার আবেগ জীবনে তার মা-বাবা ও বাড়ীর অন্যান্যদের স্থান ও প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তার আবেগ জীবনের সুস্থ বিকাশ বহুলাংশেই নির্ভর করে তার মানবীয় পরিবেশের উপর। অর্থাৎ মা-বাবা ও অন্যান্যরা তার প্রতি এবং তাঁদের নিজেদের মধ্যে কিরূপ আচরণ করেন, বাড়ীর বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ—এ সকলই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর শেখায় তার সুস্থ আবেগ জীবনের মূল্য অপরিসীম, এমন কি বলা চলে এটা আসল ভিত্তি। আর এই সুস্থ আবেগ জীবনের মূলে রয়েছেন তার মা-বাবা, বিশেষ করে মা। লক্ষ্য রাখতে হবে শিশুর আবেগ জীবনের ধূলিঝড়ে যেন তার শেখার কাজ ব্যাহত না হয়। বড়দের আচরণ ও পরিবেশ যেন শিশুর মনে ঈর্ষা, ক্রোধ, ভয়, অভিমান, আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব, প্রভৃতির ঝড় না তোলে। ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সাগরে যেমন নাবিক বিধ্বস্ত হয়, তেমনি আবেগের ঝড়েও শিশু বিপর্যস্ত হয়। মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত শিশু কখনই যথাযথভাবে শিখতে পারে না।

শিশুর স্বপ্ন দেখা

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখা মানুষের মনের সুস্থতা রক্ষার জন্য একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ, স্ত্রী ও পুরুষ, শিশু ও বৃদ্ধ, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ধনী ও দরিদ্র এবং জাতি, বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার পর স্বপ্ন অনেক সময় মনে থাকে না। তাই অনেকে ভাবেন যে তিনি বোধহয় স্বপ্ন দেখেন না। যে সকল স্বপ্নে আবেগ ও অনুভূতির প্রাবল্য থাকে সে-সকল স্বপ্ন সহজেই মনে থাকে। স্বপ্ন ভুলে যাওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে চেষ্টা করলে স্বপ্ন মনে রাখা যায়।

স্বপ্নের একটি বিশেষত্ব হলো, বিশেষ করে বড়দের ক্ষেত্রে, তার বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, অপূর্বতা, ও বাস্তব জগতের সাথে মিলের অভাব। স্বপ্নের মধ্যে এমন ব্যাপার দৃশ্যমান হয় যা বাস্তবে কখনও সম্ভব নয়। যেমন কেউ দেখছে আকাশে উড়ে যাচ্ছে; বনের মধ্যে সিংহের পাশে বসে আছে; সারা শরীর সাপে জড়িয়ে ধরেছে; জলের উপর দিয়ে মোটর গাড়ী করে যাচ্ছে; কাঁচা মাংস খাচ্ছে; প্রভৃতি। এইসব স্বপ্ন রহস্যাবৃত। সরাসরি এর অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না।

আদিম কাল থেকে মানুষ স্বপ্নের রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা করে আসছে। নানাজনে এ সম্বন্ধে নানা কথা বলেছেন। তবে আধুনিক কালে এর বিজ্ঞানসম্মত এবং প্রামাণ্য ব্যাখ্যা এসেছে মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের কাছ থেকে।

যদিও স্বপ্নের তত্ত্ব আলোচনা এখানে উদ্দেশ্য নয়। আমরা শুধু শিশুদের স্বপ্নের বিশেষত্বের আলোচনার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখব। তথাপি স্বপ্ন-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলে নিলে আলোচনায় সুবিধা হবে।

ফ্রয়েডের মতে স্বপ্ন মানুষের অবচেতন (unconscious) মনের প্রক্রিয়া। অবচেতন মনেই এর সৃষ্টি এবং অবচেতন মনের কোন

বক্তব্য এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। তাই প্রত্যেক স্বপ্নই অর্থবহ। আবার ফ্রয়েড স্বপ্নের অন্তর্নিহিত অর্থ বা বক্তব্য উদ্ঘাটনের পদ্ধতিও আবিষ্কার করেছেন।

ঘুমের মধ্যে মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে তখন তার বিষয়বস্তুকে স্বপ্ন-দ্রষ্টা সত্যি বলেই মনে করে। পরে জাগ্রত অবস্থায় তার কাছে এর অলীকতা ধরা পড়ে। তাই স্বপ্ন এক প্রকারের মায়া বা অমূলক প্রত্যক্ষ (Hallucination)।

স্বপ্ন অবচেতন মনের সৃষ্টি। তাই তার মধ্যে অবচেতন মনের আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। সামাজিক ন্যায়-নীতি ও বিবেকের অনুশাসনের জন্য মানুষ সচেতনভাবে যে-সকল আবেগ, অনুভূতি ও ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে না, সে সকলই মনের অবদমন (Repression) প্রক্রিয়ার ফলে অবচেতন মনে আত্মগোপন করে। ঘুমের মধ্যে সচেতন মন যখন প্রায় নিষ্ক্রিয়, অর্থাৎ বিবেকবোধ (Conscience) ও ন্যায়-নীতি বোধ অনেকটা শিথিল হয়ে পড়ে তখন অবচেতন মন তার কল্পনাশক্তির সাহায্যে স্বপ্নের জাল বুনতে থাকে। কিন্তু ঘুমের মধ্যেও সচেতন মন সম্পূর্ণ শিথিল হয়ে পড়ে না। তার প্রহরা কিছু পরিমাণে তখনও চলতে থাকে, কারণ তার ভয় পাছে তার শৈথিল্যের সুযোগে অবচেতন মনে অবাঞ্ছিত, বিবেকবিরুদ্ধ ও অসামাজিক ভাবনা ও আবেগসমূহ কল্পনায় রূপ পরিগ্রহ করে মনের সচেতন অংশে চলে আসে। তাই ঘুমের মধ্যেও সচেতন মন প্রহরার কাজটি চালিয়ে যেতে থাকে। মনের এই ব্যবস্থাকে বলে প্রহরী (censor) প্রক্রিয়া। এ অনেকটা দেশের সরকারের সেন্সর ব্যবস্থার মতই, যার কাজ অবাঞ্ছিত ও অশ্লীল সিনেমা, পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশে বাধা দেওয়া।

স্বপ্নের ব্যাপারে সচেতন ও অবচেতন মনের মধ্যে এভাবে একটা লুকোচুরি খেলা চলতে থাকে। এখানে একটা কথা মনে রাখতে

হবে। সচেতন ও অবচেতন, একটি মনেরই দু'টি ভাগ। কাজেই অবচেতন অংশের মধ্যে যে-সকল ভাবনা, চাহিদা ও আবেগ বর্তমান সেগুলো সমগ্র মনেরই জিনিস; অর্থাৎ ঐ উপাদানগুলি সমগ্র ব্যক্তিত্বেরই অংশ। হতে পারে সেগুলো সচেতন ভাবনাচিন্তা, যুক্তি-বুদ্ধি ও বিবেক বিচারের কাছে অপ্রীতিপ্রদ ও অবাঞ্ছিত; তাই বলে যে মানুষটির ব্যক্তিত্বের মধ্যে এগুলো বর্তমান রয়েছে সে এগুলোকে অস্বীকার করতে পারে না। তাই স্বপ্নের মধ্যে অবচেতন মনের কল্পনা ও ভাবনাসমূহ নানা ছলা-কলা ও ছদ্মবেশের আশ্রয় নিয়ে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। এই কারণেই সচেতন মনের কাছে স্বপ্নের অর্থ সরাসরিভাবে পরিস্ফুট নয়। অবচেতন মনের উপাদান স্বপ্নের মধ্যে এভাবে পরোক্ষ উপায়ে ছদ্মবেশ ধারণ করে দেখা দেয়। বড়দের স্বপ্নের এ একটি বিশেষ লক্ষণ।

স্বপ্নের বিষয়বস্তুর এরূপ গোপনীয়তা ও ছদ্মবেশ ধারণের জন্য এই বিষয়বস্তুকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি হলো স্বপ্নে যে সকল দৃশ্য দেখা হচ্ছে তা এবং অপরটি হলো এই দৃশ্যমান বস্তুর পেছনে আসল ভাবনা ও আবেগসমূহ। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় প্রথমটিকে বলা হয় প্রকাশমান বিষয়বস্তু বা Manifest Content এবং দ্বিতীয়টি হ'লো অস্ফুট বিষয়বস্তু বা Latent Content। বড়দের ক্ষেত্রে প্রকাশমান বিষয়বস্তু ও অস্ফুট বিষয়-বস্তুর মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ থাকে; কারণ, তাদের ক্ষেত্রে অস্ফুট বিষয়-বস্তুটিই ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রকাশমান বিষয়বস্তু রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

ছোটদের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পাঁচ-ছ' বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের বাস্তববোধ, বিবেক ও সামাজিক ন্যায়-নীতির বোধ অত্যন্ত কম থাকে বা তখনও পরিপূর্ণভাবে গড়ে ওঠে নি; তাই তাদের স্বপ্নের প্রকাশমান বিষয়বস্তু ও অস্ফুট বিষয়বস্তুর মধ্যে বিশেষ প্রভেদ থাকে না। শিশুর অবচেতন ও সচেতন মনের পার্থক্য তখনও খুব পরিস্ফুট

নয়। তাই অস্ফুট বিষয়বস্তুর স্বপ্নের মধ্যে ছদ্মবেশের আশ্রয় নিতে হয় না।

স্বপ্নের মধ্য দিয়ে মানুষ তার অপূর্ণ বাসনা ও আবেগ সমূহের পরিতৃপ্তি ঘটাতে পারে। শিশুদের স্বপ্নের উদ্দেশ্যও তাই। শিশুরা তাদের অতৃপ্ত ইচ্ছাগুলোর চরিতার্থতাই স্বপ্নে দেখে। সেজন্য নিকট অতীতের বা সারাদিনের অতৃপ্ত বাসনাগুলোই শিশুর স্বপ্নের মধ্যে পরিতৃপ্ত হয়। তাই ঘুমের মধ্যে সে আইসক্রীম খাওয়ার স্বপ্ন দেখে। সকালে ঘুম ভাঙ্গলে তাকে বলতে শোনা যায়ঃ "কাল রাতে আমি ঘুমাইনি, আইসক্রীম খেয়েছি।" ছয় বছরের বাবুয়া 'রবিনহুড' সিনেমা দেখে রাতে ঘুমের মধ্যে আবার রবিনহুডের তীর ছোঁড়ার স্বপ্ন দেখল। সকালে বলছেঃ "কাল আবার রবিনহুড এসেছিল; তার ছুঁড়ছিল।"

বড়দের স্বপ্নের মত শিশুদের স্বপ্নও অর্থবহ। তবে শিশুদের স্বপ্নের অস্ফুট বিষয়বস্তু ও প্রকাশমান বিষয়বস্তু একই থাকে বলে তাদের স্বপ্নের অর্থ বুঝতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না। অর্থাৎ শিশুদের স্বপ্ন বড়দের স্বপ্নের মত বিকৃত (Distorted) হয়ে আসে না। খুব ছোট, এক-দেড় বছর বয়সের, এবং এমন কি তার আগের থেকে শিশুরা স্বপ্ন দেখে। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে তারা ঘুমের মধ্যে হাসে, কাঁদে। তবে কি দেখে তাদের এরূপ প্রতিক্রিয়া হয় তা আমাদের জানার উপায় নেই, কারণ অত ছোট শিশু তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না।

শিশুরা ভয়ের স্বপ্নও দেখে। বাস্তব পরিস্থিতিতে তারা যে-সকল ভয়ের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে না, স্বপ্নের মধ্যে সেগুলির মোকাবিলা করে। এদিক থেকে স্বপ্নও তাদের মনের ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। আবার স্বপ্নের মধ্যে শিশুরা রাগারাগি মারামারিও করে, এবং অনেক সময় এই সকল স্বপ্ন দেখে ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে ওঠে বা কথা বলে। এতে ভয় পাবার কিছু নেই। এরূপ হলে শিশুর

বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপই এগুলো ঘটছে বলে বুঝতে হবে। তাই তার বাস্তব বা দৈনন্দিন জীবনে যাতে এরূপ উত্তেজনাকর পরিস্থিতি না আসে তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

পাঁচ-ছ বছর বয়সের পর থেকেই শিশুদের স্বপ্নেও বিকৃতি (Distortion) শুরু হয়ে যায়। ধীরে ধীরে তাদের স্বপ্নের বিষয়বস্তু ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রকাশ পেতে থাকে। তখন তাদের স্বপ্নের অর্থ বুঝতে গেলে বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়।

পরীক্ষার স্বপ্ন কিশোর বয়সের স্বপ্নের একটি বিষয়বস্তু। এর মধ্যে দিয়ে পরীক্ষার প্রতি কিশোর-কিশোরীর মনোভাব বা প্রতিক্রিয়া পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই সকল স্বপ্নে ভয় ও উদ্বেগ জড়িত থাকে।

কিশোর বয়স থেকেই যৌনবোধের সুস্পষ্ট আবির্ভাব দেখা যায়। এই সময় থেকেই ছেলেরা মেয়েদের প্রতি ও মেয়েরা ছেলেদের প্রতি একটা যৌন আকর্ষণ বোধ করতে থাকে। তাই এই সময়ের স্বপ্নে যৌন বিষয়বস্তুও দেখা দিতে থাকে। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে—এ-সকল স্বপ্ন কিছুমাত্র খারাপ নয়, বরং যৌনবোধ বিকাশের সহায়ক।

কিশোর বয়সে শিশুদের মধ্যে ক্রোধের প্রকাশও বিশেষভাবে ঘটে। তাই এই সময় ক্রোধের অভিব্যক্তিমূলক স্বপ্নও দেখা যায়। স্বপ্নের মধ্যে মা-বাবা বা বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রাত আক্রমণাত্মক ক্রোধের প্রকাশ ঘটে থাকে। এই নিয়ে ভাবিত হওয়ার কিছু নেই।

স্বপ্নের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শিশুদের মনের আরেকটি প্রক্রিয়ার কথা বলা দরকার। এটি হল দিবাস্বপ্ন বা Day-dream। স্বপ্ন আসে ঘুমের মধ্যে। দিবাস্বপ্ন আসে জাগ্রত অবস্থায়। দিবাস্বপ্নে স্বপ্নের মত বাইরের জগতের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় না। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে কিছুটা সচেতনতা থাকে।

ছোট শিশুদের একটা নিজস্ব জগৎ থাকে। এ-জগৎ পুরোপুরি তার কল্পনার সৃষ্টি। সময় সময় সে তার কল্পনার জগতে মগ্ন হয়ে যায়।

সে কল্পনায় পাখীর সাথে, গাছের সাথে, প্রকৃতির প্রতিটি জিনিসের সাথে কথা বলতে পারে। এই কল্পনার জগতে ডুবে গিয়ে সে আনন্দ পায়। এমন কি ঘরের নিষ্প্রাণ বস্তু, আসবাবপত্র প্রভৃতিও তার কল্পনায় প্রাণ পায়, সজীব হয়ে ওঠে। ছোট্ট মেয়ে বিপাশা ঘরের দরজা-জানালার সাথে কথা বলে। তারা তার খেলার সঙ্গী। বাবুয়ার যখন আড়াই বছর বয়স তখন এক প্রতিবেশী ভদ্রলোক তাকে মোটর-সাইকেলে চড়ান। পরে কিছুদিন ধরে তাকে ঘরের খাট, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতির সাহায্যে মোটর সাইকেল চড়ার দিবাস্বপ্নে ডুবে থাকতে দেখা যায়।

শিশুদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে দিবা-স্বপ্নের বিষয়বস্তুরও পরিবর্তন হতে থাকে। ধীরে ধীরে এর মধ্যে নানা আবেগ, কামনা-বাসনা ও অনুভূতির আবির্ভাব ঘটতে থাকে এবং কিশোর বয়সে যৌন বিষয়বস্তুর আবির্ভাব দেখা যায়।

কিশোর বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে গল্পের বইয়ের বিষয়বস্তুও দিবাস্বপ্নের বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারে। তাই কিশোর বয়সের গল্পের বই নির্বাচন যথোপযুক্ত হওয়া দরকার।

স্বপ্ন ও দিবাস্বপ্ন উভয়ই মানবশিশুর মানসিক বিকাশের জন্য দুটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া। এর মধ্য দিয়ে তার কল্পনা শক্তিরও অভিব্যক্তি ঘটে। কাজেই স্বপ্ন ও দিবা-স্বপ্ন নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। তবে কোন এক ধরনের স্বপ্ন ও দিবাস্বপ্নের মধ্যে কোনও শিশুর মন যদি দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকে তাহলে তার প্রতিকারের কথা ভাবতে হবে। কারণ সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে তার মনের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে; একই জায়গায় আটকা পড়ে আছে। এরূপ পরিস্থিতি হলে মনঃ-সমীক্ষক বা মানসিক রোগের চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে।

ভালবাসা, প্রত্যাখ্যান ও মানসিক স্বাস্থ্য

আজকাল অনেক মা-বাবার মুখে এরকম অভিযোগ শোনা যায় যে, "ছেলে-মেয়েদের জন্য এত করছি, কোনও জিনিসের অভাব নেই, যখন যা চাইছে সাধ্য মত যোগাচ্ছি, তবু যেন ছেলে-মেয়ে দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে। কি যে চায় তা মন খুলে বলেও না, আর তা বুঝতেও পারি না।" কত রকমের অভিযোগ—পড়াশুনায় মন নেই ; মিথ্যা কথা বলে ; স্কুল পালায় ; পড়ার বই বিক্রি করে সিনেমা দেখে ; বাবার পকেট থেকে পয়সা চুরি করে ; বাড়ীতে কারুর সাথে মন খুলে কথা বলে না ; ছোট ভাই-বোনদের সাথে দিন-রাত ঝগড়া করে ; বন্ধুদের সাথে কোথায় চলে যায়, দু'তিন দিন আর কোন খোঁজ থাকে না ; বড় হয়েছে, এখনও আঙ্গুল চোষে, ইত্যাদি।

ঘটনা নং ১। ছোট ছেলে টুটু। ৬ বৎসর বয়স। স্কুলে পড়ে। মা ও বাবা দু'জনেই চাকুরী করেন ; সকাল দশটায় বেরিয়ে যেতে হয়, আর ফেরেন সন্ধে ছ'টা সাড়ে ছ'টায়। কাজেই টুটুকে সারা দিনই একটি আয়ার কাছে থাকতে হয়। টুটু সম্বন্ধে মা-বাবার অভিযোগ, ছেলে সারা বছরই অসুখে ভোগে ; দিন দিন অবাধ্য হয়ে যাচ্ছে ; মাষ্টার আছে তবু পড়ায় মন নেই ; আয়ার কথা শোনে না, তার উপর নানা দৌরাত্ম্য করে ; জিনিস-পত্র ভাঙচুর করে। অফিস থেকে ফেরার সময় মা-বাবা প্রায় প্রতিদিনই কত খেলনা, খাবার নিয়ে আসেন। ছেলের তার প্রতি কোনও আগ্রহ নেই। এদিকে ছুটি-ছাটার দিনে অনেক সময় মা-বাবা দু'জনেই নানা সামাজিক দায়-দায়িত্ব রক্ষায় বাড়ীর বাইরে থাকেন এবং চাকরীর কাজেও তাদের মাঝে মাঝে বাইরে থাকতে হয়।

এরকম অবস্থায় সত্যিইতো মনে হতে পারে, পরিবারের সচ্ছল

অবস্থা, কোন কিছুর অভাব নেই, তবুও ছেলে কেন মানুষ হচ্ছে না, হিসাবে কেন গরমিল হচ্ছে।

ঘটনা নং ২। এগার বছরের মেয়ে কুকাই। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। সাত বছরের একটি ভাই আছে। বাবা অফিসে যান, ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনা দেখান। মা ঘর-গেরস্থালী ও সামাজিক কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু মা কিছুটা খিট্‌খিটে মেজাজের লোক। এটা সেটা নিয়ে সকলের সাথেই খিট্‌খিট্ করছেন। সামান্য ব্যাপার নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে মাঝে মাঝেই খিটিমিটি হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা অপ্রীতিকর অবস্থায় গিয়েও পৌঁছায়। এসকল খিটিমিটি অনেক সময়ই ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া বা অন্য ব্যাপারকে কেন্দ্র করে মতান্তর থেকে উদ্ভূত হয়। কুকাই এখন বড় হয়েছে, অস্বস্তি বোধ করে, বিমর্ষ হয়ে যায়। এর উপর মা তাঁর আচরণে ছেলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করেন। মেজাজটা মেয়ের প্রতিই বেশী দেখান। বাবা একদিন বলছিলেন যে কুকাই আজকাল পড়াশুনায় অমনোযোগী হয়ে যাচ্ছে, পরীক্ষায় ফেল করছে। মাঝে-মাঝে বিমর্ষ হয়ে থাকে; স্কুলের পড়াশুনার ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলে, অথচ কয়েক বছর আগেও ও পড়াশুনায় বেশ ভাল ছিল।

এখানেও সেই গরমিল হিসেব। যোগফল তো এমনটি হওয়ার কথা নয়। তবে কেন এমন হলো?

ঘটনা নং ৩। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র টুকুন। নতুন স্কুলে ভর্তি হয়ে পরীক্ষায় খারাপ করেছে। মা-বাবা লজ্জায় মরে যাচ্ছেন। বন্ধুবান্ধবের কাছে তাঁদের মুখ দেখানো ভার। বাড়ীতে মাষ্টার মশাই পড়ান। উচ্চ মধ্যবিত্ত, কোন কিছুর অভাব নেই। টুকুন নার্সারিতে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড হ'তো। তৃতীয় শ্রেণীর ঘটনায় মা-বাবা অস্থির হয়ে পড়েছেন। এর জন্য মা দোষ দেন বাবাকে, বাবা দোষ দেন মাকে। এই নিয়ে বিবাদের অন্ত নেই। ক'দিন আগে টুকুনের জন্মদিন পালন করা হয়েছে ধুমধাম করে। টুকুনের ক্লাসের

বন্ধুরা, আত্মীয়-স্বজন কত নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। মা-বাবার সেদিন টুকুনকে নিয়ে কত গর্ব। তার কয়েক দিন পরই পরীক্ষার ফল বেরুল। টুকুন এখন একেবারে চুপসে গেছে। ওর এখন মনে হয় ওর আর কারুর সামনে যাওয়া উচিত নয়। মা-বাবাও ক'দিন ধরে আর ওকে কোথাও নিয়ে যান না, পাছে ওর পরীক্ষার ফলের কথা অন্যকে বলতে হয়। একদিন বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরে বসে টুকুনের পড়াশুনা ও তার উন্নতিকল্পে মা-বাবা পরিবারের অন্যান্য কয়েকজন বন্ধু ও মাষ্টারমশাইএর সাথে আলোচনা করছিলেন। টুকুনও সেখানে উপস্থিত। হঠাৎ ওর মা বলে বসলেন, "আমি কারুর কাছে মুখ দেখাতে পারি না। এ ছেলে দিয়ে কি করব। সম্ভব হলে আমি ওকে সঞ্জয়ের সঙ্গে পালটে নিতাম।" যার সঙ্গে টুকুনকে বদলে নেওয়ার কথা বললেন সে টুকুনেরই ক্লাসের ছাত্র, এবার পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হয়েছে।

এই মা'ই কতবার তাঁর বন্ধু-বান্ধবের কাছে গর্ব করে বলেছেন যে টুকুনের উন্নতির চিন্তায় তিনি রাত্রে ঠিকমত ঘুমাতে পারেন না।

আমরা অংক শিখেছি তু'য়ে আর তিনে যোগ করলে পাঁচ হয়। সব সময় এবং সর্বত্রই হয়। কিন্তু ছেলে-মেয়ের আচার-আচরণের ক্ষেত্রে, তাদের মনের খাতার পাতায় যে যোগ অংকের অনুশীলন হচ্ছে, তার হিসেব যে অনেক ক্ষেত্রেই গরমিল হয়ে যাচ্ছে। সেখানে তু'য়ে তিনে কখনও চার হচ্ছে, কখনও ছয় হচ্ছে, কখনও বা শূন্য হয়ে যাচ্ছে। পাঁচ যেন কিছুতেই আসছে না। তবে এ অংকের নিয়ম কি আলাদা? কোন্ অদৃশ্য উৎপাদক সব গরমিল করে দিচ্ছে? সন্তানের মঙ্গলের জন্য সব ব্যবস্থাই আছে, কোন কিছুরই অভাব নেই। তাদের মঙ্গলের চিন্তায় মা-বাবার চোখে ঘুম নেই, ভালবাসার অন্ত নেই। তবু সব মিলে-মিশে সমষ্টি পাঁচ হচ্ছে না কেন?—বিনা বিশ্লেষণে, বিনা পরীক্ষায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, বিজ্ঞানসম্মত নয়।

মানবশিশুর দেহে ও মনে সুস্থ ভাবে বড় হয়ে ওঠার জন্য বস্তুগত

উপকরণের, যেমন স্বাস্থ্যসম্মত খাওয়া-দাওয়া, একটা আস্তানা, পড়াশুনা, চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদির নিশ্চয়ই বিশেষ প্রয়োজন আছে। আবার তার সামাজিক ও মানবিক বোধগুলি বিকাশের জন্য একটা উপযুক্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশও দরকার। এর আগে যে ঘটনাগুলি বিবৃত করা হয়েছে তার প্রতি ক্ষেত্রেই এগুলি ছিল। উপরন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই মা-বাবা বলেছেন যে তাঁরা ছেলে-মেয়েদের দেখাশুনার ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেন না। ছেলে-মেয়েদের ভালবাসার ব্যাপারে কিছুমাত্র ঘাটতি নেই। তবে এমনটি কেন হ'লো? হিসেবে ভুল কোথায় হচ্ছে?

ঘটনা নং ৪। মিনুর খুব অসুখ করেছে, টাইফয়েড। মিনুর বয়স সাত। মা-বাবার আদরের মেয়ে। টাইফয়েড যখন সারার মুখে, তখন মা গেলেন হাসপাতালে। কয়েক দিন বাদে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন একটি ছোট ভাইকে। মা হাসপাতালে যাবার কয়েক দিন আগে থেকেই মিনুর সেবা শুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল নার্স। বাবা ওর কাছে-কাছে থাকার চেষ্টা করতেন, কিন্তু চাকুরীর কাজে তাঁকে বাইরে যেতে হতো। ছোট ভাইকে নিয়ে মা বাড়ী আসার পরই সব ব্যাপারটা ঘোরাল হয়ে দাঁড়াল। মিনু খায় না, কথা বলে না। ওর ধারণা হলো মা ওকে ভালবাসে না। তা না হলে ওর এই অসুখের মধ্যে মা চলে গেলেন ভাইকে আনতে? এর পর থেকে ভাইএর প্রতি ওর দারুণ হিংসা। ভাইএর জন্য কেউ কিছু নিয়ে এলে ওকে যে কেউ ভালবাসে না, সেটাই প্রমাণ হয়।

মা-বাবারা বলেন, সব ঠিকই তো আছে। কোথাও কিছু ত্রুটি নেই। ছেলে-মেয়েরাও কি তাই মনে করে? ছেলে-মেয়েদের মনে করার ব্যাপারটার কি কিছু গুরুত্ব আছে? এই মনে করার ব্যাপারটা কি অদৃশ্য উৎপাদক হিসেবে কাজ করে, আর গোপনে থেকে হিসেবে গরমিল করে? অর্থাৎ সব কিছু উপকরণ থাকা সত্বেও শিশু যদি বঞ্চনার ব্যথা অনুভব করে, তাহলে তা তার মানসিক স্বাস্থ্যে ভারসাম্য-

হীনতার সৃষ্টি করে কি? এ প্রশ্ন বিশেষ করে ভালবাসা পাওয়া না পাওয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কারণ বস্তুগত উপকরণের ক্ষেত্রে মনে করাকরির সুযোগ কম। ভালবাসার কোন বস্তুগত রূপ নেই। কাজেই ভালবাসার রাজ্যে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ। ভালবাসা প্রকাশিত হয় আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে। মনোজগতে এই আচার-আচরণের প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই এর অনুভব। এই বোধ অনেকটা ইন্দ্রিয়াতীত। উপযুক্ত ভরণ-পোষণ ও সামাজিক পরিস্থিতির অন্তর্ভুক্ত বস্তুগত উপকরণগুলি মানবশিশুর জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষায় একান্ত প্রয়োজন, এগুলি না হলে প্রাণ-ধারণ সম্ভব নয়,—একথা আমরা সহজেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝতে পারি। আর জৈবিক অস্তিত্ব বিপন্ন হলে মানসিক সুস্থতা বিপর্যস্ত হবে,—একথা বুঝতেও আমাদের বেগ পেতে হয় না। কিন্তু বস্তুগত উপকরণের সবকিছু পাওয়া সত্ত্বেও ভালবাসা নামক অদৃশ্য উপকরণটি মানব শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে কিভাবে অলক্ষ্যে কাজ করে যায়, পূর্বোক্ত হিসেবের কারচুপি ধরার জন্য তা আমাদের সর্বপ্রথমেই বোঝা দরকার। অর্থাৎ আমাদের সমস্যাটা দাঁড়াচ্ছে এরূপ—মানব শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে মা-বাবা অথবা অনুরূপ ব্যক্তির ভালবাসা সম্বন্ধে শিশুর ধারণা বা বোধের স্থান কি? এ প্রশ্নের যথাযথ মীমাংসার জন্য একটি পরীক্ষা (experiment) ও তার ফলাফলের উল্লেখ করা হচ্ছে। কিন্তু তার আগে ভালবাসা বলতে কি বুঝব সেটা ঠিক করে নেওয়া দরকার।

ভালবাসার বস্তুগত অবয়ব নেই। এর রূপ, গন্ধ, স্পর্শ, ধ্বনি ও স্বাদ কিছুই নেই। কিন্তু আমরা কথায় কথায় বলি 'ভালবাসার উষ্ণ স্পর্শ' বা 'ভালবাসার উজ্জ্বলতা' ইত্যাদি। কাজেই দেখা যাচ্ছে ভালবাসার কিছু না থেকেও সবই আছে। আমাদের উপলব্ধিতে এর রূপ, গন্ধ, স্পর্শ, ধ্বনি ও স্বাদ সবই আরোপ করে নিই। প্রকৃত বিশ্লেষণে ভালবাসার রাজ্যে আমরা দু'রকমের উপলব্ধি দেখতে পাই। এ রাজ্যের একজন বলে, 'ভালবাসা পেয়েছি' আর একজন বলে,

'ভালবাসা দিয়েছি'। একজন বলে, 'ভালবাসি', আর একজন বলে, 'ভালবাসো'। এ যেন একটা দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার। কিন্তু এই দেওয়া-নেওয়াটা এরূপ নয় যে, যে দিচ্ছে, সে কেবল দিচ্ছেই, নিচ্ছে না; আর যে নিচ্ছে, সে কেবল নিচ্ছেই, দিচ্ছে না। উভয় প্রান্ত থেকেই দেওয়া-নেওয়ার প্রবাহ চলতে থাকে। কখনও কোন প্রান্ত থেকে কোনও একটা বেশী বা কম। এখন প্রশ্ন, এই দেওয়া-নেওয়ার স্বরূপটা কি রকম? তা বুঝতে গেলে আমাদের এমন একটি দৃষ্টান্ত খোঁজ করা দরকার যেখানে ভালবাসা প্রবাহের দু'প্রান্তের একটিতে কেবলই দেওয়া এবং অন্যটিতে কেবলই নেওয়া। যেমন মা ও শিশু-সন্তানের ভালবাসা। মা কেবলই দিচ্ছে, বিনিময়ে কিছুই চাইছে না। এ যেন অহেতুক দেওয়া (যদিও আমরা শিশুর প্রাণরক্ষার প্রয়োজনের মধ্যে এর হেতু খুঁজে পাই)। শিশু কেবলই নিচ্ছে, তার দেওয়ার কিছু নেই এখনও। মা দিয়েই মুগ্ধ, সন্তান নিয়েই সঞ্জীবিত। এই দেওয়া-নেওয়ার সম্পূর্ণ অবিমিশ্র ও অবাধ রূপের বিকাশ আমরা দেখতে পাই মনুষ্যেতর অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে, যাদের মধ্যে কোনও সামাজিক বিকাশ নেই। একথা বলার অর্থ এই যে মানব-মাতার শিশু-সন্তানকে ভালবাসা দেওয়া অনেক সময় সামাজিক কারণে ব্যাহত হতে দেখা গেছে। যেমন অবৈধ শিশুর প্রতি তার মায়ের ভালবাসা সামাজিক কারণে ব্যাহত হয়। সামাজিক চাপ সেখানে এত প্রবল যে অনেক সময় মা তাঁর হৃদয়ে ভালবাসার অস্তিত্বই অনুভব করতে ভয় পায়। ঠিক এইভাবে নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সামাজিক মূল্যবোধের চাপে মানব সমাজে শিশুর প্রতি মায়ের প্রকৃত ভালবাসার প্রবাহে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। এ সকল সম্ভাবনা মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে নেই। তাই একমুখীন ভালবাসার প্রবাহ সেখানে অবিমিশ্র। উপরের এই সকল উদাহরণের দ্বারা এটা পরিস্ফুট যে প্রকৃত ভালবাসার অর্থ সর্তহীন

হীনতার সৃষ্টি করে কি? এ প্রশ্ন বিশেষ করে ভালবাসা পাওয়া না পাওয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কারণ বস্তুগত উপকরণের ক্ষেত্রে মনে করাকরির সুযোগ কম। ভালবাসার কোন বস্তুগত রূপ নেই। কাজেই ভালবাসার রাজ্যে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ। ভালবাসা প্রকাশিত হয় আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে। মনোজগতে এই আচার-আচরণের প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই এর অনুভব। এই বোধ অনেকটা ইন্দ্রিয়াতীত। উপযুক্ত ভরণ-পোষণ ও সামাজিক পরিস্থিতির অন্তর্ভুক্ত বস্তুগত উপকরণগুলি মানবশিশুর জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষায় একান্ত প্রয়োজন, এগুলি না হলে প্রাণ-ধারণ সম্ভব নয়,—একথা আমরা সহজেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝতে পারি। আর জৈবিক অস্তিত্ব বিপন্ন হলে মানসিক সুস্থতা বিপর্যস্ত হবে,—একথা বুঝতেও আমাদের বেগ পেতে হয় না। কিন্তু বস্তুগত উপকরণের সবকিছু পাওয়া সত্ত্বেও ভালবাসা নামক অদৃশ্য উপকরণটি মানব শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে কিভাবে অলক্ষ্যে কাজ করে যায়, পূর্বোক্ত হিসেবের কারচুপি ধরার জন্য তা আমাদের সর্বপ্রথমেই বোঝা দরকার। অর্থাৎ আমাদের সমস্যাটা দাঁড়াচ্ছে এরূপ—মানব শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে মা-বাবা অথবা অনুরূপ ব্যক্তির ভালবাসা সম্বন্ধে শিশুর ধারণা বা বোধের স্থান কি? এ প্রশ্নের যথাযথ মীমাংসার জন্য একটি পরীক্ষা (experiment) ও তার ফলাফলের উল্লেখ করা হচ্ছে। কিন্তু তার আগে ভালবাসা বলতে কি বুঝব সেটা ঠিক করে নেওয়া দরকার।

ভালবাসার বস্তুগত অবয়ব নেই। এর রূপ, গন্ধ, স্পর্শ, ধ্বনি ও স্বাদ কিছুই নেই। কিন্তু আমরা কথায় কথায় বলি 'ভালবাসার উষ্ণ স্পর্শ' বা 'ভালবাসার উজ্জ্বলতা' ইত্যাদি। কাজেই দেখা যাচ্ছে ভাল-বাসার কিছু না থেকেও সবই আছে। আমাদের উপলব্ধিতে এর রূপ, গন্ধ, স্পর্শ, ধ্বনি ও স্বাদ সবই আরোপ করে নিই। প্রকৃত বিশ্লেষণে ভালবাসার রাজ্যে আমরা দু'রকমের উপলব্ধি দেখতে পাই। এ রাজ্যের একজন বলে, 'ভালবাসা পেয়েছি' আর একজন বলে,

'ভালবাসা দিয়েছি'। একজন বলে, 'ভালবাসি', আর একজন বলে, 'ভালবাসো'। এ যেন একটা দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার। কিন্তু এই দেওয়া-নেওয়াটা এরূপ নয় যে, যে দিচ্ছে, সে কেবল দিচ্ছেই, নিচ্ছে না; আর যে নিচ্ছে, সে কেবল নিচ্ছেই, দিচ্ছে না। উভয় প্রান্ত থেকেই দেওয়া-নেওয়ার প্রবাহ চলতে থাকে। কখনও কোন প্রান্ত থেকে কোনও একটা বেশী বা কম। এখন প্রশ্ন, এই দেওয়া-নেওয়ার স্বরূপটা কি রকম? তা বুঝতে গেলে আমাদের এমন একটি দৃষ্টান্ত খোঁজ করা দরকার যেখানে ভালবাসা প্রবাহের দু'প্রান্তের একটিতে কেবলই দেওয়া এবং অন্যটিতে কেবলই নেওয়া। যেমন মা ও শিশু-সন্তানের ভালবাসা। মা কেবলই দিচ্ছে, বিনিময়ে কিছুই চাইছে না। এ যেন অহেতুক দেওয়া (যদিও আমরা শিশুর প্রাণরক্ষার প্রয়োজনের মধ্যে এর হেতু খুঁজে পাই)। শিশু কেবলই নিচ্ছে, তার দেওয়ার কিছু নেই এখনও। মা দিয়েই মুগ্ধ, সন্তান নিয়েই সঞ্জীবিত। এই দেওয়া-নেওয়ার সম্পূর্ণ অবিমিশ্র ও অবাধ রূপের বিকাশ আমরা দেখতে পাই মনুষ্যেতর অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে, যাদের মধ্যে কোনও সামাজিক বিকাশ নেই। একথা বলার অর্থ এই যে মানব-মাতার শিশু-সন্তানকে ভালবাসা দেওয়া অনেক সময় সামাজিক কারণে ব্যাহত হতে দেখা গেছে। যেমন অবৈধ শিশুর প্রতি তার মায়ের ভালবাসা সামাজিক কারণে ব্যাহত হয়। সামাজিক চাপ সেখানে এত প্রবল যে অনেক সময় মা তাঁর হৃদয়ে ভালবাসার অস্তিত্বই অনুভব করতে ভয় পায়। ঠিক এইভাবে নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সামাজিক মূল্যবোধের চাপে মানব সমাজে শিশুর প্রতি মায়ের প্রকৃত ভালবাসার প্রবাহে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। এ সকল সম্ভাবনা মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে নেই। তাই একমুখীন ভালবাসার প্রবাহ সেখানে অবিমিশ্র। উপরের এই সকল উদাহরণের দ্বারা এটা পরিস্ফুট যে প্রকৃত ভালবাসার অর্থ সর্তহীন

ভালবাসা, বিনিময়ে কিছু না পাওয়া। সেখানে গ্রহীতার প্রয়োজনটাই বড়, তার মূল্যটাই প্রধান। মা যেমন ছোট শিশুকে ভালবাসার উষ্ণতায় আবৃত করে রাখে (যদিও এরূপ নিস্বার্থ ভালবাসার মধ্যে দাতার একটা সুখানুভূতি থাকে)। শিশু-সন্তানের প্রয়োজন কেবলই নেওয়া। ভালবাসার এই রূপ প্রকৃতিদত্ত। প্রকৃতি ভালবাসাকে মানুষের (এবং অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর প্রাণীর) বুদ্ধি-বৃত্তির উপর ছেড়ে দিয়ে লাভ লোকসানের ঝুঁকি নিতে প্রচেষ্টা করে নি। তাই ভালবাসাকে প্রাণীর স্বভাবের মধ্যে গ্রথিত করেছে, একে প্রবৃত্তির (instinct) পর্য্যায়ে নিয়ে গিয়ে সকল রকম ঝুঁকি এড়িয়েছে।

এ হলো ভালবাসার একটা আদর্শ অবস্থা। বাস্তবে এরূপ অনাবিল, অবিমিশ্র ও সর্তহীন ভালবাসা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কাজেই আমাদের বাস্তবের কথা ভাবতে হবে। মা সন্তানকে ভালবাসে। কিন্তু এ ভালবাসাও সকল সময় অবিমিশ্র নয়। বাস্তব ক্ষেত্রে এ ভালবাসার সাথে কখনও বিরক্তি বোধ, কখনও রাগ কিছু পরিমাণে থাকে। কারণ মায়ের শারীরিক মানসিক ক্ষমতা একটা সীমার মধ্যে বাঁধা। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ছোট্ট শিশু, রাতে কাঁদে, শীতের রাতে প্রস্রাব করে বিছানা ভেজায়। দিনের পর দিন এরকম হলে মায়ের ঘুমের ব্যাঘাত হয়। এতে কখনও-সখনও মা বিরক্ত হয়ে বকা-ঝকার মধ্যে তা প্রকাশ করতে পারেন। শিশু এতে খানিকটা আক্রমিত (aggressed) ও প্রত্যাখ্যাত (rejected) বোধ করতে পারে। মায়ের ভালবাসা শিশু উপলব্ধি করে মায়ের সাহচর্যের মধ্য দিয়ে। শিশু এই সাহচর্য্য যতটা চায় বাস্তবে তা নাও পেতে পারে। এমন কি শিশুর প্রয়োজনেই শিশুকে অনেক সময় নানা ভাবে বঞ্চিত করতে হয়। যেমন অসুস্থ শিশু শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর কিছুর জন্য বায়না করলে তাকে নিবারণ করতেই হয়। আবার শিশুকে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হলে তার আচরণকে নানা দিক থেকে সংযত করতে হয়। যেমন

একজন আড়াই বছর/তিন বছরের শিশুর জিনিস-পত্র ভাঙ-চুর করা স্বভাবগত। কিন্তু বাস্তবে তাকে একেবারে এই স্বভাবের উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। কাজেই দেখা যাচ্ছে একজন শিশুকে উপযুক্ত নাগরিকরূপে গড়ে তুলতে হলে নানাদিক থেকে তাকে সংযত করতে হয়। আর এজন্য তাকে কখনও কখনও শাসন করার প্রয়োজন হয়। এইভাবে আমরা দেখতে পাই বাস্তবক্ষেত্রে প্রতি শিশুকেই কিছুটা হতাশাবোধ অনুভব করতে হয়। কিছুটা বকা-ঝকা চড়-চাপড় খেতেই হয়। মা-বাবার কেবলমাত্র শিশু-সন্তানকে নিয়েই এই জগৎ নয়। মা-বাবাকে আরও পাঁচ জনের দিকে, আরও পাঁচটা দিকে নজর দিতে হয়। শিশু না চাইলেও এটা তাকে মেনে নিতে হয়। শিশুর দিক থেকে এই সমস্ত অভিজ্ঞতাকে একত্রে আমরা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অভিজ্ঞতা বলতে পারি। কাজেই দেখা যাচ্ছে, বাস্তব ক্ষেত্রে ভালবাসা পাওয়ার বোধ একটি মিশ্র অভিজ্ঞতা। মা-বাবার কাছ থেকে ভালবাসা পাওয়ার অভিজ্ঞতা ও তাদের কাছ থেকে আক্রমিত ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অভিজ্ঞতা—এই দু'টি অভিজ্ঞতার মিশ্রণের মধ্য দিয়ে ভালবাসা পাওয়ার অভিজ্ঞতাটি দেখা দেয়।

ভালবাসার এই স্বরূপের পরিপ্রেক্ষিতে এখন দেখা যাচ্ছে যে ভালবাসা পাওয়া বা না পাওয়ার প্রকৃত যাচাই হচ্ছে গ্রহীতার বোধ বা ধারণার মধ্যে। অনেক কিছু উপকরণ পেয়েও শিশু মনে করতে পারে যে সে ভালবাসার ক্ষেত্রে বঞ্চিত; আবারসামান্য উপকরণের মধ্যেও শিশু ভালবাসার ভোজে নিজেকে পরিতৃপ্ত মনে করতে পারে। ভালবাসা পাওয়া বা বঞ্চনার ক্ষেত্রে শিশুর অনুভবই আসল কথা; বস্তুগতভাবে এবং বাস্তবে সে কতটা পেল বা না পেল, সেটা বড় কথা নয়।

অতএব প্রকৃত ভালবাসা নিঃসর্ত এবং নিঃস্বার্থ। তা কেবল ভালবাসার পাত্রের প্রয়োজনের দ্বারাই নির্ধারিত। হয়ত এ'রূপ অবিমিশ্র ভালবাসা মনুষ্য সমাজে দুর্লভ; তথাপি আমরা পূর্বেই বলেছি

যে শিশু-সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসার মধ্যে এর পরিচয় অনেকাংশে পাওয়া যায়। এই আদর্শ অবস্থার সন্নিকটবর্তিতার দ্বারা আমরা ভালবাসার গুণগত তারতম্য নির্ধারণ করতে পারি।

আমরা শিশুর ভালবাসায় বাঞ্চনা-বোধের কথা উল্লেখ করেছি। বাঞ্চনা-বোধ ছাড়া এর আরও একটি দিক রয়েছে। অনেক সময় দেখা যায়, যে কোনও ঘটনার ফলেই হোক বা মা-বাবার আচরণের জন্যই হোক, কোনও শিশু মনে করতে থাকে যে অন্যান্য ভাই-বোন অপেক্ষা মা-বাবা তাকেই বেশি ভালবাসে। তার জন্য মা-বাবার ভাবনার অন্ত নেই। সে-ই মা-বাবার চোখের মণি। এরূপ বোধ লালিত হতে থাকলে শিশুর আচরণের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়।

ঘটনা নং ৫। ছয় বছর বয়সের সময় বুলুর একবার কঠিন অসুখ হয়। চার-পাঁচ দিন হয়ে গেল জ্বর আর নামে না, অত্যধিক জ্বর। বাড়ীর সব লোকই বুলুকে নিয়ে ব্যস্ত। মা বুলুর কাছ-ছাড়া হন না। অবশেষে বুলু আরোগ্য লাভ করল। তারপর থেকে বুলু মাঝে মাঝেই সর্দি, জ্বর ইত্যাদিতে ভোগে। একদিন ওর কাকা ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, "তুই এত অসুখে ভুগিস কেন রে?" বুলু উত্তর করে, "অসুখ ভাল লাগে, মা সব সময় কাছে থাকে, অসুখ করলে বাবা আমার জন্য ফল, বিস্কুট নিয়ে আসে, সবাই বেশি ভালবাসে।" বুলুর এখন বয়স বিশ বছর। ওর এখনও ধারণা মা-বাবা ওকে সব চাইতে বেশি ভালবাসে। "জানিনা কেন, মা-বাবা আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না। অন্য ভাই-বোনের জন্য তারা ততটা ভাবে না। আমার জন্যই তাঁরা অস্থির।" বিয়ের পনের দিন পরেই বুলু হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হয়।

ভালবাসা পাওয়ার বোধের মধ্যে যদি অতিরঞ্জন থাকে তাহলে বাস্তব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে সেই বোধ আঘাত প্রাপ্ত হতে পারে। কোনও জিনিস বাস্তবে যা নয়, তাকে অধিকতর বড় করে

দেখানোর প্রবণতা ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যে প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এরূপ অতিরঞ্জন হয়ত না পাওয়ার আশঙ্কা থেকে উদ্ভূত, অথবা ভালবাসা হারানোর ভয়ের মধ্যে এর উৎস। (বর্তমান প্রবন্ধে ভালবাসা পাওয়ার এই অতিরঞ্জিত বোধ সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান ও পরীক্ষা (Test) করা হয়নি। এখানে বঞ্চনার বোধের দিকটিই মুখ্যতঃ বিচার করা হয়েছে)।

এখন দেখা যাক ভালবাসার ক্ষেত্রে বঞ্চনার বোধ শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তার পূর্বে মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমাদের একটা পরিষ্কার ধারণা করে নেওয়া দরকার। ত্রুটিহীন মানসিক স্বাস্থ্য একটা আদর্শগত অবস্থা। এ একটা ধারণা বিশেষ। বাস্তবে এর অস্তিত্ব মেলা সম্ভব নয়। উপরন্তু মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোনও একটি স্থির-নিশ্চিত (absolute) ধারণা করা সম্ভব নয়। বাস্তব পরিস্থিতি ভেদে এই ধারণায়ও পরিবর্তন হতে বাধ্য। কোনও একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে যদি কারুর দু'একটা মানসিক স্বাস্থ্যহানির লক্ষণ দেখা দেয় তাহলে নিশ্চয়ই তাকে মানসিক রোগ-গ্রস্ত বলা চলবে না, যেমন নাকি অস্বাভাবিক শারীরিক চাপের ফলে যদি কারুর শারীরিক স্বাস্থ্যের হানি ঘটে তাহলে নিশ্চয়ই তাকে রুগ্ন স্বাস্থ্যসম্পন্ন বলা যাবে না। 'সুস্থতা' কথাটির সংজ্ঞা গড় সুস্থ মানুষের সুস্থতার পরিমাপের উপর নির্ভরশীল। এই পরিবর্তনশীল জগতে প্রত্যেক মানুষকেই নানারকম অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। পরিবেশের সংস্পর্শে এসে মানব-মন বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখায়। বিভিন্ন উদ্দীপকের দ্বারা বিভিন্ন ভাবে উদ্দীপিত হয়। কোনও সুখকর পরিস্থিতিতে মানব-মন স্বভাবতঃই প্রফুল্লতার অভিব্যক্তি ঘটায়, আবার বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে আত্ম-প্রকাশ করে দুঃখের অভিব্যক্তি। মানব-মন যখন পরিস্থিতি বা পরিবেশ অনুযায়ী প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তি ঘটাতে পারে না তখনই তার

মধ্যে অস্বাভাবিকতার সূত্রপাত দেখতে পাওয়া যায়। একটি উদ্দীপকের দ্বারা সাধারণ গড় মানুষ যেভাবে উদ্দীপিত হয়, কেউ যদি আচরণে তার থেকে কিছু ব্যতিক্রম দেখায় তাহলে তার মানসিক সাম্য অবস্থায় কিছু ব্যাঘাত ঘটেছে বলে সন্দেহ করা যেতে পারে। প্রত্যেক গড় মানুষকেই তাই পরিবেশে কিছু না কিছু প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। কখনও কখনও এই প্রতিকূল অবস্থা সাধারণ মাত্রাকে ছাড়িয়ে অস্বাভাবিকতার পর্যায়ে পৌঁছায়। তখন কেউ হয়ত অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যে সে তার অহং-শক্তি (Ego-strength) দ্বারা মানসিক অস্বস্তিকে কাটিয়ে উঠতে পারে কিনা। কোনও মানুষ সাময়িকভাবে রাগ, উৎকণ্ঠা, বিমর্ষতা ইত্যাদি বোধ করতে পারে। কিন্তু দেখতে হবে যে তার অহং-এর এই অবস্থাকে কাটিয়ে ওঠার মত ক্ষমতা আছে কিনা। প্রত্যেক গড়-মানুষের অহং-ই এই ক্ষমতায় বলীয়ান্। যেখানে অহং এই ক্ষমতা দেখাতে পারে না, বুঝতে হবে সেখানেই দুর্বলতা, সেখানেই স্বাস্থ্যহীনতা। শিশু জন্মাবার পরক্ষণ থেকেই পরিবেশের নানা বস্তু ও ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে ও পরিবেশের সাথে নানা মিথষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বড় হতে থাকে। এই মিথষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সে যে সকল প্রতিক্রিয়া দেখায় তার মধ্যে যদি কিছু ব্যতিক্রম থাকে তা'হলে তার মানসিক স্বাস্থ্যে কিছু হানি ঘটেছে বলে সন্দেহ করা যেতে পারে। যেমন কোনও শিশু যদি তিন-চার মাস বয়সেও তার মায়ের হাসির প্রত্যুত্তর হাসির দ্বারা না দিতে পারে, অথবা সাত আট মাস বয়সের শিশুকে যদি দেখা যায় সে চুপ্‌চাপ্‌ শুয়ে আছে, পরিবেশের ব্যক্তিদের প্রতি তার কোন কৌতূহল নেই ও ঘুমের পরিমাণ খুব অল্প (এই সময় শিশুরা সাধারণতঃ চৌদ্দ/পনের ঘণ্টা ঘুমোয়), তাহলে সে ক্ষেত্রে মানসিক সুস্থতায় কিছু ব্যাঘাত ঘটেছে বলে সিদ্ধান্ত করতে হবে (অবশ্য শিশুর যদি কোনও শারীরিক অসুখ না থাকে)। চার

বছর বয়সের শিশু যদি তার পায়খানা-প্রস্রাবের উপর কিছুমাত্র নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি তার কিছুমাত্র আগ্রহ না থাকে, কথা বলার সময়, শারীরিক যন্ত্রপাতি ঠিক থাকা সত্ত্বেও, ভাষার মধ্য দিয়ে তার মনোভাবের অভিব্যক্তি না ঘটাতে পারে, তাহলে তা তার মানসিক স্বাস্থ্যে গভীর ক্ষত বলেই ধরতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে সাধারণ গড়-শিশু তার শারীরিক ও মানসিক (বুদ্ধিগত ও প্রক্ষোভজনিত) বিকাশের পথে যেভাবে আচরণ করে থাকে তার থেকে কিছুমাত্র ব্যতিক্রমই মানসিক স্বাস্থ্য-হীনতা। এই গড়-শিশুর আচরণের সীমার মধ্যে থাকাই সুস্থতা।

এই আলোচনায় মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটা নঞর্থক বর্ণনাই দেওয়া হলো। অর্থাৎ কোন্ কোন্ অবস্থার অভাব ঘটলে মানসিক স্বাস্থ্যহীনতা দেখা দেয় তার নিরূপণের মধ্য দিয়েই মানসিক স্বাস্থ্যের অনুসন্ধান করা হয়েছে, কারণ মানসিক স্বাস্থ্যহীনতা না ঘটলে মানসিক স্বাস্থ্য অটুট থাকবে। এরূপ করার কারণ মানসিক স্বাস্থ্য নিরূপণের জন্য আমরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছি তা একটি নঞর্থক প্রক্রিয়া। অর্থাৎ ব্যবহৃত অভীক্ষাটির (Test) দ্বারা মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণগুলি নির্ধারণ করে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা যাচাই করা হয়েছে। একে নঞর্থক প্রক্রিয়া বা রীতি (negative approach) বলা যেতে পারে।

এখন দেখা যাক মা-বাবার ভালবাসা সম্বন্ধে শিশুর ধারণা তার মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

পরীক্ষা (experiment) :—

উপরোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একটি পরীক্ষণ সাধিত হয়েছিল। এই পরীক্ষণের জন্য দু'দল শিশু নির্বাচন করা হলো। দু'দল শিশুর বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ।

প্রথম দল	দ্বিতীয় দল
১। মা-বাবা বা অনুরূপ ব্যক্তির সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত। এরা সকলেই বিভিন্ন শিশু-কল্যাণ ভবনে (Welfare-home) কমপক্ষে গত আট বছর ধরে লালিত-পালিত।	১। বরাবর মা-বাবার সংস্পর্শে লালিত-পালিত।
২। দলে শিশুর মোট সংখ্যা ১০০ জন। ৫০ জন বালক, ৫০ জন বালিকা।	২। প্রথম দলের অনুরূপ।
৩। এদের বয়সের গড় ১২।	৩। ঐ
৪। স্কুলে পড়াশুনা করে।	৪। ঐ
৫। আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা আমাদের দেশের সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার সুলভ।	৫। ঐ

প্রথম দলের সাথে দ্বিতীয় দলের পার্থক্য দেখা যাচ্ছে যে প্রথম দল মা-বাবা অথবা অনুরূপ ব্যক্তির সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত। দ্বিতীয় দলের জীবনে এ বঞ্চনা আসেনি। ফলে আমরা ধরে নিতে পারি যে প্রথম দল মা-বাবার ভালবাসায় বঞ্চিত। এখানে বলে রাখা দরকার যে প্রথম দলের শিশুরা যে সকল শিশু-কল্যাণ ভবনে লালিত পালিত সেখানে কারুর সাথেই তাদের এমন কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি যাকে মা-বাবার সাথে সম্পর্কের অনুরূপ বলা চলে। অর্থাৎ সেখানে তারা কাউকেই মা-বাবার অনুরূপ বা বিকল্প বলে মনে করতে পারেনি। এ তথ্য বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরের মারফত জানতে পারা গেছে। কল্যাণ ভবনের পরিচালকদের ও তত্ত্বাবধানকারীদের

সাথে শিশুদের সম্পর্ক কিরূপ তা জানার জন্য শিশুদের কাছে ২৬টি প্রশ্নের একটি প্রশ্নপত্র জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। এই সকল প্রশ্নের উত্তর বিশ্লেষণ করে জানা গেছে যে তাদের জীবনে এমন কোনও ব্যক্তি নেই যাকে তারা মা-বাবার অনুরূপ স্থান দিতে পারে।

আমাদের আর একটা ব্যাপার সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া দরকার। বাস্তব পরিস্থিতির বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে কল্যাণ ভবনের শিশুদের জীবনে মা-বাবা অথবা অনুরূপ ব্যক্তির কাছ থেকে ভালবাসা পাওয়ার অভিজ্ঞতা খুবই ক্ষীণ। কারণ তারা অতি শৈশবকাল থেকেই মা-বাবার সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত। মানুষের ব্যক্তিত্ব সংগঠিত হওয়ার যে বয়স সেই বয়সেই তারা এই অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত। বাস্তব অবস্থাই তাদের জীবনের এই বঞ্চনার কারণ। অপর পক্ষে দ্বিতীয় দলের শিশুরা মা-বাবার সাথেই বরাবর বসবাস করছে। তাই ধরে নেওয়া হয়েছে যে তারা মা-বাবার ভালবাসা যথাযথ ভাবেই পেয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই 'ধরে নেওয়ার' কোন স্থান নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা বস্তুগত প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয়। মা-বাবার সংস্পর্শে থাকলেই যে শিশু যথাযথ ভাবে ভালবাসা পেয়েছে, একথা শিশু নাও মনে করতে পারে। কাজেই এক্ষেত্রে শিশুর মতামতই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তার পরিতৃপ্তি বা অতৃপ্তি বোধই বিচারের মানদণ্ড। কাজেই প্রথম ও দ্বিতীয় দলের শিশুদের নির্ধারণের সময় তাদের মধ্যে ভালবাসা পাওয়ার ব্যাপারে সত্যিকারের উল্লেখযোগ্য কোনও তফাত আছে কিনা, এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্নমালা উভয় দলের ছেলেমেয়েদেরই জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। (এই প্রশ্নমালাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ জে. সি. দাশগুপ্তর পরিচালনায় উদ্ভাবিত। ঐ কাজে বর্তমান লেখকও অন্যতম সহযোগী ছিলেন)। এর উদ্দেশ্য ছিল মা ও বাবার কাছ থেকে শিশুরা কি পরিমাণ ভালবাসা পেয়েছে ও কি পরিমাণে তাদের বিরাগ

ভাজন হয়েছে বা তাদের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে কতটা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে তা পরিমাণগত ভাবে যাচাই করা। কাজেই এই প্রশ্নগুলি একবার মায়ের সম্বন্ধে এবং একবার বাবার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। এই প্রশ্নমালায় ৪০টি প্রশ্ন ছিল। এখানে বলে রাখা ভাল যে এই প্রশ্নমালা যথাযথ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল এবং ঐরূপ প্রশ্ন তৈরীর পদ্ধতিগত সকল সর্তই পরিপূরণ করা হয়েছিল। (এই সকল পদ্ধতিগত দিক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করার এখানে প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়না।) এই প্রশ্নমালার কতগুলি প্রশ্ন ছিল যার উত্তরের মারফত মা ও বাবার ভালবাসা পরিমাপ করা হয়েছে এবং অপর কতগুলি প্রশ্ন ছিল যার দ্বারা মা ও বাবার কাছ থেকে কতটা প্রত্যাখ্যানের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তা পরিমাপ করা। ('প্রত্যাখ্যান' কথাটি এখানে ব্যাপক অর্থে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ মা-বাবার কাছ থেকে কতটা বকা-ঝকা, গাল-মন্দ শুনেছে; কতটা কিল-চড়, মার-ধর খেয়েছে, কতটা তাদের কাছে নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে হয়েছে, অর্থাৎ 'দূর ছাই, দূর হও' প্রভৃতি শুনেছে, ইত্যাদি অভিজ্ঞতাগুলিকে প্রত্যাখ্যানের অভিজ্ঞতা বলা হয়েছে।) সকল প্রশ্নের উত্তরকেই তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে, যথা খুব, কিছু, কম—ইত্যাদি ধরনের। এই উত্তরগুলিতে সংখ্যা দ্বারা মূল্য আরোপ করে পরিমাণগত হিসাব করা হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি যে একটি পৃথক অনুসন্ধান মূলক প্রশ্নমালার উত্তরের মধ্য দিয়ে জানতে পারা গিয়েছিল যে কল্যাণ ভবনের শিশুরা সেখানে মা ও বাবার অনুরূপ কাউকে মনে করতে পারেনি। তথাপি কল্যাণ ভবনের পরিচালক বা তত্ত্বাবধানকারীদের কাছ থেকে তারা কতটা ভালবাসা পেয়েছে বা প্রত্যাখ্যান পেয়েছে তা বোঝার জন্য তাদেরও এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তাদের তত্ত্বাবধানকারীদের মধ্যে যে দু'জনকে তারা মনের দিক থেকে নিকটতম মনে করে, তাদের সম্বন্ধে এই প্রশ্নমালার

উত্তর দিতে বলা হয়েছিল। মা-বাবার কাছে যে সকল শিশুরা মানুষ হচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে প্রধানতম ভালবাসার ব্যক্তি দুজন—মা ও বাবা। কাজেই কল্যাণ ভবনের শিশুদের ক্ষেত্রেও দু'জন খুব কাছের মানুষ সম্বন্ধে (শিশুরা যাদের মনে করে) প্রশ্নগুলি জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। এই প্রশ্নমালা থেকে লব্ধ সাফল্যাঙ্কের (score) তুলনামূলক অবস্থা নিম্নরূপ।

শিশু	ভালবাসা		প্রত্যাখ্যান	
	গড় (mean)	প্রমাণ ব্যত্যয় (standard deviation)	গড় (mean)	প্রমাণ ব্যত্যয় (standard deviation)
প্রথম দল (কল্যাণভবনের)	৫১·০০	১৬·২০	১০·৮৪	৭·৭৮
দ্বিতীয় দল (মা-বাবার কাছে লালিত পালিত)	৭৪·৪০	১২·৮০	১০·৮৮	৬·৫৭

সাফল্যাঙ্কের এই তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় যে জীবনে মা-বাবা অথবা বিকল্প ব্যক্তিদের কাছ থেকে ভালবাসা পাওয়ার ব্যাপারে উভয় দলের মধ্যে গড়ের তফাত হলো ২৩·৪০। এই তফাত দ্বিতীয় দলের শিশুদের অনুকূলে ; অর্থাৎ তারা জীবনে প্রথম দলের শিশুদের থেকে অনেক বেশি পরিমাণে ভালবাসা পেয়েছে। এই তফাতের জন্য বৈচারিক অনুপাত (critical ratio) হয়েছে ১১·৩৬। এই অনুপাত শতকরা ১ ভাগ পর্যায়ে তাৎপর্যপূর্ণ (significant at 1% level)। কিন্তু প্রত্যাখ্যানের অভিজ্ঞতা লাভের দিক থেকে দু'টি দলের শিশুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তফাত পরিলক্ষিত হয় না। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে কল্যাণ ভবনের শিশুরা মা-বাবার বিকল্প কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য ভাবে ভালবাসা পায়নি। এইভাবে তাদের ভালবাসা না পাওয়া সম্বন্ধে আমাদের পূর্ববর্তী ধারণা বস্তুগত

ভাবে প্রমাণিত হলো। কিন্তু প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে উভয় দলের শিশুরই অভিজ্ঞতা সমান। অর্থাৎ কল্যাণ ভবনের শিশুরা ভালবাসা না পেলেও বকা ঝকা বা এক কথায় প্রত্যাখ্যান অন্যান্য শিশুদের মতই পেয়েছে। এ যেন 'ভালবাসার বেলা নেই, বকার বেলা আছে' —গোছের একটা পরিস্থিতি। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব।

এইভাবে ভালবাসা ও প্রত্যাখ্যান পাওয়া না পাওয়া সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চিত হয়ে এই দু'দল শিশুকে আর একটি অভীক্ষা (Test) দেওয়া হলো। এর উদ্দেশ্য ছিল উভয় দলের শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা পরিমাপ করা। এটিও একটি প্রশ্নাবলী পরীক্ষণ (questionnaire test)। এই প্রশ্ন-পত্রটি আমাদের দেশে মনোরোগ চিকিৎসা, মনঃসমীক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্গীয় ডঃ গিরিন্দ্রশেখর বসু কর্তৃক উদ্ভাবিত। একে উদ্বায়ু নিরূপক প্রশ্নমালা (Neurotic Inventory) বলা হয়ে থাকে। এতে বিভিন্ন মানসিক রোগ প্রবণতার লক্ষণ মূলক প্রশ্নাবলী রয়েছে। এই প্রশ্নমালাটি মানসিক স্বাস্থ্যের নঞর্থক দিকটিই উদ্ঘাটিত করে। অর্থাৎ মানসিক স্বাস্থ্যের অভাব-মূলক দিকটিই এর দ্বারা জানা সম্ভব; যে সকল লক্ষণ থাকলে মানসিক স্বাস্থ্যের হানি ঘটে তাই এর দ্বারা জানা যায়। যে সকল লক্ষণ বা গুণ থাকলে মানসিক স্বাস্থ্যের অস্তিত্বের কথা বা এর সদর্থক দিকটি উদ্ঘাটিত হয়, তা যাচাই করা এই প্রশ্নপত্রটির দ্বারা সম্ভব নয়। যেমন এর দ্বারা ব্যক্তির অহং (Ego)-এর শক্তি কতটুকু, তার সুখবোধ (happiness) কতটুকু ইত্যাদি জানা সম্ভব নয়। মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর যে সকল রোগপ্রবণতার লক্ষণ এই প্রশ্নমালাটির দ্বারা জানা যায় তা নিচের তালিকা থেকে বোঝা যাবে। এই প্রশ্নমালায় ৭০টি প্রশ্ন রয়েছে। এই প্রশ্নগুলির উত্তরের সাফল্যাঙ্কের দ্বারা ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যহীনতার গভীরতা

উপলব্ধি করা যায়। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে মানসিক স্বাস্থ্য কতটা বিপর্যস্ত হয়েছে তা আমরা জানতে পারি। এই প্রশ্নমালা প্রয়োগে আমাদের বিচার্য দু'টি দলের লব্ধ দলগত সাফল্যাঙ্কের তুলনামূলক বিচারের মধ্য দিয়ে উভয় দলের মানসিক অস্বাস্থ্যের অবস্থা এবং পরোক্ষভাবে মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা পরিস্ফুট হয়েছে।

দলগতভাবে সাফল্যাঙ্কের তুলনামূলক তালিকা :—

রোগ প্রবণতার লক্ষণ সমূহ (Traits)	প্রথম দল		দ্বিতীয় দল	
	গড় (mean)	প্রমাণ ব্যত্যয় (S. D.)	গড় (mean)	প্রমাণ ব্যত্যয় (S. D.)
সকল প্রবণতাগুলির একত্রে মোট সাফল্যাঙ্ক (total score of all traits)	৯৯·১৭	৩৪·৬৭	৭৬·৫৮	৩৩·১২
উৎকণ্ঠা (anxiety states)	১৮·৭৪	৮·৩২	১৪·২৫	৭·৭৫
হিস্টিরিয়া (Hysteria)	৮·৭৭	৫·৪২	৬·৪৩	৫·৩২
সিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia)	৯·৬৬	৮·৫৩	৬·৬৫	৫·১১
প্যারানোইয়া (Paranoia)	২১·৭৯	৮·৭৩	১৬·৯৯	৭·৯৪
স্নায়বিক অবসাদ (Neurasthenia)	২·৮৮	২·৬৫	২·১৬	২·৪২
বিষণ্ণতা (Depression)	৩·১৭	৩·১৫	১·৯৫	২·৫৫
আবেশিক উদ্বায়ু (Obsession)	১২·২৭	৫·১৫	১০·৬০	৫·৫৬
আতঙ্ক (Phobia)	১৭·৮৫	৮·৩২	১৬·৩০	৭·৭৮

দলগত সাফল্যাঙ্কগুলির পরিসংখ্যানগত তুলনামূলক বিচারের ফলাফল নিম্নলিখিত রূপ :—

প্রবণতা সমূহ (Traits)	ছুটি দলের বিভিন্ন সাফল্যাঙ্কের গড়ের তফাত (mean difference)	যে দলের অনুকূলে (in favour of)	বৈচারিক অনুপাত এবং তার তাৎপর্য (Critical ratio & its level of significance)
সকল প্রবণতা সমূহ একত্রে (Total of all traits)	২২·৫৯	প্রথম দলের অনুকূলে (কল্যাণ ভবনের শিশু)	৪·৭১ ; শতকরা ১ ভাগ পর্যায়ে তাৎপর্যপূর্ণ
উৎকণ্ঠা অবস্থা (Anxiety states)	৪·৪৯	ঐ	৩·৯৪ ; শতকরা ১ ভাগ পর্যায়ে তাৎপর্যপূর্ণ
হিস্টিরিয়া (Hysteria)	২·৩৪	ঐ	৩·০৮ ; শতকরা ১ ভাগ পর্যায়ে তাৎপর্যপূর্ণ
সিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia)	৩·০১	ঐ	৩·০১ ; শতকরা ১ ভাগ পর্যায়ে তাৎপর্যপূর্ণ
প্যারানোইয়া (Paranoia)	৪·৮০	ঐ	৪·৭ ; শতকরা ১ ভাগ পর্যায়ে তাৎপর্যপূর্ণ
স্নায়বিক অবসাদ (Neurasthenia)	·৭২	ঐ	২·০০ ; শতকরা ৫ ভাগ পর্যায়ে তাৎপর্যপূর্ণ
বিষণ্ণতা (Depression)	১·২২	ঐ	৩·০৫ ; শতকরা ১ ভাগ পর্যায়ে তাৎপর্যপূর্ণ
আবেশিক উদবায়ু (Obsession)	১·৭৬	ঐ	২·২০ ; শতকরা ৫ ভাগ পর্যায়ে তাৎপর্যপূর্ণ
আতঙ্ক (Phobia)	১·৫৫	ঐ	১·৩৬ ; তাৎপর্যপূর্ণ নয়

আমাদের বিচার্য ছু'টি দলের মধ্যে তুলনামূলক বিচারে দেখা

যাচ্ছে যে একমাত্র 'আতঙ্ক' ছাড়া অন্য সকল রোগপ্রবণতার লক্ষণগুলি কল্যাণ ভবনের শিশুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশি। কাজেই বলা চলে যে কল্যাণ ভবনের শিশুরা, মা-বাবার কাছে লালিত-পালিত শিশুদের অপেক্ষা মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে নিকৃষ্টতর। এই দলের শিশুদের মধ্যে মা-বাবা অথবা কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কাছ থেকে ভালবাসা পাওয়ার বোধের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যের অভাবও পরিলক্ষিত হচ্ছে। দ্বিতীয় দলের শিশুদের মধ্যে এই ভালবাসা পাওয়ার বোধের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে উন্নততর মানসিক স্বাস্থ্যও পরিলক্ষিত হচ্ছে। উপরোক্ত ভালবাসা পাওয়ার বোধের অভিজ্ঞতাকে যদি 'ক' ধরা যায় এবং মানসিক স্বাস্থ্যকে যদি 'খ' ধরা যায়, তাহলে আমরা দেখতে পাই 'ক'-এর উপস্থিতির সাথে সাথে 'খ'-ও উপস্থিত থাকছে। আবার 'ক' অনুপস্থিত হলে 'খ'-ও অনুপস্থিত থাকছে। অতএব একথা বলা যায় যে 'খ' ও 'ক'-এর মধ্যে একটা কার্য-কারণাংশের সম্বন্ধ বর্তমান। অর্থাৎ মানসিক স্বাস্থ্য এবং মা-বাবার বা অনুরূপ ব্যক্তির কাছ থেকে ভালবাসা পাওয়ার অভিজ্ঞতা কার্য-কারণ বা কার্য-কারণাংশ সম্বন্ধ (cause effect relationship) দ্বারা আবদ্ধ।

এই অনুসন্ধানের ফলাফলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে শৈশবে মা-বাবা অথবা অনুরূপ ব্যক্তির কাছ থেকে ভালবাসা পাওয়ার বোধের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিশুর সুষম ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। এই বোধের অভাব হলে মানব শিশুর ব্যক্তিত্বে নানা অসামঞ্জস্য দেখা দেয়, যা বিভিন্ন মানসিক রোগপ্রবণতার লক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ হতে থাকে। কিন্তু আমাদের অভীক্ষার ফলাফলের মধ্যে দেখা গেছে যে প্রত্যাখ্যান (rejection) বোধের সাফল্যাঙ্কের গড় উভয় দলের ক্ষেত্রেই একই রূপ হয়েছে। এতে প্রশ্ন হতে পারে যে মানসিক স্বাস্থ্য নিরূপণে প্রত্যাখ্যান বোধের কি কোনও প্রভাব নেই? এখানে মনে রাখতে হবে যে ভালবাসার বোধ ও প্রত্যাখ্যান বোধ এ দু'টি আলাদা

ভাবে শিশুর মনকে প্রভাবিত করে না। এই দু'টি বোধ একসঙ্গে থেকে নিজেদের মধ্যে একটা মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা শিশু মনকে প্রভাবিত করে। বাস্তব ক্ষেত্রে কিছুটা আক্রম ও প্রত্যাখ্যান বোধ সকল শিশুকেই লাভ করতে হয়। এর সঙ্গে যদি পর্যাপ্ত ভালবাসা পাওয়ার অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে এই আক্রম ও প্রত্যাখ্যান বোধ কিছুমাত্র বিপত্তি ঘটাতে পারে না। কল্যাণ ভবনের শিশুদের ক্ষেত্রে এই ভালবাসা পাওয়ার বোধেরই বিশেষ অভাব। তাই তাদের জীবনে প্রত্যাখ্যান বোধ আরও প্রকট হয়েছে। এছাড়া আক্রম ও প্রত্যা-খ্যান বোধ নিরূপণের জন্য যে সকল প্রশ্ন করা হয়েছে তার দ্বারা কেবল আক্রমকারী ও প্রত্যাখ্যানকারীর সক্রিয় মনোভাবই নিরূপণ করা সম্ভব। কিন্তু এই আক্রম বা প্রত্যাখ্যান যে সব সময় সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, তা নয়। নির্লিপ্ততা ও উদাসীনতার মধ্য দিয়ে প্রত্যাখ্যান আরও প্রকট হয়ে দেখা দেয়। মা-বাবা সন্তানকে ভালবাসার জোরেই বকাবকি করেন। কল্যাণ ভবনের পরিচালকদের পক্ষে সে জোর অর্জন করা সহজ নয়। মা-বাবা যখন বকাবকি করেন তখন তার মধ্য দিয়েও সন্তান একটা স্পর্শ অনুভব করে; সক্রিয় আক্রমের মধ্যে একটা স্পর্শ রয়েছে, একটা যোগাযোগ রয়েছে। অভিজ্ঞতায় এরূপ দেখা গেছে যে অবাধ্য আচরণ করার পর মা-বাবা শিশুকে বকাবকি না করে যদি নির্লিপ্ত বা উদাসীন থাকেন তাহলে শিশু অনেক সময় ব্যথিত হয়। কারণ সে ক্ষেত্রে সে সংস্পর্শহীনতা অনুভব করে। এইজন্যই দু'বছর আড়াই বছরের একটি শিশু দুষ্টুমি করার পর তার মা তাকে কিছু না বলায় তাকে বলতে শোনা গেছে, "আমাকে বকো, আমাকে মারো।" এই বকা ও মারের মধ্য দিয়ে সে মায়ের সংস্পর্শ অনুভব করে। প্রকৃতপক্ষে শিশু সংস্পর্শের উষ্ণতা লাভ করে ভালবাসার মধ্য দিয়ে। কিন্তু সক্রিয় আক্রমের মধ্যেও এক ধরণের সংস্পর্শ রয়েছে। সক্রিয় আক্রমের মধ্যেও শিশু খানিকটা তার নিজের মূল্য ও অস্তিত্ব

খুঁজে পায়। কিন্তু আক্রম ও প্রত্যাখ্যান যেখানে নিষ্ক্রিয় (passive), অর্থাৎ উদাসীনতা ও নির্লিপ্ততার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত, সেখানে শিশু অনুভব করে পরিপূর্ণ সংস্পর্শহীনতা। সে ক্ষেত্রে সে নিজের কোন মূল্য ও অস্তিত্বই খুঁজে পায় না। এরূপ প্রত্যাখ্যানের ব্যথা আরও গভীর।

ঘটনা নং ৬। কল্যাণ ভবনের ছেলে বিমল। তেরো বছর বয়স হবে। আপন মনে ঘুরে বেড়ায়। প্রতিবেশীর বাগান থেকে ফল চুরি করে, বাগানের ক্ষতি সাধন করে। মাঝে-মাঝে নালিশ আসে। কর্তৃপক্ষ ওর প্রতি খানিকটা উদাসীন, কারণ ওকে বলে লাভ নেই। 'ওর কিছু হবে না'—এই মনোভাব। ওর অবাধ্যতা বেড়ে যায়। একদিন বাগান নষ্ট করা সম্বন্ধে প্রতিবেশীর কাছ থেকে জোরালো নালিশ এলো। বিমলকে ডেকে পাঠানো হলো। কাছে এলে ওকে কিছু প্রহার করা হলো, শাসন করা হলো। বাগান থেকে যে জিনিস এনেছিল তা মালিককে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে বলা হল। ও অল্পক্ষণের মধ্যেই এ নির্দেশ পালন করল। এর জন্য ওকে প্রশংসা করা হল। এর পর থেকে আশ্চর্য রকমে ওর আচরণে পরিবর্তন দেখা গেল। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ও যে মানসিক সংস্পর্শ অনুভব করেছিল তা বজায় রাখার জন্য কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে ও ভবনের পরিচালকদের কাছে কাছে থাকার চেষ্টা করত।

কল্যাণ ভবনের শিশুদের জীবনের আক্রমবোধের রূপটি (যা প্রত্যাখ্যানের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়) আমাদের সাফল্যাঙ্কের মধ্যে বিধৃত নয়। কিন্তু এদিকটিও আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে কল্যাণ ভবনের শিশুদের আক্রমবোধ বা প্রত্যাখ্যান বোধ আরও অধিক। সাফল্যাঙ্কের মধ্য দিয়ে এর প্রকৃত পারমাপ পাওয়া সম্ভব নয়। এইভাবে সংখ্যার মধ্যে যা বিধৃত নয়, গুণগত বিশ্লেষণে তা উদ্‌ঘাটিত। তবে আমাদের একথাও মনে রাখতে

হবে যে মা-বাবার অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারাও সন্তান গভীর আক্রমবোধ বা প্রত্যাখ্যান বোধ অনুভব করতে পারে।

এই আলোচনা দ্বারা এখন দেখা গেল যে মানব শিশুর জীবনে মা-বাবা অথবা অনুরূপ ব্যক্তির ভালবাসা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ভালবাসার উপর শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বহুলাংশে নির্ভর করে। আবার এই ভালবাসার ব্যাপারে শিশুর অনুভূতিটাই গুরুত্বপূর্ণ। ভালবাসা শিশু কতটা অনুভব করছে, তার উপরই সব কিছু নির্ভর করছে। মা-বাবার মনে করাটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। অর্থাৎ মা-বাবা অথবা অনুরূপ ব্যক্তিরা যদি মনে করেন যে তাঁরা যথেষ্ট ভালবাসা দিচ্ছেন এবং ভালবাসা দেওয়ার ব্যাপারটা তাঁরা তাদের নানা আচরণ ও বস্তুগত উপকরণ দেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করছেন, কিন্তু শিশু তা যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারছে না, শিশুর মনে একটা অভাব বোধ থেকেই যাচ্ছে, সে ক্ষেত্রে শিশুর বোধটাই গ্রাহ্য, মা-বাবার ধারণা নয়। এরূপ ক্ষেত্রে শিশুর বোধই তার মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণে প্রভাব বিস্তার করবে, মা-বাবার ধারণা নয়।

বর্তমান আলোচনার শেষে আমরা অপর কয়েকটি প্রশ্নের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যে সকল ক্ষেত্রে শিশুরা মা-বাবার কাছে লালিত-পালিত হয়েও ভালবাসার ক্ষেত্রে বঞ্চনা অনুভব করে, সে সকল ক্ষেত্রে কি তারা প্রকৃতই ভালবাসা পায় না? শিশু-সন্তান ও মা-বাবার ধারণার মধ্যে এরূপ পার্থক্য হয় কেন? অর্থাৎ একদিকে মা-বাবা মনে করছেন যে তাঁরা যথেষ্ট ভালবাসা দিচ্ছেন, অপর দিকে শিশু মনে করছে যে সে ভালবাসা পাচ্ছে না। একটা অভাব বোধ সব সময়ই তাকে পীড়িত করে। কেন এরূপ হয়? দ্বিতীয়তঃ মা-বাবার ভালবাসার অভাব শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যে কিভাবে ও কি ধরনের হানি ঘটায়? তৃতীয়তঃ মা অথবা বাবার ভালবাসা, কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ? শিশুর জীবনে কার প্রভাব কতটুকু?

আমরা দেখেছি যে মা-বাবার ভালবাসা পাওয়া সম্বন্ধে শিশুর

ধারণা তার মানসিক স্বাস্থ্য নির্ধারণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো মা-বাবারা যথেষ্ট ভালবাসা দিচ্ছেন, একথা মনে করলেও শিশুরা অনেক সময় তার বিপরীত ধারণা পোষণ করে কেন? পূর্বের আলোচনায় এমন কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছিল যার মধ্যে দেখা যায় যে কেবলমাত্র মা-বাবার সান্নিধ্যের মধ্যেই শিশুর পক্ষে তাদের ভালবাসা পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই। অতি আধুনিক কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে, "......the physical presence of a parent or a foster parent does not gurantee emotional satisfaction to the child, especially if that parent is unable to tolerate any disturbance in behaviour on the part of the child': (Dane G. Praugh & Robert G. Harlow) অনেক সময় এরূপও দেখা গেছে যে শিশুর মানসিক সুস্থতার জন্যই শিশুকে তার বাড়ীতে মা-বাবার কাছে না রেখে কোনও বোর্ডিং-এ রাখাই শ্রেয় বলে বিবেচিত হয়েছে। মা-বাবার সান্নিধ্যে থেকেও শিশু তাদের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হতে পারে। এরূপ অবস্থাকে বলা যেতে পারে মা-বাবা ও শিশুর মধ্যে ভালবাসার সম্পর্কে বিকৃতির পরিস্থিতি (distortion in the affectional relationship)। এই পরিস্থিতির উদ্ভব নানা ভাবে হতে পারে। যেমন, মা-বাবা যদি শিশুর প্রতি সব সময় একটা অত্যধিক 'দূর ছাই' গোছের ভাব পোষণ করেন; শিশুকে যদি প্রায়ই বকা-ঝকা ও মার-ধরের সাহায্যে পীড়ন করেন; এবং শিশুর প্রতি তাদের মনোভাব যদি প্রায়শঃই বিরক্তি ও ভালবাসার মধ্যে দোদুল্যমান থাকে, তাহলে শিশুর মনে সহজেই বঞ্চনার বোধ জাগতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই বিকৃত ভালবাসার পরিস্থিতির বীজ প্রধানতঃ মা-বাবার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিহিত। মা-বাবার এরূপ ব্যবহারের ফলে মা-বাবা সম্বন্ধে শিশুর মনে একটা বিকৃত

ও অস্পষ্ট ধারণা দেখা দিতে থাকে। এই ভাবে মা-বাবা ও শিশুর মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাকে আমরা বিকৃত এবং অসম্পূর্ণ বলতে পারি।

এবারে দেখা যাক এই বিকৃত এবং অসম্পূর্ণ সম্পর্ক কত রকম ভাবে দেখা দিতে পারে। প্রথমে, মা-বাবা শিশুকে নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মূল্য বোধ চরিতার্থের মাধ্যম হিসাবে মনে করতে পারেন। সন্তানের যে একটা নিজস্ব সত্বা আছে, একথা তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন না। সন্তানের ইচ্ছা, ক্ষমতা ও সুখ যে আলাদা রকমের হতে পারে তা তারা বুঝতেই চান না।

ঘটনা নং ৭। পিন্টু পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। মা-বাবার ইচ্ছা পিন্টু ক্লাশে প্রথম হবে। পিন্টুর মাসিমার ছেলে গত বছর বার্ষিক পরীক্ষায় ক্লাশে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল। তাই মা-বাবা পিন্টুর মনে এই প্রথম হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপিত রাখতে ব্যস্ত। পিন্টু মোটামুটি বুদ্ধিমান ছেলে। কিন্তু ওর মা তার বন্ধুদের কাছে গল্প করেন পিন্টু পড়াশুনায় খুব ভাল, ওর খুব বুদ্ধি, কাজেই ও বার্ষিক পরীক্ষায় অবশ্যই প্রথম হবে। এই সব গল্পের মধ্য দিয়ে তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। নিজের মূল্যকে আরও বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করেন। পিন্টুর সামনেই এসব কথাবার্তা হয়। মা-বাবা ওকে বলেছেন এবার প্রথম হলে ঘড়ি কিনে দেবেন। এই ভাবে পিন্টুর পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে এক কল্পনার সৌধ গড়ে উঠতে থাকে। এদিকে পরীক্ষা যতই সন্নিকটবর্তী হয় পিন্টু যেন কিরকম হয়ে ওঠে। পরীক্ষায় মা-বাবার আকাঙ্ক্ষিত ফল সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। পরীক্ষা সম্বন্ধে ভয় বাড়তে থাকে। খাওয়া-দাওয়া, আনন্দ-ফূর্তি কমে যায়। পরীক্ষার কয়েক দিন আগে হঠাৎ গা বমি-বমি ভাব দেখা দেয়। শরীর খারাপ হয়ে যায়। একদিন দেখা গেল ওর সারা গায়ে ফুসকুড়ি (rash) বেরিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ওর পরীক্ষা দেওয়া হলো না।

ঘটনা নং ৮। অনুরূপ আর একটি ঘটনা। মিণ্টু ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। ওর সম্বন্ধে মা-বাবার খুব উঁচু ধারণা। ওর বুদ্ধি, ওর মেধা সম্বন্ধে তাঁরা সর্বত্রই গল্প করে বেড়ান। ওর বুদ্ধি, ওর মেধা, ওর পরীক্ষার ফল প্রভৃতি সব কিছুর পিছনে যে তাঁদের যত্ন, চেষ্টা ও সতর্ক দৃষ্টি কাজ করছে, একথা বলতে তাঁরা কখনও ভোলেন না। এর মধ্যে তাঁরা একটা সুখ অনুভব করেন। তাঁদের এই উচ্চ মধ্যবিত্ত সচ্ছল লেখা-পড়া জানা ঘরে এরকম ছেলে না হলে কি মানায়? তাঁদের কৃতিত্ব যে তাঁরা ছেলেকে এভাবে গড়ে তুলতে পেরেছেন। তাকে পড়াশুনায় আরও উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হলে সাইকেল কিনে দেওয়া হবে। পরীক্ষার শেষে মিণ্টুও পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে মা-বাবার মনোমত কথা-বার্তা বলতে থাকে। পরীক্ষার ফল বের হলে বাড়ীতে এসে বলে যে সে প্রথম হয়েছে। মা-বাবা স্কুলের রিপোর্ট বই দেখতে চাইলে মিণ্টু তাঁদের বলে যে রিপোর্ট বই দেওয়া হয়নি। কারণ ছাপাখানায় গোলমালের জন্য রিপোর্ট বই সময় মত স্কুলে এসে পৌঁছায়নি। কাজেই ফল মুখে ঘোষণা করা হয়েছে। মা-বাবারও বোধ হয় নিজেদের কামনাপূর্তির ব্যগ্রতায় সমস্ত বোধশক্তি অবলুপ্ত হয়েছিল। মিণ্টুর কথায় সন্দেহ করেননি; অথবা সন্দেহকে অবদমন করেছেন। মিণ্টুর সাইকেল এল। কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও ওর মনে কোন আনন্দ নেই। ও সব সময়ই একটা অস্বস্তি বোধ করে। এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। অবশেষে বড়দিনের ছুটির পর যখন স্কুল খুললো তখন আস্তে আস্তে সকল রহস্যের উদ্ঘাটন হলো।

এই দু'টি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে মা-বাবা সন্তানকে নিজেদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থের মাধ্যম হিসাবে দেখেছেন। সন্তানের পরীক্ষার ফলের সাথে তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও মূল্য ওতপ্রোত ভাবে মিশে আছে। সন্তানের প্রয়োজন, তার ক্ষমতা এখানে গৌণ।

তাই সন্তানের উপর অনবরত চাপ এসে পড়েছে। আর এই চাপের ফলে সন্তান তার মা-বাবার ভালবাসা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারছে না। সব সময় ভালবাসা হারাবার ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত। সে মনে করে যে মা-বাবার আকাঙ্ক্ষা পূরণের মধ্যেই তার মূল্য। তা না হলে সে পরিত্যাজ্য। ফলে এই মূল্য বজায় রাখার জন্য সে কখনও আশ্রয় নিচ্ছে রোগের, কখনও বা নানা মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার। ফলে তার আবেগ-জীবনে নেমে আসে নানা বিপর্যয়।

"....the child is not viewed as an individual with integrity in his own right, but rather, in some way, as a being responding to the needs, and feelings of the parent, with the result that his emotional needs are not met adequately." (Dang G. Paugh & Robert G. Harlow) দুঃখের বিষয় এরূপ পরিস্থিতির পরেও তাঁদের বলতে শোনা গেছে, "ছেলের জন্য এত করলাম, দিনরাত ওর কথাই ভাবি, শেষ পর্যন্ত কিনা এই হলো? ও আমাদের সর্বনাশ করেছে। এমন ছেলেকে দূর করে দেওয়া দরকার।" অবশেষে তাঁরা এই মনে করে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করেন যে পাড়ার ছেলেদের দলে পড়েই ছেলে এমনি হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাবা অথবা মা তাঁদের নিজেদের ধ্যান-ধারণাকে এত বড় করে দেখেন যে সন্তানকেও তাঁরা সেই ধ্যান-ধারণার একটা অংশ বলে মনে করেন। যেমন—ঘটনা নং ৯। দীপু সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। বাবা সাধারণ চাকরী করেন। মাও চাকরী করেন। ফলে দীপু শৈশব থেকেই পিসি ও দিদির কাছে বড় হতে থাকে। মা সংসার ও চাকরী নিয়ে ব্যস্ত। বাবা ততোধিক ব্যস্ত তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে। তিনি দীপুকে সেই মতাদর্শে গড়ে তুলতে চান। তিনি কল্পনা করেন যে দীপু একদিন এই আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ করবে। তিনি যা পারেননি দীপু তাই পারবে।

বাবা তাঁর অবসর সময়ে দলের কাজে ব্যস্ত। বাড়ীতেই দলের সভা হয়, রাজনৈতিক ক্লাস হয়। দীপুর যখন বারো তেরো বছর বয়স হয় তখন তিনি ওকে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কাজের মধ্যে নিয়ে আসতে আরম্ভ করেন। দীপুর ভাল লাগে না। ওর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বাবা ওকে যে সকল দায়িত্ব দেন ও তা পালন করে না। বাবার কাছে মিথ্যা কথা বলে। একদিন মিথ্যা ধরা পড়ায় বাবা দীপুকে প্রচণ্ড প্রহার করেন। কারণ আদর্শ নিয়ে ছেলেখেলা! এ সহ্য করা যায় না। দীপুর মন আরও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ওর ব্যবহারে নানা অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। একদিন কথায় কথায় দীপু অভিযোগ করেছিল যে ও কোন দিন ওর বাবার ভালবাসা পায়নি। বাবা তাঁর দলের ছেলেদের বেশি ভালবাসেন।

তৃতীয়তঃ অনেক সময় দেখা গেছে যে মা-বাবারা তাঁদের সন্তানকে সব ব্যাপারেই তাঁদের উপর নির্ভরশীল করে রাখতে চান। শিশু বড় হয়ে আত্ম-নির্ভর হবে, এ অবস্থাকে তাঁরা ভয় পান। সন্তানকে তাঁরা স্বাধীনতা দিতে ভয় পান, পাছে ওরা কখন কি করে বসে। পাছে সন্তান হাতছাড়া হয়ে যায়, এই তাঁদের ভয়। প্রচণ্ড আগলে থাকার মনোবৃত্তি (Possessiveness) থেকেই এরূপ ব্যবহার তাঁরা করে থাকেন। তাই সন্তানকে তাঁরা সব সময় অক্ষম অপটু ভাবতে ভালবাসেন।

ঘটনা নং ১০। মিঠু এখন দশম শ্রেণীতে পড়ে। তার দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ব্যাপারেই মা সর্বদা হস্তক্ষেপ করেন, পাছে মিঠু কিছু ভুল করে ফেলে। কখন কি শাড়ী পরবে, কি ভাবে চুল বাঁধবে, কখন কি খাবে, কিভাবে ফোনে কথা বলবে, কতটা সময় পড়বে, কোন্ কোন্ বন্ধুর সাথে মেলামেশা করবে, সব ব্যাপারেই তাঁর সজাগ দৃষ্টি। তিনি মিঠুকে মনের মত করে গড়ে তুলতে চান। তিনি ওকে স্নান করিয়ে দেন; শাড়ী পরতে সাহায্য করেন; স্কুলে যাবার আগে নিজের হাতে খাইয়ে দেন, পাছে ওর গলায় মাছের কাঁটা আটকে যায়। শিশুকাল থেকেই মিঠু এভাবে মানুষ হয়ে আসছে। মায়ের

আত্মপ্রসাদ, তাঁর মত এমন করে ভালবাসতে কেউ পারবে না। একদিন তিনি রাগ করে বলেও ফেলেছিলেন মিঠুকে, "পড়তিস্ অন্য মায়ের পাল্লায়, বুঝতিস্ মজাটা।"

এখন আর মিঠুর এসব ভাল লাগে না। সে একটু স্বাধীন হতে চায়। একদিন অবস্থা চরমে ওঠে। স্কুলে যাবার আগে মা ভাতের থালা হাতে করে মিঠুর পিছনে পিছনে ঘুরে ঘুরে ওর মুখে ভাত গুঁজে দিচ্ছেন। কিছু ভাত খাওয়া হয়ে যাবার পর দুধের গ্লাস ওর মুখের কাছে ধরেছেন, ও খেতে চাইছে না। কিন্তু ওকে খেতে হবে, নইলে ওর শরীর খারাপ হবে। তখন দু'জনেই ড্রইং রুমে। হঠাৎ মিঠু উত্তেজিত হয়ে ধাক্কা দিয়ে গ্লাসের দুধ ফেলে দিল। স্কুলে যাবার পূর্ব মুহূর্তে অভূতপূর্ব দৃশ্য। মা কেঁদে আকুল, "এত করি তোর জন্য, আর এই তোর প্রতিদান।" সেদিন আর মিঠুর স্কুলে যাওয়া হলো না।

চতুর্থতঃ দেখা গেছে যে মা অথবা বাবা যদি অসুস্থ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বা মানসিক-রোগগ্রস্ত হন, তাহলে তাঁরা শিশুর সাথে প্রয়োজনীয় আবেগময় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন না। এরূপ ক্ষেত্রে শিশুর মনে বঞ্চনার বোধ আনা স্বাভাবিক।

পঞ্চমতঃ আজকাল শহরাঞ্চলে অনেক পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই চাকরী করেন। অনেক সময় নিতান্ত বাঁচার প্রয়োজনেই দু'জনকে চাকরী করতে হয়; আবার অনেক সময় কেবলমাত্র সচ্ছলতা বজায় রাখার জন্য অনেকে এরূপ করে থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে যদি একান্নবর্তী পরিবার না হয় তাহলে শিশু অবহেলিত হতে বাধ্য। কারণ শিশুকে আত্মীয় অথবা কোনও অনাত্মীয় ব্যক্তির কাছে থাকতে হয়। কাজেই মা-বাবা যতই মনে করুন যে তাঁরা সন্তানের জন্য এত করছেন, এত কষ্ট করে চাকরী করে সচ্ছলতার মধ্যে তাকে মানুষ করছেন, সন্তান কিন্তু বঞ্চনার হাত থেকে রেহাই পায় না।

ষষ্ঠতঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক ও বোঝাপড়ার স্বরূপ সন্তানের ভালবাসা পাওয়ার বোধকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। মা ও বাবা উভয়ই হয়ত সন্তানকে যথেষ্ট ভালবাসেন; কিন্তু এই ভালবাসা নিয়ে দু'জনের মধ্যে একটা অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা সমস্ত পরিবেশকে আরও অস্বাস্থ্যকর করে তোলে। সংসারের ছোট-খাট ব্যাপার নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব এবং মতবিরোধ ও ঝগড়া সন্তানের মনকে বিশেষ ভাবে নাড়া দেয়। স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান এ যেন ত্রিভুজের তিনটি কোণ। এই তিনটি কোণের প্রত্যেকটি থেকেই প্রত্যেকটির দিকে সুসমঞ্জসভাবে আবেগের প্রবাহ থাকা দরকার। তাই এই ত্রিভুজাকৃতি সম্পর্কটিকে বিশেষ ভাবে একটি সমবাহু ত্রিভুজের সাথেই তুলনা করা চলে। অর্থাৎ একটি সুসমঞ্জস অবস্থা। আবেগের বাহুগুলি পরস্পরের প্রতি সামঞ্জস্যপূর্ণ। একটি অহেতুক দীর্ঘ, একটি অহেতুক হ্রস্ব নয়। ফলে এই সুসমঞ্জস আবেগের বাহু দ্বারা যে এক একটি সম্পর্কের কোণ তৈরি হয়েছে তাও পরস্পরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। অর্থাৎ পরিবারে যদি সুসমঞ্জস আবেগের আবহাওয়া না থাকে, তাহলে শিশুর ভালবাসা পাওয়ার বোধে হানি ঘটতে পারে।

এতক্ষণ যে সকল পরিস্থিতির আলোচনা করা হ'লো তাতে দেখা যায় যে সন্তানদের ধারণাই ঠিক, তাদের মনে বঞ্চনার বোধ জাগরিত হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে শিশুর প্রয়োজন, তার ভাল লাগা, তার মঙ্গল মুখ্য নয়। ভালবাসার পিছনে মা-বাবার কামনা, প্রয়োজনবোধ, আকাঙ্ক্ষা ও অক্ষমতাবোধ গোপনে কাজ করে চলেছে। ভালবাসা এসকল ক্ষেত্রে শিশুকেন্দ্রিক নয়, আত্মকেন্দ্রিক। মা বাবার এরূপ ভালবাসাকে আমরা আত্ম-প্রেম (Self-love) সঞ্জাত এবং স্বকামজ (Narcissistic) বলতে পারি। কাজেই এরূপ ভালবাসায় কখনওই শিশুর প্রয়োজন মিটতে পারে না। তার মানসিক প্রয়োজন তো দূরের কথা, তার জৈবিক

প্রয়োজন সেটাই অনেক সময় কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। বর্ত্তমান আলোচনায় যে সকল ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে মা-বাবার সাথে শিশুর বিকৃত সম্পর্ক বা অসম্পূর্ণ সম্পর্কের উদাহরণই প্রকাশ পাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এ এক রকমের বঞ্চনা। একে আমরা ছদ্মবেশী বঞ্চনা বলতে পারি। আপাতঃদৃষ্টিতে একে ভালবাসা মনে হতে পারে। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে বঞ্চনা ভালবাসার ছদ্মবেশ ধারণ করে আসে, ভালবাসার মুখোশ ধারণ করে সকলকে ছলনা করার চেষ্টা করে। (একে কোন কোন মনো-বিজ্ঞানী Masked deprivation বলেছেন।) কিন্তু এ ছলনা শিশুর অনুভূতিতে ধরা পড়বেই। তাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে মা-বাবার সান্নিধ্যই বড় কথা নয়। মা-বাবার সাথে শিশুর উপযুক্ত আবেগময় সম্পর্ক বিশেষভাবে প্রয়োজন। পরিবারের মধ্যে একটি যথাযথ আবেগময় আবহাওয়া (emotional climate) শিশুর সুস্থ আবেগ জীবনের বিকাশের জন্য একান্ত দরকার। কিন্তু এই আবেগময় সম্পর্কের পূর্ণ বিকাশের জন্য সান্নিধ্য একটি পূর্ব-সর্ত।

এখন দেখা যাক মা-বাবার ভালবাসার অভাব শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যে কিভাবে হানি ঘটায়। "The child's bodily contacts with his mother and others who care for him, when counted one by one, run into tens of thousands. The contacts are significant from a psychological point of view. To pick up an infant, to hold him in one's arms, to feed him, bathe him, and play with him mean far more than just physical manipulations. In such event of this sort there is a communication between the adult and the child. It is largely through activities in which there is physical contact that the young child

enters into interpersonal relationships with others, and from these he obtains nurture for his psychological development, much as the nourishment he gets through his mouth provides food for his physical growth." (Jersild, 1957). প্রথমে মায়ের এবং পরে মা-বাবা উভয়ের শারীরিক নৈকট্যের মধ্য দিয়েই শিশু তাদের ভালবাসার উত্তাপ অনুভব করে এবং এভাবেই শিশুর মনে আবেগ-অনুভূতি প্রবাহিত হতে শুরু করে। এই নৈকট্যের রকম-ফেরের মধ্য দিয়েই শিশু তার নিজের সম্বন্ধে একটা স্বীকৃতি অথবা প্রত্যাখ্যান অনুভব করতে পারে। এর মধ্য দিয়েই শিশু তার নিজের সম্বন্ধে একটা ভাব-মূর্তি গড়ে তুলতে থাকে। শিশু জন্মাবার পরমুহূর্ত থেকে মায়ের সাথে তার শারীরিক সংস্পর্শের মধ্য দিয়ে (কিছু পরিমাণে বাবার সাথেও) তার প্রত্যক্ষ অনুভূতির 'জগৎ', যেমন ভাল লাগা, মন্দ লাগা, আরাম-বেদনা, গড়ে উঠতে থাকে। সে ক্ষুধার্ত হয়, মা তার ক্ষুধার অবসান ঘটান। সে বিছানা ভিজিয়ে থাকে, বা হয়ত কোন অস্বস্তিকর ভঙ্গীতে শুয়ে থাকে, নিজের শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় আরামজনক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না; মা তখন তার অস্বস্তির অবসান ঘটান। খাওয়া, ঘুমনো, স্নান, পায়খানা, প্রস্রাব করা প্রভৃতি প্রতিটি কাজের মধ্যেই সে মায়ের স্পর্শ অনুভব করে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরামবোধ করে। কিন্তু মায়ের অথবা মাতৃস্থানীয়া ব্যক্তির সময়মত নজরের অভাবে শিশুর এই সকল প্রক্রিয়ায় যদি ব্যাঘাত ঘটে তাহলে তার মনে বিরূপবোধ জাগতে থাকে। শিশুর জীবনে এই সকল প্রত্যক্ষ অনুভূতিই তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্বের মূল উপাদান হিসাবে কাজ করে। এর উপর ভিত্তি করেই তার বাইরের জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। ভাষা শেখার অনেক আগে থেকেই শিশুর মনে এই বস্তু জগতের ধারণা (idea) সমূহ সৃষ্টি হতে থাকে এবং এই সকল ধারণাই তার ভাষার মূল উপাদান রূপে কাজ করতে

থাকে। কাজেই প্রাক্-ভাষার স্তরের এই ধারণা সমূহে যদি অসামঞ্জস্য থাকে তাহলে তা শিশুর ভাষার ক্ষমতাকেও খর্ব করতে পারে। এই ধারণাগুলি গড়ে উঠতে থাকে তার জীবনের প্রাথমিক প্রত্যক্ষ অনুভূতি (perception) ও অভিজ্ঞতার উপর। শিশুর আবেগজীবনের প্রভাব এর উপর অসামান্য। শিশুর নার্ভতন্ত্র পরিপক্ক থাকে না। ফলে এই সময়কার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাগুলি তার নার্ভতন্ত্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি শরীর-সংগঠনের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। শারীরবৃত্তের দিক থেকে নানা গবেষণায় দেখা গেছে (Hunt এবং Hebb-এর গবেষণা) যে শিশুর গুরুমস্তিষ্কের (cerebrum) উপর অতি শৈশবের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাগুলি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই জন্যই শৈশবের বেদনাদায়ক ও সুখদায়ক উদ্দীপকগুলি (stimuli) শিশুর ব্যক্তিত্ব-গঠনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজ করে। গবেষণায় এও দেখা গেছে যে শিশুর নার্ভতন্ত্র যখন কিছু কিছু উদ্দীপক গ্রহণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে থাকে, অর্থাৎ শিশুর ছয় মাস বয়স থেকে, তখনই উদ্দীপকগুলির প্রভাব শিশুর উপর বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। শিশু-প্রতিপালনের জন্য মায়ের ও বাবার বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপই এই উদ্দীপকের কাজ করে। এই উদ্দীপক সমূহের মাধ্যমেই শিশুর সাথে জগতের পরিচয় ঘটে। মা-বাবার ভালবাসার সাথে সুসমঞ্জস উদ্দীপকসমূহের একটা নিবিড় যোগাযোগ অনুমান করাই যুক্তিযুক্ত। R. A. Spitz এবং W. Goldfarb-এর গবেষণায়ও শিশুর প্রাথমিক জীবনে মায়ের উপযুক্ত সংস্পর্শের অভাবের হানিকর প্রভাবের সমর্থন রয়েছে। Spitz এই হানিকর প্রভাবকে "anaclitic depression" (অর্থাৎ অন্য কোন বৃত্তি অচরিতার্থতাসঞ্জাত বিমর্ষতা বা অপর নির্ভরশীল বিমর্ষতা) নাম দিয়েছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ভালবাসায় বঞ্চনার ফলে শিশুর শরীর-মনের বিকাশের ক্ষেত্রে নানারূপ হানিকর প্রভাব দেখা দিতে পারে। এই প্রসঙ্গে J. Bowlby-র নাম স্মরণ করা দরকার।

১৯৫১ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত পুস্তিকা Maternal care and Mental Health-এ তাঁর গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। এই পুস্তিকাটিই ভালবাসায় বঞ্চনার ফলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যে হানির সমস্যাটির দিকে সকলের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে। W.H.O. নামে আন্তর্জাতিক সংস্থা এই সমস্যার দিকে দৃষ্টি দেয়। Bowlby এই পুস্তিকাটিতে লিখেছেন, "Prolonged breaks (in the mother-child relationship) during the first three years of life leave a characteristic impression on the child's personality. Clinically such children appear emotionally withdrawn and isolated They fail to develop libidinal ties with other children or with adults and consequently have no friends worth the name". এই উক্তি থেকে দেখা যায় যে বঞ্চনার ফলে শিশু বাইরের জগতের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ মা-বাবার সাথে যেখানে যথাযথ সম্পর্ক বাধাপ্রাপ্ত, সেখানে পাত্র-সম্পর্কের (object relationship) ক্ষমতাও ব্যাহত। মা-বাবার ভালবাসা ও সংস্পর্শের মধ্য দিয়ে শিশু মা-বাবা সম্পর্কে একটা ধারণা করে ফেলে। এই ধারণার রকম-ফেরের উপরই পরবর্তীকালের অন্যান্য মানুষ সম্পর্কে ধারণাগুলি নির্ভর করে। এই প্রক্রিয়াটি শিশুর ছয় মাস বয়স থেকে তিন বছর বয়স পর্যন্ত অল্প-বিস্তর চলতে থাকে। কাজেই এই সময় ভালবাসার ক্ষেত্রে অবহেলা বিশেষ হানিকর। ভালবাসায় বঞ্চনার জন্য পাত্র-সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সম্বন্ধে গবেষণার প্রসঙ্গে Anna Freud এবং S. Lebovici-র (প্রাক্তন সভাপতি, আন্তর্জাতিক মনঃসমীক্ষা সমিতি) নামও উল্লেখযোগ্য।

শিশু যখন আর একটু বড় হয় এবং এই সময় সে যদি ভালবাসায় বঞ্চিত হয় তাহলে সে তার ভালবাসার চাহিদাকেই

ভুলে যেতে চায়। ভালবাসা চেয়ে না পাওয়ার হতাশাজনক পরিস্থিতিকে সে এড়িয়ে চলতে চায়। ফলে সে ভালবাসা পাওয়ার ইচ্ছাকেই দমন করে। সে বলে, "আমি কারুর ভালবাসা চাই না।" এইভাবে তার অন্তরে এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। একদিকে পাওয়ার ইচ্ছা, আর একদিকে সেই ইচ্ছাকে দমন। এই দ্বন্দ্ব থেকে তার নানা মানসিক রোগ দেখা দিতে পারে। এরূপভাবে নানা অসুস্থতার মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে মা-বাবার ভালবাসা আকর্ষণ করার একটা প্রবণতাও দেখা দিতে পারে। হিস্টিরিয়া রোগের কোন কোন অবস্থার মধ্যে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। ভালবাসায় বঞ্চিত হয়ে শিশুর মধ্যে নানা প্রকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও প্রকাশিত হতে দেখা যায়, যেমন হীনমন্যতাবোধ, সব সময় বিরক্তিভাব, উন্নাসিকতা, সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার প্রবণতাও দেখা যায়। আবেশিক উদ্বায়ু (obsessional neurosis) রোগের রোগীদের মধ্যে যে অনেক সময় অত্যধিক আক্রম বোধ (exaggerated aggression) অত্যধিক ঈর্ষা, অত্যধিক ঘৃণা ইত্যাদি দেখা যায় তার পিছনেও অনেক সময় রোগীর শিশু বয়সে ভালবাসা পাওয়ার বোধে অভাবের অবদান দেখা গেছে। কোন শিশু যদি প্রথমে প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক ভালবাসা পায়, এবং পরে যদি সে তার থেকে বঞ্চিত হয় (যা বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়; যেমন, মা-বাবার দ্বিতীয় সন্তান জন্মাবার পর প্রথম শিশুর প্রতিক্রিয়া) তাহলে তার মধ্যে একটা অত্যধিক ঘ্যানঘ্যানানি ও বিরক্তিবোধের প্রকাশ দেখা যায়। শিশুর জীবনে মা-বাবার ভালবাসায় আস্থাবোধ তার নিরাপত্তা-বোধের জন্য একান্ত দরকার। এই আস্থার অভাব হলেই শিশুর মনে হতাশা ও নিরাপত্তাহীনতার বোধ দেখা দিতে থাকে, এবং ফলে তার মনে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে থাকে।

মানবেতর প্রাণীর শৈশবকাল খুবই সংকীর্ণ। প্রাণীধারার নিম্ন ধাপ থেকে যতই উচ্চ ধাপের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় ততই দেখা

যায় যে শৈশবকাল ক্রমেই দীর্ঘতর হচ্ছে। মানবশিশুর শৈশবকাল দীর্ঘতম। "এই দীর্ঘতম শৈশবকাল ও পর-নির্ভরতা পরস্পর সম্বন্ধিত। পতঙ্গ-শিশুর চাইতে মানবশিশু যে কত অসহায় তা আমরা এই দুই শ্রেণীর জীবনধারা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারি।······নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীদের প্রকৃতপক্ষে শৈশবকাল বলতে কিছুই নেই, অথবা শৈশবকাল খুবই সংকীর্ণ। পতঙ্গ এবং অন্যান্য নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় যে তাদের জন্মের সাথে সাথে জীবনধারণের উপযোগী কতকগুলি ক্ষমতা থাকে। যেমন, আহার সংগ্রহের ক্ষমতা। কিন্তু এই ক্ষমতাগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রতিবর্তকের (reflex) মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই নির্দ্দিষ্ট প্রতিবর্তকগুলির সাহায্যেই তাদের জীবন-ধারণের প্রয়োজনসমূহ মেটে। বাইরের পরিবেশে কিছুমাত্র তারতম্য ঘটলেই এই প্রতিবর্তকগুলি আর সহায়তা করতে পারে না। এবং তারা নতুন পরিস্থিতি অনুযায়ী নতুন প্রতিবর্তক বা অন্য কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারে না। তখন তাদের ব্যাপক ধ্বংস অনিবার্য।"

"কিন্তু মানবশিশুর বেলায় জন্মের সাথে সাথে এরূপ স্থিরনির্দ্দিষ্ট প্রতিবর্তকের অস্তিত্ব খুবই কম। এমন কি বাইরের সাধারণ উদ্দীপকের ফলে (আত্মরক্ষার নিমিত্ত) চোখের পাতা পিট্‌পিট্ করার প্রতিবর্তক আয়ত্ত করতেও তার বেশ কিছুদিন কেটে যায়। কাজেই সে জীবনধারণের প্রয়োজনগুলির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণই পরনির্ভরশীল। এই কারণেই মানবশিশুর দীর্ঘদিন ধরে মা-বাবার সহজাত ভালবাসার মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে "

"মানবশিশুর ক্ষেত্রে একদিকে শরীর যন্ত্রে অপর্যাপ্ত স্থিরনির্দ্দিষ্ট প্রতিবর্তকের অভাব, অপর দিকে মা-বাবার ভালবাসার মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ব্যবস্থা,—এই অবস্থার মধ্যেই রয়েছে মানবজীবনের অফুরন্ত সুযোগ। এই অবস্থার মধ্যে থেকে মানবশিশু ধীরে ধীরে তার বিচিত্র পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য নানা রকমের প্রতিবেদন (response) আয়ত্ত করতে থাকে। বিভিন্ন

অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারে।······এর ফলে সে ধীরে ধীরে জীবনযুদ্ধে নিজেকে বেশি উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারে।········ ············

... ...

এই পরিবর্তনশীল জগতে প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে এরূপ নমনীয়তাই তো মানব জাতির জীবন সংগ্রামের প্রধান অবলম্বন। মানবশিশুর প্রতিবর্তকহীন অসহায় অবস্থা ও দীর্ঘায়ত শৈশবকা বিবর্তনের দিক থেকে মানবজাতির পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ। কিন্তু এও নিঃসর্ত নয়। অসহায় ও দীর্ঘায়ত শৈশবকালের সাথে যুক্ত রয়েছে মা-বাবার ভালবাসা ও পরিবারের নিরাপদ আশ্রয়। এই নিরাপত্তার মধ্যে থেকেই মানব-শিশু তার শৈশবকালে বিচিত্র পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যবিধানের বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ পায়। তাই যে অসহায় শৈশবকাল মানবজাতির পক্ষে প্রকৃতির আশীর্বাদস্বরূপ, তাই আবার অভিশাপে পরিণত হতে পারে যদি তার আনুষঙ্গিক সর্ত যথাযথভাবে পরিপূরণ না হয়। পরিবারের আশ্রয় ও মা-বাবার ভালবাসায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে মানবশিশুর অবস্থা অস্তিত্ব রক্ষার দিক থেকে পতঙ্গের চাইতেও নিকৃষ্টতর হয়ে দাঁড়ায়। তখন বিভিন্ন উদ্দীপকের প্রতি তার প্রতিবেদনগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা ও বিপর্যয় দেখা দেয়। কারণ প্রতিটি প্রতিবেদনই তখন নিরাপত্তাবোধের অভাব দ্বারা প্রভাবিত। এইভাবে সে অস্বাভাবিক প্রতিবেদনের উৎপাদন ঘটাতে থাকে এবং ক্রমে মানসিক-রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। "(লেখক ; চিত্ত, ১ম, ১৩৮০)। "Childhood is....at once the greatest achievement and the greatest risk of evolution : it carries with it the greatest potentialities of development, but also the greatest possibility of disaster." (Hadfield, 1952)।

আমাদের সামনে আর একটি প্রশ্ন রয়েছে যে শিশুর মানসিক-স্বাস্থ্য গঠনে মায়ের অবদান বেশি, না বাবার অবদান বেশি ? না উভয়ের অবদানই সমভাবে প্রয়োজন ? এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদের একটু পিছনের দিকে তাকান দরকার। অর্থাৎ সন্তানের প্রতি মা-বাবার ভালবাসা ও কর্তব্য-বোধের উদ্ভব কিভাবে হয়েছে সেটা একটু দেখা দরকার। মানুষ একটি সমাজবদ্ধ ও পরিবারবদ্ধ জীব। এবং পরিবারই (family) হ'ল সমাজের নিম্নতম একক। এই পরিবারের স্বরূপ ও সংগঠন বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকমের ছিল। কোন কোন নৃতত্ত্ববিদ্ বলে থাকেন যে মানুষ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার পূর্বপুরুষ মানবাকার (anthropoid) প্রাণীর (বনমানুষ) কাছ থেকেই এই পরিবার-বদ্ধতার জীবনবোধটি লাভ করেছে। এই বোধটি মনুষ্য পর্যায়ে এসে আরও দৃঢ় ও সুসংবদ্ধ হয়েছে। এবং রূপান্তরিত হয়ে, অর্থাৎ এই বোধটি কেবলমাত্র সহজ প্রবৃত্তির (instinct) আওতায় না থেকে সভ্যতা-সংস্কৃতির (culture) আওতায় এসে পড়েছে। যা ছিল কেবল মাত্র সহজাত প্রবৃত্তি তা সভ্যতার আওতায় এসে আরও সুসংবদ্ধ ও দৃঢ় হ'ল। এরূপ সংঘবদ্ধ জীবনধারার মধ্যে যখন একটি শিশুর জন্ম হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের অপর সকল ব্যক্তির জীবনে একটা পরিবর্তন দেখা দেয়, বিশেষ করে শিশুর মায়ের জীবনে সহজাত প্রবৃত্তি ও পরিবারবদ্ধ জীবনের আনুষঙ্গিক বোধ, কর্তব্য-চেতনা দ্বারা এই পরিবর্তন প্রভাবিত। গর্ভাবস্থা থেকেই ভাবী মায়ের জীবনে কতকগুলি পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। গর্ভাবস্থায় মায়ের কিছুটা শারীরিক অপটুতা ও পরনির্ভরশীলতা লক্ষ্য করা যায়। এর পর শিশু জন্মাবার পরে তার শরীরযন্ত্রে আরও কতকগুলি পরিবর্তন দেখা দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি নতুন প্রতিবেদনও দেখা যায়। শিশু ও মায়ের পরস্পরের প্রতি প্রতিবেদনসমূহ পরস্পরকে প্রভাবিত করতে থাকে। পরস্পরের প্রতিবেদনসমূহ পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত। মা সন্তানকে নিরীক্ষণ করে, আদর করে, দুধ পান করিয়ে সঞ্জীবিত

করে তোলে। সন্তানও এর প্রত্যুত্তরে যথাযথ প্রতিবেদন দেখায়। এ একেবারে প্রশ্নাতীত প্রবৃত্তিবেগ। কাজেই মা ও শিশুর সম্পর্ক একটা দৈহিক ও প্রবৃত্তিগত দিকের উপর প্রতিষ্ঠিত দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এ সম্পর্ক যতই দৈহিক ও প্রবৃত্তিগত হোক না কেন, প্রতিটি মনুষ্যসমাজে এ সম্পর্কের উপর সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাবও যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়; যেমন প্রতিটি সমাজেই গর্ভাবস্থা থেকে শিশু জন্মাবার পর পর্যন্ত মাকে নানা রকমের টাবু (taboo) মেনে চলতে হয়, নানা রকমের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চলতে হয়। কোথাও এসকল ধর্মীয়, কোথাও নীতিগত, কোথাও বা স্বাস্থ্যবিধি-সম্পর্কীয়। এর দ্বারাই বোঝা যায় যে মা ও শিশুর সম্পর্কের মধ্যে সভ্যতা-সংস্কৃতির হস্তক্ষেপও প্রবল। এই হস্তক্ষেপ দ্বারা এই সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করে তোলার উদ্দেশ্যই পরিপূর্ণ হয়। হস্তক্ষেপের মধ্যে শিশুর মঙ্গলবিধান এবং মায়ের মনকে শিশুর প্রতি একটা বিশেষ ভঙ্গীতে পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত করে তোলার উদ্দেশ্যও পরিলক্ষিত হয় এবং মায়ের প্রবৃত্তিসমূহকে আরও জোরদার করার চেষ্টা করা হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে শিশুর ও মায়ের সম্পর্কের ভিত্তি প্রবৃত্তিগত এবং সভ্যতা-সংস্কৃতিগত। এই সম্পর্কের যথাযথ রূপায়ণের মধ্যে শিশুর মঙ্গলময় বিকাশ বিধৃত। ভালবাসার সূত্রে উভয়ের সম্পর্ক গ্রথিত। কাজেই ভালবাসার বঞ্চনা শিশুর বিকাশে বাধা স্বরূপ।

মা ও শিশুর সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেমন, বাবা ও শিশুর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কি তেমন দৈহিক বা প্রবৃত্তিগত এবং সভ্যতা-সংস্কৃতিগত ভিত্তি পরিলক্ষিত হয়? পিতা ও সন্তানের সম্পর্কের মধ্যে সভ্যতা সংস্কৃতির প্রভাব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে কি কোনও সহজাত প্রবৃত্তি নেই? সভ্যতা সংস্কৃতির প্রভাব প্রাণীধারার যে স্তরে বিন্দুমাত্র নেই, অর্থাৎ মানবেতর উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে, সেখানে আমরা দেখতে পাই যে মা-প্রাণীটির গর্ভাবস্থা থেকে শুরু করে শাবক জন্মাবার পরও কিছুদিন পুরুষ প্রাণীটি সঙ্গী হিসাবে

থাকে। এই পুরুষ প্রাণীটিই তখন মা ও শিশুর আহার সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ, শিশুর শিক্ষা প্রভৃতির দায়িত্ব পালন করে থাকে। আসলে স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণীটির এই জোড় বাঁধা অবস্থা তাদের সঙ্গম কাল (mating period) থেকে শুরু হয়। এদিক থেকে পরস্পরের প্রতি যে কোমল আবেগ ও আকর্ষণ তার ভিত্তিস্বরূপ একটি দৈহিক বা প্রবৃত্তিগত দিক দেখতে পাওয়া যায়। সঙ্গিনীর প্রতি এই সহজাত আবেগধারাই কালক্রমে সন্তানের প্রতি বর্ষিত হয়। কাজেই পুরুষ ও সন্তানের সম্পর্কের মধ্যে পরোক্ষভাবে একটা সহজাত প্রবৃত্তিগত দিক রয়েছে যা এর ভিত্তিস্বরূপ। পুরুষ প্রাণীটি এই সহজাত আকর্ষণের ফলেই শিশু প্রাণীটিকে বিপদ থেকে রক্ষা করে, আহার সংগ্রহ করে দেয়, হাঁটা চলা, শিকার করা, ওড়া, আত্মরক্ষা করা শেখায় এবং আত্মনির্ভরশীল করে তোলে।

মনুষ্য সমাজেও দেখতে পাই যে পুরুষ তার সঙ্গিনীর সাথে থাকছে (বিবাহের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়)। গর্ভাবস্থায় তার দায়িত্ব গ্রহণ করে নিচ্ছে। সঙ্গিনীর সাহচর্যের মধ্য দিয়ে তার প্রতি তীব্র আকর্ষণ ও কোমল অনুভূতিধারা বিকশিত হতে থাকে। এই আকর্ষণ ও অনুভূতিধারাই সন্তানের প্রতি বর্ষিত হয়। "Once a man is made to remain with his wife to guard her pregnancy, to observe the various duties which he usually has to fulfill at birth, there can be not the slightest doubt that his response to the offspring is that of impulsive interest and tender attachment."

"It seems to me that the only factors which determine the sentimental attitude in the male parent are connected with the life led together with the mother during her pregnancy." (Melinowaski, 1953)। এরপর সামাজিক অনুশাসন, নীতিবোধ, নানা

প্রকার আচার অনুষ্ঠান ও টাবু এই অনুভূতিকে আরও সুসংবদ্ধ ও দৃঢ় করে তোলে। অর্থাৎ যা ছিল কেবলমাত্র প্রকৃতিদত্ত ও সহজাত, তাই সভ্যতা সংস্কৃতির আওতায় এসে আরও স্থিরনির্দ্দিষ্ট ও দৃঢ় হলো। এখনও এমন অনেক উপজাতি আছে যাদের মধ্যে মায়ের গর্ভাবস্থায় ও সন্তান জন্মের সময় বাবাকে নানা রকম আচার অনুষ্ঠান ও টাবু মেনে চলতে হয়। এমন কি বাবার মানসিক অবস্থার মধ্যে এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করা হয় যার ফলে গর্ভাবস্থার ও প্রসবক্ষণের সকল শারীরিক ও মানসিক উপলক্ষণগুলি সে অনুভব করতে থাকে। এরূপভাবে বাবা ও সন্তানের মধ্যে একটা শরীরগত ও প্রবৃত্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে। যাই হোক, এটা পরিষ্কার যে মায়ের সাথে সন্তানের একটা প্রত্যক্ষ শারীরিক সম্পর্ক এবং তার থেকে উৎপাদিত একটা প্রবৃত্তিগত সম্পর্কের অস্তিত্ব দেখতে পাই। উভয় ক্ষেত্রেই সভ্যতা-সংস্কৃতি এই সম্পর্ককে আরও দৃঢ়বদ্ধ করে তুলছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে মূল উপাদান হিসাবে কিছুটা সহজাত প্রবৃত্তি না থাকলে কেবল মাত্র সভ্যতা-সংস্কৃতির দ্বারা এমন একটা সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হতো না। সভ্যতা-সংস্কৃতি কেবল সংস্কারই করতে পারে, কিন্তু তার মূল উপাদান চাই।

উপরের আলোচনা থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে যুগ যুগ ধরে প্রবৃত্তি ও সভ্যতা মিলে-মিশে মা-বাবা ও সন্তানের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এই কারণেই মা, বাবা ও সন্তান এই তিন নিয়ে পরিবার। এর যে কোন একটিকে বাদ দিলে পরিবারের সম্পূর্ণতায় ত্রুটি থেকে গেল। পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই যেখানে এর একটিকে বাদ দিয়ে পরিবার তৈরি হয়েছে। মানুষের ইতিহাসে এমন কোন কালও পরিলক্ষিত হয় নি যখন একটিকে বাদ দিয়ে পরিবার তৈরি হয়েছিল। এর জন্যই মা, বাবা ও সন্তানের সম্পর্ক একটি সমবাহু ত্রিভুজের সাথে তুলনীয়। সকলেরই সমান

স্থান, সম উপযোগিতা। সন্তানের জীবনধারণ ও মানসিক বিকাশের জন্য মা ও বাবার, উভয়েরই সমান প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পুরুষ ও নারীর আত্মবিকাশ ও অনুভূতির উপলব্ধির জন্য শিশুর অস্তিত্বের প্রয়োজনও গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার এমনই একটি সংস্থা যেখানে পরস্পরের সহযোগিতায় পরস্পরের আত্মবিকাশ সম্ভব। অবশ্য পরিবারের রূপ কি রকম হবে তা অন্য কথা।

মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে শিশু কিছুটা বড় ও আত্মনির্ভরশীল হলেই মা, বাবা ও শিশুর একত্রে থাকার প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়। তাদের ভিতরের সম্পর্কের অবলুপ্তি ঘটে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে অন্যরূপ। মানুষ তখনও এই সম্পর্ককে অটুট রাখে। কারণ মানুষের অস্তিত্বের জন্য এটা প্রয়োজন। তার সামাজিক আত্মবিকাশের জন্য এটা প্রয়োজন। পরিবার নামক সংস্থার মধ্য দিয়েই এই কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই মানব পরিবার অটুট থাকে। এইভাবেই মানুষ তার পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করেছে।

শিশু জন্মাবার পর মুহূর্ত থেকেই তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মায়ের উপর নির্ভরশীল। এখানেই মায়ের ভালবাসার প্রয়োজন সমধিক। এই নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে মায়ের প্রতি শিশুর একটা আঁকড়ে থাকার মানসিক ভাব জন্মায়। শিশুর এই নির্ভরশীলতা (বুকের দুধ খাওয়া ইত্যাদি) অতিক্রান্ত হওয়ার পরও মায়ের প্রতি এই আসক্তি বজায় থাকে। কিন্তু এই আসক্তি তার সামাজিক বিকাশ ও আত্মবিকাশের পথে বাধাস্বরূপ। এই সময় মা ও বাবাকে শিশুকে একটি সামাজিক জীব হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তাদের নিজ নিজ অবদান নিয়ে এগিয়ে আসতে হয়। শিশুর পক্ষে যেখানে মা-বাবার শারীরিক প্রয়োজনীয়তার শেষ সেখানে সাংস্কৃতিক প্রয়োজনীয়তার শুরু। শিশুকে এই সময় শিখতে হয় কর্তৃপক্ষের কাছে নতি, শ্রদ্ধা ও বিনম্রতা। শৈশবে মা, বাবা ও ভাই-বোনের সাথে যোগাযোগের মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি যে আকর্ষণ ও আসক্তি জন্মায় তাকে পরিমার্জিত করতে হয়। এ কাজ

তার প্রকৃতিগত প্রবৃত্তির বিরোধী। অর্থাৎ এক কথায় তার সমস্ত কামশক্তি (libido) পরিমার্জিত ভাবে নতুন খাতে প্রবাহিত করার শিক্ষণ পেতে হয়। এই শিক্ষণের ক্ষেত্রে মা ও বাবার নিজ নিজ দায়িত্ব ও অবদান রয়েছে। যে ইডিপস সংস্থিতি (Oedipus situation) ও অজাচার ইচ্ছার (incest desire) জন্ম পরিবারের মধ্যে মা-বাবার সাহচর্যে, তার নিষ্পত্তিও হয় পরিবারের মধ্যে মা-বাবার সহায়তায়। এই কঠিন কাজ সম্পন্ন হয় মা-বাবার যথাযথ ভালবাসার পরিপূর্ণতার মধ্য দিয়ে। এর উপরই বহুলাংশে নির্ভর করছে শিশুর শৈশব কালের ও পরবর্তী কালের মানসিক সুস্থতা। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় শিশুর কাছে মা হয়ে আছে আদর, আবদার, কমনীয়তা প্রভৃতির প্রতীক ; আর বাবা হয়ে আছে ন্যায়-নীতি, শৃঙ্খলা, ক্ষমতা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির প্রতীক। এই দুইয়ের যথাযথ সমন্বয়ে পূর্ণতা।

মায়ের সাথে শিশুর সম্পর্ক জন্ম মুহূর্ত থেকে। শিশুর শারীরিক প্রয়োজনের মধ্য দিয়ে এই সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এইভাবে মায়ের প্রতি শিশুর ভালবাসার বিকাশ হয়। মায়ের সাথে শিশুর এইভাবে একটা চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্ক তৈরি হতে থাকে। এই চাওয়া আস্তে আস্তে বস্তুর সীমা ছাড়িয়ে নানা মানসিক বোধের সীমায় গিয়ে পৌঁছায়। সে মায়ের কাছ থেকে ভালবাসা, স্নেহ, প্রশংসা প্রভৃতি চাইতে থাকে। এই সকলের 'পাওয়ার' মধ্য দিয়ে মায়ের প্রতি তার ভালবাসা বাড়তে থাকে। কিন্তু বাস্তব কারণেই, শিশুর মঙ্গলের জন্যই, সকল চাওয়ার পরিপূর্তি মায়ের পক্ষে ঘটানো সম্ভব নয়। যখন এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তখনই শিশু ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। একটি স্বাভাবিক ও সুস্থ শিশুকে এই সময়ই শিখতে হবে তার নিজের ক্রোধ, ঘৃণা, কামনাকে সংযত করার কৌশল। এই শিক্ষণ কাজে মায়ের ভালবাসাই তার সহায়। মায়ের ভালবাসার জন্যই তাকে কামশক্তিকে সংযত করে ভবিষ্যৎ সুস্থ ব্যক্তিত্বের সোপান তৈরি

করতে হয়। শিশুর জীবনের এই দোদুল্যমান মুহূর্তে মায়ের যথাযথ ভালবাসা তাকে পথ চলতে সাহায্য করে। এই ভালবাসার ক্ষেত্রে ত্রুটি বা বঞ্চনা থাকলে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে বিপর্যয় দেখা দেবে।

শিশুর জীবনে বাবার প্রকৃত আবির্ভাব ঘটে কিছু পরে ; শিশুর জন্মের প্রথম বছরের শেষের দিকে। তার জীবনে বাবা আবির্ভূত হয় যেন শৌর্য-বীর্যের মূর্তি ধারণ করে। বাবাও যে তার বস্তু চাহিদা মেটাচ্ছে এটা সে বুঝতে আরম্ভ করে। তার মায়ের সমস্ত কর্ম-শক্তির পিছনে যে তার বাবার উপস্থিতি কাজ করছে এটা সে বুঝতে আরম্ভ করে। যে রথে চড়ে সে এই পার্থিব ভোগের পথে যাত্রা করেছে, তার যে দুটি চাকা, মা ও বাবা, এটা আস্তে আস্তে বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার উপলব্ধি হয়। কিন্তু বাবার সাথে এই পরিচয়ের মুহূর্তে শিশু আবার একটি ধাক্কা খায়। সে দেখে বাবা তার ভোগের অংশীদার। এমনকি মায়ের ভালবাসায়ও সে ভাগীদার। এবং সে তার অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী। কাজেই বাবা সম্পর্কে শিশুর মনে (বিশেষ করে ছেলে) একটা ভয়, ঈর্ষা, ক্রোধ, বিমোহিত ভাব দেখা দেয়। কাজেই বাবা শিশুর কাছে যেন একটু দূরের মানুষ থেকে যায়। এই দূরের মানুষকে কাছে করে নেওয়ার জন্যই শিশু মনশ্চিত্র প্রক্রিয়ার (phantasy activity) আশ্রয় নেয়। সে বাবার মত হতে চায়, তাকে অনুকরণ করে। এই সময় শিশুর জীবনে মায়ের থেকে বাবার অবদান বেশি। শিশুর সংযত সামাজিক বোধের বিকাশে বাবার অবদান অসামান্য। "What the mother does in this respect in minute-to-minute and day-to-day criticizing, praising and guiding, the father normally re-inforces by his very presence." (Burlingham & Freud, 1947). কামশক্তিকে দমন করে ঠিক পথে চলতে বাবা তাকে সাহায্য করে। এই জন্যই একটি পিতৃহীন, মানসিক দিক থেকে অসুস্থ কিশোর

বয়সের ছেলেকে বার বার বলতে শোনা গেছে, "আমার ছোটবেলা আমাকে শাসন করার কেউ ছিল না, আমাকে যা খুশি তাই করতে দেওয়া হয়েছে, আমাকে কেউ শাস্তি দেয়নি ; সেইজন্যই আমার আজ এই দশা !" ছেলে-শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রেই বোধ হয় বাবার অবদান বেশি। একদিকে বাবা যেমন তার সুখ উপভোগের সহায়ক, অপর দিকে সে বাধাস্বরূপ, বিশেষ করে মায়ের ভালবাসা পাওয়ার ব্যাপারে। এই উভয়বিধ পরিস্থিতি শিশুর মধ্যে বাবার প্রতি একদিকে একটা গোপন বিদ্রোহের ভাব জাগিয়ে তোলে অপর দিকে বাবাকে অনুকরণের মধ্য দিয়ে তার সাথে একাত্মানুভূতির (identification) সাহায্যে এই জটিল পরিস্থিতির একটা মীমাংসা করে মায়ের ভালবাসা পাওয়ার রাস্তাকে সুগম রাখে। কিন্তু সবটাই নির্ভর করে বাবার ভালবাসা পাওয়া এবং তার প্রতি বাবার যথাযথ ব্যবহারের উপর। এক্ষেত্রে ত্রুটি ঘটলে শিশুর ব্যবহারে সামঞ্জস্য-হীনতা দেখা দেবে। মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা মাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। বাবার ভালবাসা পাওয়ার ব্যাপারে মা তার অংশীদার হয়ে দেখা দেয়। আবার মা'ই তার প্রাত্যহিক সুখভোগ মেটাচ্ছে। কাজেই মায়ের প্রতি তার গোপন ঘৃণা ও ভালবাসা পাশাপাশি দেখা দেয়। কিন্তু সেও এই জটিল পরিস্থিতিতে ভার-সাম্যতা আনে মাকে অনুকরণের মধ্য দিয়ে তার সাথে একাত্মানুভূতির সাহায্যে। এও নির্ভর করে মায়ের ভালবাসা পাওয়ার বোধ ও শিশুর প্রতি তার যথাযথ ব্যবহারের উপর। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে একটি শিশুর পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশের জন্য মা ও বাবা উভয়েরই সমান অবদান রয়েছে। এখানে বেশি-কমের প্রশ্ন নেই ; কারণ যে কোনও একজনের অবদানের অভাবে শিশুর ব্যক্তিত্ব অপূর্ণ থেকে যাবে। আর এই অপূর্ণতাই স্বাস্থ্যহীনতা।

শিশুর সুস্থ ব্যক্তিত্ব-বিকাশে মা-বাবার ভালবাসা পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা হলো মাত্র। তবে

দেখা যাচ্ছে যে শিশুর সুস্থ ব্যক্তিত্ব নির্ধারণে মা-বাবার ভালবাসা কারণস্বরূপ বিরাজ করে। কাজেই শিশুদের প্রতি মা-বাবার সংযত আচরণ, তাদের প্রতি বয়স্কদের উপযুক্ত আচরণ সুস্থ সমাজ-গঠনের সহায়ক। মনে হয় সেই আদিম কাল থেকে মানুষের সমাজে মা-বাবা ও সন্তানের সম্পর্ক নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। তাই যুগে যুগে দেশে দেশে শিশু-পালনের বিচিত্র ধারা। আজ মনোবিজ্ঞানীদের ভাবার সময় এসেছে এই সম্পর্কের কোন্ রূপটি যথাযথই সকলের পক্ষে মঙ্গলকর এবং সেটি লাভের সহজতম উপায়ই বা কোন্‌টি।

শিশুর ক্রমবিকাশ

শ্রীমতী দীপালি বসু কর্তৃক সংকলিত

প্রায় চল্লিশ সপ্তাহ ধরে একটি জীব-কোষ মাতৃজঠরে থেকে মাতৃদেহরস আহরণ করে একটি শিশুতে পরিণত হয়। সদ্যোজাত শিশু একটি অসহায় জীব। কান্না এবং তারপর চোষার ক্ষমতার অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে তার জীবনের সাথে মোকাবিলা শুরু হয়। ধীরে ধীরে তার শরীর ও মনের বিকাশ ঘটতে থাকে ও নানা ক্ষমতার অভিব্যক্তি হয়। দেহে ও মনে একটি স্বাভাবিক সুস্থ শিশুর বিকাশ ধাপে ধাপে কিভাবে ঘটে, তা মনোবিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু। কারণ মনোবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে শিশুর পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত স্বাভাবিক বিকাশধারার উপরই তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্বের রূপ ও মানসিক স্বাস্থ্য বহুলাংশে নির্ভর করে। এই কারণেই স্বাভাবিক ও সুস্থ শিশুর বিকাশধারা সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই অবহিত হওয়া দরকার। নিচে এই বিকাশধারার একটি তালিকা দেওয়া হ'লো। এটি মনোরোগ চিকিৎসক Stella Chess লিখিত একটি প্রবন্ধে অন্তর্ভুক্ত স্বাভাবিক শিশুর আচরণের তালিকার (Land Marks of Behaviour Development) সংক্ষিপ্তসার। প্রবন্ধটি Comprehensive Text Book of Psychiatry (Editors—Freedman and Kaplan; 1967) নামক পুস্তকে প্রকাশিত।

মনে রাখতে হবে এই বিকাশ দেশ ও কাল ভেদে কিছুটা বিভিন্ন হতে দেখা গেছে। সামান্য তারতম্যকে অস্বাবিক ভাবা ঠিক নয়।

৪ সপ্তাহের নিচে বয়স ঃ—

চিত হয়ে শুয়ে হামাগুড়ির ভঙ্গিতে হাত-পা নাড়াচাড়া করতে পারে। উপুড় করে রাখলে মাথা এদিক-ওদিক নাড়াতে পারে। ঝুমঝুমি বা অনুরূপ কিছুর শব্দে সাড়া দেয়। গলা দিয়ে অল্প অল্প বৈশিষ্ট্যহীন আওয়াজ বের করে। কাঁদলে কোলে তুলে নিলে চুপ করে।

৪ সপ্তাহ বয়স ঃ—

হাত মুঠি করতে পারে। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য মাথা সোজা করে রাখতে পারে। গ্—গ্—গ্ ইত্যাদি ধ্বনি করে। কাছে কেউ এসে দাঁড়ালে বা ঝুঁকে পড়লে চুপ করে। কেউ কথা বললে লক্ষ্য করে।

১৬ সপ্তাহ বয়স ঃ—

ঘাড় শক্ত হয়। মাথা সোজা করে রাখতে পারে। উপুড় করে দিলে মাথা ৯০° অনুরূপ উঁচু করে তুলতে পারে। সামনে কোন জিনিস আস্তে আস্তে নড়াচড়া করলে তার প্রতি ভালভাবেই নজর রাখতে পারে। বিছানায় শুইয়ে দিয়ে উপরে ঝুমঝুমি জাতীয় কোন জিনিস ঝুলিয়ে দিলে তা হাত দিয়ে ধরবার চেষ্টা করে। খিলখিল করে হাসতে পারে। কিছু সময় ধরে উ—উ—উ, আ—আ—আ—, ইত্যাদি ধ্বনি করতে পারে। অন্য কারুর হাসিতে সাড়া দিতে পারে। অপরিচিত পরিস্থিতি ও পরিবেশ বুঝতে পারে।

২৮ সপ্তাহ বয়স ঃ—

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে হাতের উপর ভর রেখে বসতে পারে। দাঁড় করিয়ে ধরে রাখলে লাফাতে শুরু করে। হাত বাড়িয়ে খেলনা ধরে। ঝুমঝুমি ধরে ঝাঁকাতে চেষ্টা করে। কাঁদবার সময় ম্—ম্—ম্ ধ্বনি করে। পায়ের বুড়ো আঙুল মুখে দেয়। মুখের সামনে আয়না ধরলে তার উপর চাপড়াতে থাকে।

৪০ সপ্তাহ বয়স ঃ—

একা একা সহজভাবে বসে থাকতে পারে। হামাগুড়ি দেয়। কিছু ধরে নিজে নিজেই উঠে দাঁড়ায়। আঁকিবুঁকি দেবার মত হাতের ভঙ্গী করতে পারে। দ্দা—দ্দা—দ্দা শব্দ করতে পারে। নিজের নাম ধরে ডাকলে সাড়া দেয়। দুধের বোতল ধরে খেতে পারে। ওর সঙ্গে কেউ খেলা করলে তাতে যোগ দেয়।

৫২ সপ্তাহ বয়স ঃ—

অন্য কারুর হাত ধরে হাঁটতে পারে, অল্পক্ষণের জন্য দাঁড়াতে পারে। কিছু প্রকাশ করার জন্য অর্থহীন শব্দ করে। কেউ চাইলে নিজের খেলনা অন্যকে দেয়। জামা-কাপড় পরাবার সময় সহযোগিতা করে।

১৫ মাস বয়স ঃ—

টলতে টলতে হাঁটতে পারে। হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়ি উঠতে পারে। ৩—৫টা অর্থপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করতে পারে। বইয়ের কোন ছবি দেখালে তার উপর চাপড়াতে থাকে। নিজের চাহিদা প্রকাশ করে। খেলার ছলে বা অপছন্দ হলে জিনিসপত্র ছুঁড়ে মারে।

১৮ মাস বয়স ঃ—

ভালভাবেই হাঁটতে পারে। অন্যের হাত ধরে সিঁড়ি উঠতে পারে। বল ছুঁড়ে মারতে পারে। পেনসিল বা চক দিয়ে আঁকি-বুঁকি দেয়। নিজের নাম বলতে পারে। প্রায় ১০টা অর্থপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করতে পারে। ছবিতে পরিচিত জিনিস দেখাতে পারে। খুব সাধারণ নির্দেশ—যেমন, 'মাকে গ্লাসটা দাও' বা 'টেবিলের উপর বল রাখ,' ইত্যাদি—পালন করতে পারে। কিছু কিছু খাবার ফেলে—ছেড়ে নিজে খেতে পারে। নিজের পুতুল কোলে তুলে নিয়ে আদর করে।

২ বছর বয়স ঃ—

না পড়ে ভালভাবে দৌড়াতে পারে। বড় বল পা দিয়ে মারে। একা একা সিঁড়ি উঠতে বা নামতে পারে। ট্রেনের অনুকরণে দিয়াশলাইয়ের বাক্স বা ঐ জাতীয় জিনিস পরপর সাজায়। দেখে দেখে খাড়া বা গোলমত দাগ দিতে পারে। তিনটি শব্দ ব্যবহার করে বাক্য বলতে পারে। সাধারণ নির্দেশ পালন করে। টেনে জামা খুলতে পারে। ঘর-সংসারের কাজের অনুকরণ করে হাঁড়ি,

কড়া, খুন্তি, ইত্যাদি দিয়ে রান্নাবাটি বা পুতুল খেলে। নিজেকে নিজের নাম বলে উল্লেখ করে।

৩ বছর বয়স ঃ—

তিন চাকার সাইকেল চড়তে পারে। নিচের সিঁড়ি থেকে লাফ দেয়। একের পর অন্য পা ব্যবহার করে সিঁড়ি উঠতে পারে। ৯-১০টা কাঠের টুকরো বা ঐ জাতীয় কোন জিনিস পর-পর স্তম্ভের মত করে সাজাতে পারে। গোল এবং ক্রশচিহ্ন অনুকরণ করে আঁকতে পারে। নিজে ছেলে না মেয়ে তা বলতে পারে। বহুবচন ব্যবহার করে। বইয়ের পরিচিত ছবির বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারে। নিজে নিজে জুতো পরে। জামার বোতাম খুলতে পারে। ভালভাবে নিজের হাতে খেতে পারে।

৪ বছর বয়স ঃ—

এক পদক্ষেপে এক সিঁড়ি নামতে পারে। এক পায়ে ৪ থেকে ৮ সেকেণ্ড দাঁড়ায়। চার সংখ্যা পর্যন্ত কেউ বললে তার পুনরাবৃত্তি করতে পারে। তিনটি জিনিস দেখিয়ে দেখিয়ে গুণতে পারে। রংয়ের নাম ঠিকমতো বলতে পারে। 'উপরে', 'নিচে', 'মধ্যে' 'সামনে,' 'পিছনে' এবং 'পাশে'—এগুলি বুঝতে পারে। নিজে নিজে দাঁত মাজতে, মুখ ধুতে ও মুছতে পারে। অপর শিশুদের সঙ্গে মিলে-মিশে খেলা করে।

৫ বছর বয়স ঃ—

একের পর এক অন্য পা দিয়ে লাফাতে পারে। পায়খানা ও প্রস্রাবের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হয়। চতুষ্কোণ আঁকতে পারে। দেখে বোঝা যায় এমনভাবে মাথা, হাত, পা, ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহ মানুষের ছবি আঁকতে পারে। ১০টা জিনিস নির্ভুলভাবে গুণতে পারে। প্রচলিত মুদ্রা চিনতে পারে। বুঝতে না পারলে শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করে। জামা, প্যাণ্ট, ইত্যাদি নিজে নিজে পরতে ও খুলতে পারে। কিছু কিছু বর্ণ লিখতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা করতে পারে।

শিশু-মনের বিকার

একটি মানব শিশু বেড়ে ওঠার সাথে তার শৈশব জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা তার মনের উপর নানাভাবে ছাপ রেখে যেতে থাকে। শিশুর খাওয়া-পরা মলমূত্র ত্যাগ, খেলাধুলা, মা-বাবা ও পরিবারের অপর লোক-জনের সাথে তার সম্পর্ক বা মনের আদান-প্রদান, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কামনা-বাসনা ভালবাসা-ঈর্ষা ও ঘৃণা বা ক্রোধ ইত্যাদির অভিজ্ঞতা সমূহ ধীরে ধীরে তার মনটিকে গড়ে তুলতে থাকে। শৈশব জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতাই যে শিশুর মনের পক্ষে পুরোপুরি ভাবে সুখদায়ক বা মঙ্গলদায়ক বা মঙ্গলকর, তা নয়। প্রায় প্রত্যেক শিশুর জীবনেই কিছু কিছু নিরানন্দময় বা বেদনা দায়ক অভিজ্ঞতা থাকে। মা-বাবার বকা-ঝকা, চড়-চাপড় না খেয়েছে বা সবকিছুই পছন্দ মত পেয়েছে—এমন শিশু বিরল। কিন্তু শিশু তার জীবনের নানা ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বড় হয়ে ওঠে এবং দোষে গুণে সাধারণ সুস্থ মানুষরূপে পরিণতি লাভ করে। সামান্য নিরানন্দময় বা বেদনা দায়ক অভিজ্ঞতাই শিশুর জীবনে মানসিক বিকার বা অস্বভাবিতা (abnormality) নিয়ে আসে না। সাধারণ বেদনা-দায়ক পরিস্থিতিকে প্রতিরোধ ও অতিক্রম করার ক্ষমতা প্রায় সকল শিশুরই থাকে। একটি শিশুর পক্ষে কখনও-সখনও আচরণে সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতি বা মানসিক অস্বভাবিতা রোগের লক্ষণ নয়, যেমন মাঝে-মাঝে সামান্য শারীরিক অস্বভাবিতা শারীরিক অস্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়।

ইতিপূর্বে আলোচনায় দেখা গেছে যে শিশুর পরিবেশের প্রধান অঙ্গ বয়স্করা। শিশুর মা-বাবা, অপরাপর আপনজন, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, নিকট প্রতিবেশী, পরিবারের চিকিৎসক ও বন্ধু প্রভৃতি ব্যক্তিরাই তার পরিবেশের মূল উপাদান। কাজেই শিশুর প্রতি এঁদের আচার-আচরণই তার জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার—শিশুর প্রতি বড়দের আচরণ সব সময় নিখুঁত বা সুষ্ঠুভাবে হয়ে থাকে না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কিছু-কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে। বিশেষ পরিস্থিতির চাপে বা অন্যান্য কারণে বড়রা অনেক সময় শিশুদের প্রতি ত্রুটিপূর্ণ আচরণ করে থাকেন। আবার শিশুর লালন-পালনে অনেক সময় ত্রুটি দেখা দিতে পারে। শিশুরাও এই সকল ত্রুটপূর্ণ আচরণের আধিক্য বা গভীরতার ফলে, অথবা কোন কোন শিশু তার জন্মগত প্রবণতার জন্য সামান্য বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার ফলেই মানসিক দিক থেকে আহত হয়। এই ক্ষত শিশুর অভিজ্ঞতার জগতে অনেক সময় কিছু কিছু তিক্ততার সৃষ্টি করে, যার ফল তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে ক্ষতিকর হয়ে দেখা দেয়। এইভাবে কালক্রমে শিশুর মানসিকতায় অস্বভাবিতা বা রোগের লক্ষণ ফুটে ওঠে। কোনও মানুষ, পরিবার ও সমাজই সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত নয়। সাধারণভাবে মানবশিশু এর মধ্যেই সুস্থভাবে বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু কখন্ কোথায় কোন্ পরিবেশ বা ঘটনা কোন্ শিশুর উপর কীভাবে প্রভাব বিস্তার করবে, বলা কষ্ট সাধ্য। কাজেই মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও শিশুর মানসিক রোগ দেখা যেতে পারে। এই বাস্তব জগতে সুস্থতার পাশাপাশি অসুস্থতাও রয়েছে। তাই অসুস্থতার প্রতিকারের কথা ভাবতে হয়েছে। আধুনিক শিশু-মনোবিজ্ঞান শিশুর নানাপ্রকারের মানসিক অসুস্থতা বা অস্বভাবিতা সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধান চালিয়ে বহু তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছে। ফলে এই সকল অসুস্থতার প্রতিরোধ ও আরোগ্য সাধনে সফল হয়েছে।

শিশুদের মানসিক বিকৃতি বা অস্বভাবিতাগুলিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ কোনও কোনও শিশুর অস্বভাবিতা তার জন্মগত মানসিক ক্ষমতার সাথে যুক্ত। এরূপ দেখা যায় হয়ত একটি শিশুর মানসিক ক্ষমতার, বিশেষ করে বুদ্ধির, ক্রমবিকাশ যে বয়সে যতটা হওয়া দরকার

ততটা হয় নি। জন্মগত ভাবেই সে কম মানসিক শক্তি সম্পন্ন। ফলে সে তার বয়স অনুযায়ী আচরণে, লেখা-পড়ায়, কাজকর্মে ও সামাজিক ব্যবহারে সমবয়সী অপর শিশুদের থেকে পিছিয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়, এক ধরনের অস্বভাবিতা দেখা যায় যেগুলি শিশুর শারীরিক অবস্থার সাথে যুক্ত। এর উদ্ভব হয় শরীরের আভ্যন্তরিক কোন যন্ত্রের বা দেহের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ত্রুটি, অথবা কোন শারীরিক রোগ থেকে। মানুষের শরীর ও মনের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ থাকায় শারীরিক ত্রুটির ফলে মানসিক অস্বভাবিতা দেখা দিতে পারে।

তৃতীয় প্রকারের অস্বভাবিতার মধ্যে প্রধানতঃ প্রক্ষোভ বা আবেগমূলক (emotional) অস্বাভাবিক আচরণকেই ধরা হয়েছে। প্রকৃত অর্থে এগুলিই যথাযথ মানসিক অস্বভাবিতা বা রোগ বা বিকৃতি। শিশুর আবেগজনিত নানা মানসিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াই এর মূল কারণ। মানসিক রোগগ্রস্ত শিশুদের মধ্যে এই শ্রেণীর বিকার বা অস্বভাবিতাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়। উপরন্তু এগুলির অধিকাংশই স্বল্প স্থায়ী ও সহজেই আরোগ্য সাধ্য।

আমরা প্রথমে এই তৃতীয় প্রকারের অস্বভাবিতার কথা আলোচনা করব। কারণ মানসিক রোগের দিক থেকে এর গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক।

প্রক্ষোভ জনিত অস্বভাবিতা (Emotional Abnormality)

অতিচঞ্চলতা (**Hyperactive** বা **Hyperkinetic Reaction**) :

শিশুরা স্বভাবতই চঞ্চল। কিন্তু এই চঞ্চলতা যদি অতি মাত্রায় দেখা দেয়, অর্থাৎ চঞ্চলতার ফলে যদি শিশুর দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় তাহলে তা নিশ্চয়ই ক্ষতিকর। এরূপ ক্ষেত্রে শিশুরা অনবরত এটা-সেটা অপ্রয়োজনীয় কাজ করে, ভাঙচুর করে, অত্যধিক কথা বলে। এই সকল শিশুরা কোনও একটি বিষয়ে বেশিক্ষণ মনোযোগ দিতে পারে না। ফলে পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ে। এরা অত্যন্ত আবেগ প্রবণ হয় এবং এদের আবেগের

ঘনঘন রূপান্তর ঘটে। এদের সহ্য শক্তি অত্যন্ত কম হয়। পছন্দ মত ব্যাপার না হলেই এরা ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এরা সহজেই হতাশায় বিমর্ষ হয়ে পড়ে। সামান্য উদ্দীপনাতেই এরা অত্যধিক প্রতিক্রিয়া ও উত্তেজনা দেখায়। সামাজিক পরিস্থিতিতে এরা প্রয়োজনীয় সংযম রক্ষা করতে পারে না। মা-বাবারা সর্বদাই এদের নিয়ে চিন্তিত থাকেন, বিশেষ করে অপরের বাড়ী গেলে এরা কখন কি করে বসে সেই ভাবনায়ই অস্থির। এরা এক জায়গায় বেশিক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না। এদের কাজ করার মধ্যে পেশী সঞ্চালনের সামঞ্জস্যের (muscular coordination) অভাব পরিলক্ষিত হয়।

অতি-চঞ্চলতা সাধারণতঃ আট বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায়। আবার এই অস্বভাবিতাটি মেয়েদের অপেক্ষা ছেলেদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। অনেক সময় অতি-চঞ্চল শিশুদের কম বুদ্ধি সম্পন্ন বলে মনে করা হয়। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা ঠিক নয়। একটি ছয় বছরের ছেলে। কলকাতার একটি নামী বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছিল। অতি-চঞ্চলতার জন্যে সে ক্রমেই পড়াশুনায় পিছিয়ে গেল। তখন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনরকম অনুসন্ধান না করেই তাকে কম বুদ্ধি সম্পন্ন বলে চিহ্নিত করল এবং বিদ্যালয় ছেড়ে দিতে বাধ্য করল।

অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবারের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ও লালন-পালনের ত্রুটির জন্যই এরূপ অস্বভাবিতা শিশুর মধ্যে দেখা দেয়। মা-বাবার অহেতুকভাবে অস্থির ও উত্তেজনাপূর্ণ আচরণ, শিশুর খাওয়া-দাওয়া, মলমূত্র ত্যাগ প্রভৃতিতে বিনা প্রয়োজনে চাপ সৃষ্টি ইত্যাদি তার মনকে অস্থির ও চঞ্চল করে তোলে।

অতি-চঞ্চলতার প্রতিকারের জন্য অনেক সময় কোনও কোনও ক্ষেত্রে ওষুধ প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া গেছে। কিন্তু অভিজ্ঞ

মনোরোগ চিকিৎসকের (Psychiatrist) পরামর্শ ছাড়া শিশুদের উপর কখনই ওষুধ প্রয়োগ করা ঠিক নয়। এই রোগের উপশমের জন্য শিশুরা যাতে যথা সম্ভব কম উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এদের প্রতি ব্যবহার যেন কখনও অত্যধিক আদর, আবার কখনও অত্যধিক বকা-ঝকা বা মারধোর বা বিরক্তিপূর্ণ না হয়। ব্যবহারের মধ্যে যেন একটা সমতা বা সামঞ্জস্য থাকে। পরিবারের আবহাওয়া ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়েই এই অস্বভাবিতার ক্ষেত্রে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। এইজন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও মা-বাবারা মনঃসমীক্ষক (Psychoanalist)-এর পরামর্শ নিতে পারেন। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে একটু বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই অস্বভাবিতা আপনা থেকেই কমে যায়।

শয্যামূত্রতা (Enuresis) ঃ অনেক সময় তিন বছরের অধিক বড় শিশুদের ঘুমের মধ্যে, রাত্রে বা দিনে (বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাত্রে), বিছানায় প্রস্রাব করতে দেখা যায়। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে এর পিছনে শিশুর মনের কোনও আবেগমূলক দ্বন্দ্ব কাজ করে থাকে। যেমন, রাগ, ভয়, মায়ের ভালবাসার অভাব বোধ, ছোট ভাই বা বোনের প্রতি ঈর্ষা ইত্যাদি। কাজেই এর আরোগ্যের জন্য সেই আবেগজাত দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি দরকার। এর জন্য মনোবিজ্ঞানীর সাহায্য নিতে হবে। অনেক সময় শিশুকে নানাভাবে পুরস্কারের কথা বলে উৎসাহিত করে, নানা খেলাধুলার মধ্য দিয়ে তার প্রস্রাব করে ফেলার ভয়কে মন থেকে অপসারিত করার চেষ্টা করে সুফল পাওয়া গেছে। শারীরিক অসুস্থতার জন্যও শিশুদের মধ্যে এরূপ প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নষ্ট হতে দেখা গেছে। সে-ক্ষেত্রে শরীরের দিকে প্রথমেই নজর দিতে হবে। এবং বিছানায় প্রস্রাব হয়ে যাওয়ার জন্য যাতে শিশু মানসিক আঘাত না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে ; অর্থাৎ এই নিয়ে তাকে অহেতুক সমালোচনা বা খেপানো ঠিক নয়।

এই প্রসঙ্গে শিশুদের আর একটি রোগের কথা উল্লেখ করা দরকার। এটি হ'লো দু'বছরের অধিক বয়সের শিশুদের মধ্যে মল-ত্যাগের উপর কোনও রূপ নিয়ন্ত্রণ না থাকা (Encopresis)। এ-সকল শিশুরা যখন তখন যেখানে সেখানে পায়খানা করে ফেলে। জড়-বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রেই এরূপ বেশি হতে দেখা যায়। স্বাভাবিক বুদ্ধির শিশুর ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ লালন-পালন, নতুন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির চাপ, মল-মূত্র ত্যাগের উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, পায়খানায় (Lavatory) বসতে ভয় পাওয়া, বিদ্যালয়ে যেতে ভয় ও অনিচ্ছা প্রভৃতি কারণের জন্য এই অস্বভাবিতা দেখা দেয়। অনেক সময় শিশুরা তাদের রাগ ও বিরক্তি প্রকাশের মাধ্যম হিসাবেও (বিছানায় প্রস্রাব করার মত) এরূপ আচরণকে ব্যবহার করে থাকে। বহু ক্ষেত্রেই মনের অবচেতন ইচ্ছা বা তাগিদকে এর পিছনে কাজ করতে দেখা গেছে।

শিশুদের মলত্যাগ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অভাবের নানা রকমফের আছে। কেউ নিজের পোশাক, কেউ ঘরের আনাচে-কানাচে বা অন্যের জামা কাপড়ের মধ্যে চুপি সারে পায়খানা করে ফেলে। বড় শিশুদের ক্ষেত্রে (পাঁচ ছ' বছর বয়সের শিশুদের) এই অস্বভাবিতা বিপরীত ভাবে, অর্থাৎ মলত্যাগ না করা বা কোষ্ঠ কাঠিন্য রোগরূপে দেখা দেয়। এর পিছনেও অবচেতন মনের অস্বাভাবিক ক্রোধ ও জিদ প্রভৃতি আবেগের কার্যকারিতা পরিলক্ষিত হয়।

শুরুতেই এরূপ অস্বাভাবিকতার মোকাবিলা করা দরকার। অনেক সময় বড় হওয়ার সাথে সাথে আপনা থেকেই এই রোগ দূর হয়ে যায়। উপযুক্ত শিক্ষণ (Training) ও শিশুর আত্মবিশ্বাস আনার জন্য বিভিন্ন মনস্তাত্বিক চিকিৎসা অবলম্বনের দ্বারা এই রোগের আরোগ্য সম্ভব।

কথা বলার অস্বভাবিতা (Speech Disorder) : এই অস্বভাবিতা নানা রকমের হ'তে পারে। কোনও কোনও শিশুকে দেখা যায়

অনেক বিলম্বে কথা বলতে শেখে ; কেউ কেউ ঠিক মত শব্দ (কিছু কিছু) উচ্চারণ করতে পারে না বা কোনও শব্দের উচ্চারণে অসুবিধা বোধ করে। কারুর কারুর কণ্ঠস্বরের অস্বভাবিতা দেখা দেয়। এবং অত্যন্ত অবনতি জনক ক্ষেত্রে কথা বলা প্রায় বন্ধ হয়ে যায় অথবা ফ্যাস্‌ফ্যাসে আওয়াজে কথা বলে। এরূপ অবস্থাকে বাগ্‌রোধ (Aphasia) বলে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কথা বলার অস্বভাবিতা তোত্‌লামি রোগ রূপে দেখা দেয়। এই রোগগ্রস্ত শিশুদের মধ্যে আবার অনেকে সাধারণ অবস্থায় ঠিক ভাবে কথা বলে, কিন্তু কোন উত্তেজনাকর বা মনের উপর চাপ সৃষ্টিকারী পরিস্থিতি হলেই তোত্‌লামি শুরু করে। এরূপও দেখা গেছে কথা বলার সময় আটকে যায়, কিন্তু গান করার সময়, এমন কি সভায়, সহজ ও সুন্দর ভাবে গান করতে পারে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে মেয়েদের অপেক্ষা ছেলেরাই কথা বলার অসুবিধায় বেশি ভোগে। এই অসুবিধা সাধারণতঃ ছয় বছর বয়সের আগেই দেখা দেয় এবং দুই থেকে চার বছর বয়সের শিশুরাই এর দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়। তবে বাগ্‌রোধ (Aphasia) রোগটি কিশোরী মেয়েদের মধ্যেই বেশি দেখা গেছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শারীরিক কারণ অপেক্ষা মানসিক কারণ এই অস্বভাবিতার জন্য দায়ী। যে বয়সে শিশুরা কথা বলতে আরম্ভ করে সেই বয়সে কথা বলায় ত্রুটিপূর্ণ কোনও ব্যক্তির অধিক সংস্পর্শ, বাড়ীতে অনবরত চেঁচামেচি ও ঝগড়া-বিবাদ, মা-বাবার মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক, ভাই-বোন দাদা-দিদির প্রতি ঈর্ষা, বিদ্যালয়ে পড়াশুনার চাপ ইত্যাদি নানা কারণে শিশুর মনে ভয়ের ও মানসিক চাপের সৃষ্টি এই অস্বভাবিতার কারণ। একটি কিশোরী, বিদ্যালয়ের পড়াশুনায়ও পরীক্ষার ফলে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ার ফলে এবং মা-বাবার প্রতি ক্রোধ জনিত আবেগের জটিলতার জন্য সম্পূর্ণ বাগ্‌রোধ রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। কাজেই শিশুকে এই রোগমুক্ত করতে হলে

প্রথমেই উপরোক্ত পরিস্থিতিগুলি দূর করতে হবে। উপযুক্ত শিক্ষণ ও শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা এই সকল অসুবিধা দূর করা কিছুই কষ্ট সাধ্য নয়। মনঃসমীক্ষা চিকিৎসার দ্বারা এই রোগের আশু এবং স্থায়ী ফল পাওয়া গেছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই অসুবিধা আপনা থেকে দশ থেকে সতের-আঠার বছর বয়সের মধ্যে চলে যেতে দেখা গেছে।

নখ খাওয়া (Nail-biting): এটি একটি খুব সাধারণ রোগ এবং খুব ছোট শিশু থেকে শুরু করে বেশ বড় বয়সের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে এটির উপস্থিতি দেখা যায়। এটিও ছেলেদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। শিশুরা নিজেদের মনের উদ্বেগ ও অস্বস্তি দূর করার জন্য এই আচরণটিকে অবলম্বন করে। এই আচরণের প্রতিকারের জন্য বড়রা অনেক সময় শিশুর আঙ্গুলে তেতো জিনিস মাখিয়ে দেন। এটা মোটেই ফলপ্রসূ নয়, বরং ক্ষতি কারক। বিভিন্ন মানসিক চিকিৎসা, শিক্ষণ (Training) পদ্ধতি ও আচরণগত চিকিৎসা পদ্ধতি (Behaviour Therapy) অবলম্বন করে এই অস্বভাবিতা দূর করা সম্ভব।

আঙ্গুল চোষা (Thumb sucking): খুব ছোট শিশুদের (দু'বছরের কম) পক্ষে আঙ্গুল চোষা স্বাভাবিক। কিন্তু এই অভ্যাস যদি বেশি দিন, বিশেষ করে বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়স পর্যন্ত, স্থায়ী হয় তাহলে বুঝতে হবে যে শিশুর মানস জীবনে কিছু গোলযোগ দেখা দিয়েছে। মায়ের বুকের দুধ ছাড়ানোর ব্যাপারে যদি কিছু অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করা হয় বা এব্যাপারে যদি অযথা তড়িঘড়ি করা হয় তাহলে এই অস্বভাবিতা দেখা দিতে পারে। নখ খাওয়ার কারণের মতই শিশুর মনের উদ্বেগ এর পিছনে কাজ করে।

মুদ্রাদোষ বা কুঞ্চদোষ (Tics): শরীরের কোনও অঙ্গের বা মাংসপেশীর হঠাৎ হঠাৎ আপনা থেকেই সঙ্কোচন বা কাঁপা প্রভৃতি এই অস্বভাবিতার লক্ষণ। শিশুদের মধ্যে এই লক্ষণ সমূহ চোখ, নাক, ঠোট, কাঁধ, গলা প্রভৃতি স্থানের মাংসপেশীতে সাধারণতঃ

দেখা যায়। চোখ পিট্‌পিট্‌ করা, অনবরত গলা ঝাড়া এই অস্বভাবিতার অন্তর্গত। পাঁচ-ছ' বছর থেকে চোদ্দ-পনের বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে এই লক্ষণগুলি সাধারণতঃ দেখা দিতে পারে। দু'বছরের কম বয়সের শিশুরা অনেক সময় তালে তালে ছন্দ রেখে শরীরের অঙ্গ সঞ্চালন করে থাকে। যেমন, মাথা নাড়া বা বসে বসে দোলা। এসবকে যেন মুদ্রাদোষ বলে ভুল করা না হয়।

মুদ্রাদোষ কখনও কখনও শারীরিক কারণে হতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর পিছনে মানসিক কারণ থাকে। এর প্রতিবিধানের জন্য মানসিক চিকিৎসা দরকার।

ঘুমের মধ্যে হাঁটা বা স্বপ্নচারিতা (Sleep-walking বা Somnabulism) : অনেক সময় দেখা যায় যে কোনও শিশু দু'তিন ঘণ্টা ঘুমাবার পর বিছানা থেকে উঠে পড়ে এবং ঘরের মধ্যে চলাফেরা করে বা বাইরে বেরিয়ে যায় ; আবার হয়ত কিছু কাজও করে। যেমন পড়ার টেবিল গুছিয়ে রাখল। সে নিজের থেকেই আবার বিছানায় ফিরে আসে এবং শুয়ে পড়ে। পরের সকালে ঘুম থেকে উঠে সে এসব ব্যাপারের কিছুই মনে করতে পারে না। এই অবস্থার মধ্যে তাকে জাগিয়ে দিলে সে অবাক হয়ে যায় তার নিজের অবস্থান দেখে। এই অবস্থার মধ্যে তাকে সজোরে ধাক্কা দিলে সে জেগে যাবে। সাধারণতঃ পনের থেকে তিরিশ মিনিট পর্যন্ত এই অবস্থা স্থায়ী হয়। এই অস্বভাবিতা বা রোগের কারণ সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট অনুসন্ধান হয় নি। একটা ধারণা ছিল যে স্বপ্ন দেখে এরূপ চলাফেরা করে, তা ঠিক নয়। আরও গভীর মানসিক জটিলতা, যেমন ব্যক্তিত্বের বিষঙ্গতা (Dissociation) বা বহু-ব্যক্তিত্ব (Multiple Personality), এর কারণ স্বরূপ দেখা গেছে।

এই প্রসঙ্গে শিশুদের মধ্যে পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবের কথা উল্লেখ করা দরকার। শিশুদের মধ্যে পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব নজর করলে প্রথমেই দেখতে হবে শিশুর শরীর ঠিক আছে কিনা। সুস্থ শরীরের

শিশুদের ঘুমের ব্যাঘাত হতে কদাচিৎ দেখা যায়। কাজেই সে-ক্ষেত্রে মানসিক কারণই অনুমান করতে হবে। শিশুর মনের অভ্যন্তরবর্তী উদ্বেগ সমূহ এর কারণ। তাই অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা এর মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার।

ঘুমের মধ্যে কথা বলা (Sleep-talking)ঃ অনেক মা-বাবাই এরকম অনুযোগ নিয়ে আসেন যে তাঁদের শিশুরা ঘুমের মধ্যে কথা বলে, চেঁচামেচি করে, কাঁদে বা হাসে এবং তারপর কখনও কখনও ঘুম থেকে জেগে যায়। আসলে এগুলি শিশু বয়সে নানা ধরণের স্বপ্ন দেখার ফল। এগুলি শিশু বড় হওয়ার সাথে সাথে ঠিক হয়ে যায়। তবে এই অবস্থা যদি দীর্ঘ স্থায়ী হয়, অনবরত ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, প্রায়ই ঘুমের মধ্যে ভয় পেয়ে (স্বপ্ন দেখে) শিশু জেগে ওঠে তাহলে তার মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

অনেকে মনে করেন স্বপ্ন দেখা খারাপ। এ ধারণা একেবারেই ভুল। স্বপ্ন দেখা মানুষের মনের একটি স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। সকল মানুষেই স্বপ্ন দেখে। তবে স্বপ্ন দেখার জন্য যদি স্বাভাবিক জীবনে জটিলতার সৃষ্টি হয়, তখনই তার প্রতি নজর দেওয়া দরকার।

বেড়াতে ভয় (Travel Disorder)ঃ খুব ছোট বয়সের কোনও কোনও শিশু অনেক সময় রাস্তায় বেরুতে, গাড়ীতে বা ট্রেনে চড়তে ভয় পায়। এরকম শিশু কোনও নতুন জায়গায় যেতে ও থাকতে অস্বস্তি বোধ করে। কোন ভীতিজনক বা নিরানন্দময় অভিজ্ঞতার জন্য সাময়িকভাবে এরূপ হতে পারে। এধরনের সাধারণ অস্বাভাবিকতায় ভয়ের কিছু কারণ নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বয়স বাড়ার সাথে সাথে এগুলি আপনা থেকে চলে যায়। একটি শিশু, খুব ছোট বয়সে মোটর গাড়ীতে উঠতে, অপরিচিত লোকের বাড়ী যেতে অত্যন্ত ভয় পেত। কখনও প্রয়োজনে এরূপ ঘটলে অস্বাভাবিক ভাবে কান্নাকাটি করত। কিন্তু বড় হওয়ার সাথে সাথে এই ত্রুটি ক্রমেই কমে গিয়ে এখন স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

শব্দ-ভীতি (Sound Fear) : ছোট বয়সের কোনও শিশুকে জোরে কিছু পড়ার শব্দে বা ভেঙ্গে যাওয়ার শব্দে, পট্‌কা ফাটার আওয়াজে, এমনকি জোরে দরজা বন্ধ করার শব্দে ভয় পেতে দেখা যায়। এই ভয় কারুর মধ্যে অস্বাভাবিক ভাবে বেশিদিন ধরে প্রকাশ হতে থাকলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। এই ভয়ও ধীরে ধীরে বয়স বাড়ার সাথে সাথে আপনা থেকে চলে যায়।

খাওয়ার ঝামেলা (Feeding Disorder) : শিশুর খিদে পেলে খাবে, এটাই স্বাভাবিক। এর অন্যথা হলে শিশুর আবেগ জীবনে গোলযোগ ও লালন-পালনে ত্রুটি সন্দেহ করতে হবে এবং তার প্রতি-কারের চেষ্টা করা দরকার। (এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।)

অতিমাত্রায় ক্রোধ ও অসামাজিক ব্যবহার (Too much aggressive & unsocial behaviour) : এই সকল শিশুরা অত্যন্ত অবাধ্য, ঝগড়াটে ও প্রতিশোধ পরায়ণ হয়। এরা জিনিসপত্র ভাঙচুর করে, গালাগালি করে, এমন কি মারপিটেও পিছপা হয় না। সাধারণতঃ ত্রুটিপূর্ণ পারিবারিক আবহাওয়াই এর জন্য দায়ী। কাজেই এর প্রতিবিধানে অন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের আগে পারিবারিক আবহাওয়ার উন্নতি বিধান করতে হবে।

আত্ম-সম্বন্ধিতা (Autism) : খুব ছোট বয়স থেকে শুরু করে পাঁচ-ছ' বছর বয়সের শিশুদের মধ্যেই এই অস্বভাবিতার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এই সকল শিশুরা বাইরের জগতের উদ্দীপনা বা ঘটনার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয় না। এরা চুপচাপ বসে থাকে, বিশেষ প্রয়োজন না হলে কথা বলে না—শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না' বলে কাজ সারে। এদের মধ্যে আবেগের প্রকাশ খুব কম থাকে। এরা অনেক সময় হঠাৎ রেগে যায়। এই রোগগ্রস্ত শিশুরা ধীরে ধীরে তাদের পরিবেশ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এই অস্বভাবিতা কারুর মধ্যে কিছু মাত্র দেখা দিলেই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং

চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে। এটিও মেয়েদের অপেক্ষা ছেলেদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

সাইকো-নিউরসিস্ (Psychoneurosis) বা বায়ু রোগ ঃ প্রাক্-কিশোর ও কিশোর বয়সের শিশুদের মধ্যে এই রোগ বা অস্বভাবিতা মাঝে মাঝে দেখা যায়। এর বহিঃপ্রকাশ বা লক্ষণের বিভিন্নতা অনুযায়ী একে নানা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন, (১) অভিঘাত মূলক অস্বভাবিতা (Traumatic Neurosis, (২) উৎকণ্ঠা প্রবণতা (Anxiety States), (৩) আতঙ্ক (Phobia), (৪) হিস্টিরিয়া (Hysterical States), এবং অব্সেসন (Obsessive-compulsive States) বা আবেশ। তবে মনে রাখতে হবে এই সকল বিভাগগুলিকে স্থির সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। কারণ এদের মধ্যে লক্ষণের এবং উৎপত্তির কারণে কিছু কিছু মিল থাকায় একটির লক্ষণ সমূহ অপরটির মধ্যে প্রায়ই কিছু কিছু দেখা যায়। তাই দেখা যায় কখনও কখনও এগুলির একটি অপরটির রূপ পরিগ্রহ করে। যেমন উৎকণ্ঠা প্রবণতা ধীরে ধীরে অব্সেসনে রূপান্তরিত হতে পারে।

(১) **অভিঘাতমূলক অস্বভাবিতা ঃ** কোনও শিশুর মনে বাইরের উদ্দীপনার (বিশেষ করে বেদনাদায়ক বা অপ্রীতিকর) ফলে যদি হঠাৎ অত্যধিক উত্তেজনার আবির্ভাব ঘটে, যে উত্তেজনা শিশুর পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, তখনই এই অস্বভাবিতা দেখা দেয়। এর ফলে দৈনন্দিন জীবনে কাজ করার ক্ষমতা কমে যায় ; অত্যধিক অনিয়ন্ত্রিত আবেগের (যেমন উৎকণ্ঠা বা ক্রোধ) বহিঃপ্রকাশ ঘটে ; কখনও কখনও শরীরে খিচুনি দেখা দেয় ; ঘুমের ব্যাঘাত হতে থাকে এবং ভয়ের স্বপ্ন দেখে আতঙ্কিত হয়। জাগ্রত অবস্থায় পূর্বের ভীতি-জনক বা অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার কল্পনা বারবার শিশুর মনে আসতে থাকে। দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে এই রোগগ্রস্ত সামান্য অস্বাচ্ছন্দ্যের ফলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এরা সামান্য মানসিক আঘাত সহ্য করতে পারে না। আবার এই অস্বভাবিতায়

আক্রান্ত শিশুদের কখনও কখনও চৈতন্য হারাতেও (Fainting) দেখা যায়।

(২) উৎকণ্ঠা প্রবণতা ঃ শিশুর মনে সর্বক্ষণের জন্য একটা অহেতুক আভ্যন্তরিক পীড়ন (Inner Tension) বা আতঙ্ক অনুভব হতে থাকে। তার মনের এই অবস্থা এমন হয় যে সামান্য কারণেই সে অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, যেমন বাবা বা মায়ের বাড়ীতে ফিরতে সামান্য দেরী হচ্ছে, ভাই বা বোনের সামান্য অসুখ, রাস্তায় সামান্য চেঁচামেচি হচ্ছে ইত্যাদি। মনে হয় যেন এরা উদ্বিগ্ন হওয়ার জন্যই প্রস্তুত হয়ে থাকে, সামান্য সুযোগ ঘটলেই হলো। ফলে এদের মধ্যে দাঁতে নখ কাটা, মাথার চুল ছেঁড়া (অন্যমনস্ক ভাবে) ইত্যাদি উপসর্গও দেখা যায়।

এই প্রকারের অস্বভাবিতা প্রায় সকল শিশুর মধ্যেই কখনও না কখনও অল্প-বিস্তার দেখা দেয়। উৎকণ্ঠা প্রবণতা অনেক সময় ধীরে ধীরে আতঙ্কে (Phobia) রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ শিশু তার উৎকণ্ঠা সৃষ্টিকারী বস্তু বা পরিস্থিতিকে এড়িয়ে চলতে আরম্ভ করে। যেমন কোনও শিশু কুকুর, গরু, আরশোলা ইত্যাদি দেখলে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং তাদের এড়িয়ে চলে।

(৩) আতঙ্ক ঃ অনেক সময় দেখা যায় কোনও শিশু কোনও বিশেষ বস্তু, প্রাণী বা পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেই অত্যধিক আতঙ্কিত হয়ে পড়ে ; তখন তার স্বাভাবিক ভাবে চিন্তা ও কাজ করার ক্ষমতা থাকে না। এমনকি সে নড়াচড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে। হয়ত সামান্য একটা আরশোলা দেখে সে এমন আচরণ করবে যা অপর সকলের কাছে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক মনে হবে। কিন্তু কোন যুক্তিই তাকে ঐরূপ আচরণ করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না। শিশুদের মধ্যে এরূপ আতঙ্ক সাধারণতঃ পোকামাকড়, উচু জায়গা, কোন শারীরিক ব্যথা বেদনা, ঝড়-বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ চমকান, রক্ত, অন্ধকার

জায়গা, একা একা থাকা, রোগ জীবাণু শরীরে প্রবেশ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে প্রকাশ হয়।

(৪) **হিস্টিরিয়াঃ** এর ফলে শিশুদের মধ্যে বয়স অনুপাতে দৃষ্টি-ভঙ্গীর (বাইরের জগতের প্রতি) পরিপক্কতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ তারা যেন আর বড় হতে চায় না, ছোট্ট শিশুটিই থেকে যেতে চায়। একটু অপছন্দকর পরিস্থিতি হলেই এরা তা সহ্য করতে পারে না এবং তা এড়িয়ে চলার জন্য নানারকম পদ্ধতি অবলম্বন করে, যেমন হঠাৎ শারীরিক দিক থেকে অসুস্থ বোধ করে, হঠাৎ মনের অস্থিরতা দেখা দেয়। অবশ্য মনে রাখতে হবে এসব কিছুই অবচেতন ভাবে হয়ে থাকে। কাজেই রোগী খুব সচেতন ভাবে ইচ্ছা করে করছে —এরূপ দোষারোপ করে লাভ নেই। এই সকল শিশুরা খুব ভাল-বাসার কাঙাল হয় এবং এরা আশানুরূপ ভালবাসা না পেলেই ক্ষুব্ধ হয় ও নানাভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ মনের আবেগ এই রোগের ফলে শারীরিক রোগের মধ্য দিয়ে প্রকাশ হতে পারে, যদিও রোগীর শরীরে অনুরূপ শারীরিক রোগের কোন শরীরগত কারণ উপস্থিত থাকে না। হিস্টিরিয়ার ফলে শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের খিচুনি হতে পারে বা রোগীর ফিট হতে পারে। এই রোগ বা অস্বভাবিতার ফলে শিশু চোখে কম দেখতে বা না দেখতে পারে, কানে কম শুনতে বা একেবারেই না শুনতে পারে, কথা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তার শরীরের কোন অঙ্গ অসাড় হয়ে যেতে পারে অথবা খুব সংবেদনশীল হতে পারে; শরীরে নানারকম অনুভূতি বা সংবেদন বোধ হতে পারে। আবার এই অস্বভাবিতার ফলে শিশুর স্মৃতিশক্তি লুপ্ত হতে পারে, ফলে নিজেকে অন্য ব্যক্তি মনে হতে পারে এবং নিজের বাড়ী ও লোকজনের কথা ভুলে গিয়ে অন্যত্র চলে যেতে পারে বা এক এক সময় এক এক রকম (ভিন্ন ভিন্ন) ব্যক্তির মত আচরণ করতে পারে। একটি কিশোরী এই রোগগ্রস্ত হয়ে তার মাকে হাসপাতালের নার্স মনে করতে আরম্ভ করল। সাধারণতঃ জীবনে কোন সমস্যা (রোগীর ধারণা অনুযায়ী)

উপস্থিত হলেই এই সকল উপসর্গ দেখা দেয়। পরীক্ষার আগে অনেক শিশুকেই দেখা গেছে চোখে দেখতে পাচ্ছে না, কথা বলতে পারছে না। পরীক্ষার হলে মূর্ছা যায় বা হাত অবশ হয়ে আসে। এই অস্বভাবিতার ফলে রোগীর মধ্যে আত্মহত্যা করার প্রবণতাও দেখা দিতে পারে। কখনও কখনও অধ্যাস (Illusion) বা ভুল দেখা, ভ্রান্ত ধারণা (Delusion), এবং অমূলক প্রত্যক্ষ (Hallucination) অর্থাৎ যার অস্তিত্ব নেই তা দেখা বা শোনা এই রোগের উপসর্গ রূপে দেখা দেয়। এই অস্বভাবিতার প্রবণতা সাধারণতঃ মেয়েদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। এই প্রবণতা সম্পন্ন কিশোরীরা অল্পেই অন্য ছেলের প্রেমে পড়ে এবং প্রায়ই এই প্রেম ব্যর্থতায় বা অশান্তিতে পর্যবসিত হয়।

(৫) **অবসেসন**ঃ বিস্তারিতভাবে একে অব্‌সেসিভ্‌-কম্পালসিভ্‌ নিউরসিস্‌ (Obsessive-Compulsive Neurosis) বলা হয়ে থাকে। কারণ এর উপসর্গের মধ্যে চিন্তা ও কাজ উভয়ই যুক্ত থাকতে পারে। রোগী এই অস্বভাবিতার ফলে যা সে চিন্তা করতে চায় না এমন চিন্তা এবং যে কাজ সে করতে চায় না এমন কাজ নিজের সচেতন ইচ্ছার বিরুদ্ধে বার বার করতে বাধ্য হয়। যেমন কোনও বস্তু, প্রাণী, লোক বা দেবদেবীর কথা মনে পড়া ; বার বার হাত ধোয়া ; অযথা কিছু (সিঁড়ি, বইয়ের পাতা, রাস্তায় গাড়ী, গাছ, ল্যাম্পপোস্ট ইত্যাদি) গণনা করা বা স্পর্শ করা ; স্নান করার সময় গুণে গুণে মগের সাহায্যে গায়ে জল ঢালা প্রভৃতি। এই অস্বভাবিতার ফলে শিশুরা রাগী হয়, তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বাতিক থাকে। তারা সব কাজেই খুঁতখুঁতে হয়।

এই সকল নিউরসিস্‌ ছাড়া শিশুদের মধ্যে আর এক প্রকারের অস্বভাবিতা দেখা যায় যাকে অঙ্গীয় বা অরগান নিউরসিস্‌ (Organ Neurosis) বলা হয়ে থাকে। একটি শিশু যদি অনবরত বা অনেকদিন ধরে কোনও একটি অস্বাভাবিক মনোভাব বা আবেগের

মধ্যে জীবনযাপন করে তাহলে তা তার শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্রসমূহের ক্রিয়া-কলাপ প্রভাবিত করে বা ঐ সকল যন্ত্রের স্বাভাবিক কাজে বাধার সৃষ্টি করে। এর ফলে তার সাধারণ স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে এবং কালক্রমে কোনও শারীরিক রোগ দেখা দেয়। যেমন যে শিশু প্রায়ই বিমর্ষ হয়ে থাকে তার হজমের গোলমাল হতে পারে এবং ফলে তার পরিপাক যন্ত্রের কঠিন রোগ হতে পারে।

নিউরসিসের চিকিৎসায় মনঃসমীক্ষা বা মনঃসমীক্ষা ভিত্তিক কোন মানসিক চিকিৎসাই বিশেষ উপযোগী। প্রয়োজন হলে এসব ক্ষেত্রে ওষুধও প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

সাইকসিস্ (Psychosis)ঃ এ পর্যন্ত যে সকল অস্বভাবিতার কথা বলা হ'লো সেগুলো ছাড়া শিশুদের মধ্যে, (যদিও খুব অল্পক্ষেত্রে) আর এক প্রকারের অস্বভাবিতা বা মানসিক রোগ কখনও কখনও দেখা যায়। এতে তিন-চার বছর বয়স থেকে শিশুর মধ্যে একটা অস্বাভাবিক চঞ্চলতা, ব্যবহারে ক্রমাগত অবনতি, মনের ভাব প্রকাশে ক্রমাগত অধিকতর অক্ষমতা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। নানারকমের অধ্যাস (Illusion) বা ভুল দেখা, ভ্রান্তি (Delusion) এবং অমূলক প্রত্যক্ষও (Hallucination) এতে উপস্থিত থাকতে পারে। এই রোগের ফলে শিশুদের মধ্যে হঠাৎ রেগে যাওয়া, কথা আটকে যাওয়া এবং তার সঙ্গে ফিট হওয়া, অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে থাকা, পরিবেশ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া বা অপর সকলের সাথে মেলামেশা না করা প্রভৃতি লক্ষণগুলিও দেখা যায়। ফিট্ মৃগীরোগ (Epilepsy) থেকেও হতে পারে। এরূপ লক্ষণ সমূহ দেখা গেলে বিলম্ব না করে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্যে চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

অপরাপর ব্যবহারগত অস্বভাবিতা (Behaviour Disorder) ও দুষ্ক্রিয়তা (Delinquency)ঃ প্রাক্ কিশোর ও কিশোর বয়সের শিশুরা অনেক সময় নানা কারণে মিথ্যা কথা বলে। যেমন অপরকে ঠকাবার জন্য বা মজা করার জন্য; মিথ্যা জিনিসটি বা পরিস্থিতিটি

নিজের বিশ্বাস করতে ভাল লাগার (Make-believe) জন্য ; অভিভাবকের ভয়ে নিজের দোষ স্থালনের জন্য ; কিছু লাভের বা অপরের দৃষ্টি আকর্ষণের আশায় ; প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে ; অপরকে অনুকরণ করে বা সঙ্গ দোষের জন্য মিথ্যা কথা বলতে পারে। এই সকল কারণে সে চুরিও করতে পারে। পঞ্চম শ্রেণীর একটি শিশু প্রায়ই তার ক্লাসের বন্ধুদের কাছে গল্প করত তাদের গাড়ী আছে। গাড়ী থাকার সাথে তার আত্মমর্যাদা বোধ কোনও কারণে মিশে গিয়েছিল। আর একটি শিশু মা-বাবার ভালবাসা হারাবার ভয়ে বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর সব সময় বাড়িয়ে বলত। এবং শেষ পর্যন্ত এই মিথ্যা বজায় রাখার জন্য বিদ্যালয়ের দেওয়া পরীক্ষার রিপোর্টের (report) লেখা ঘষে তুলে নিজের ইচ্ছামত নম্বর বসিয়ে নিল। এই সকল আচরণ বারবার ঘটতে থাকলে ভাববার কথা। এ ছাড়া অনেক শিশুদের মধ্যে মেজাজ করে কথা বলা ও বিভিন্ন অবাধ্যতামূলক আচরণও দেখা যায়।

একটু বড় বয়সের শিশুদের মধ্যে নানা রকম অস্বাভাবিক যৌন আচরণ, যেমন অত্যধিক হস্তমৈথুন (Masturbation), যৌন আলোচনা, অশ্লীল ও অসামাজিক কথা বলা, যৌন ছবি দেখার প্রতি ঝোঁক প্রভৃতি বেশি মাত্রায় দেখা যায়। এই বয়সের শিশুদের মধ্যে স্কুল পালান, বাড়ী থেকে পালিয়ে যাওয়া, অবাস্তব আবদার করা (যেমন তাকে অন্য ছেলে/মেয়ের সাথে ঘুরে বেড়াতে বা প্রেম করতে দিতে হবে), মারামারি করা, অপরের সাথে যৌন ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়া, নানারকম নেশা করা (গাঁজা, ভাঙ্‌, নেশা উৎপাদনকারী ওষুধ (drug) সেবন, মদ্যপান ইত্যাদি) প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধমূলক আচরণের আবির্ভাবও দেখা যায়। এ সকল আচরণ বা উপসর্গের জন্য শিশু ধীরে ধীরে লেখাপড়ায় এবং দৈনন্দিন কাজকর্মে পিছিয়ে পড়বে এটাই স্বাভাবিক।

অনুসন্ধানে জানা গেছে পরিবারের অস্বাস্থ্যকর (মানসিক)

আবহাওয়া, মা-বাবার মধ্যে মিলমিশের অভাব বা অনবরত ঝগড়াঝাটি এবং শিশুর জীবনে ভালবাসার অভাব বোধ বা অবহেলার অভিজ্ঞতাই প্রধানতঃ এসকল অপরাধ প্রবণ বা অস্বাভাবিক আচরণের জন্য দায়ী। এর সঙ্গে যদি সঙ্গ-দোষ যুক্ত হয় তাহলে তো আর কথাই নেই। অনেক সময় শিশুরা মনের একাকিত্বের বোধের থেকেও এই সমস্ত আচরণের প্রতি প্রলুব্ধ হয়। আজকাল বহু ছোট পরিবারের মা-বাবা উভয়ই চাকুরী বা রুজি রোজগারের জন্য দিনের অধিকাংশ সময় বাইরে থাকেন। এই সমস্ত পরিবারের শিশুরা ভালবাসার অভাব বোধ এবং একাকিত্বে ভোগে। এই সকল পরিবারের শিশুরা সহজেই নানা অস্বাভাবিক আচরণের শিকার হয়; এরা সহজেই কুসঙ্গে পড়ে। এমন কি এরূপ একাকিত্বের মধ্যে থেকে একটি শিশুকে আত্মহত্যা করতে দেখা গেছে। সপ্তম শ্রেণীর শিশু। সারা দিন স্কুলের পর বাড়ী ফিরে মা-বাবা কাউকে পেত না। তার থেকে দু'বছরের বড় দিদির স্কুল থেকে বাড়া ফিরতে দেরী হতো। ছেলেটি প্রায়ই দিদিকে বলত, তার একা একা থাকতে ভাল লাগে না। মাঝেমাঝেই সে খুব বিমর্ষ হয়ে থাকত। মা-বাবার সাথেও খুবই কম কথা বলত। দিনের পর দিন এরূপ চলতে থাকে। অবশেষে একদিন সে স্কুল থেকে ফিরে চুপিচুপি নিজের জীবনের ছেদ টেনে দিল।

আত্মহত্যা (Suicide): কিশোর বয়সের কোনও কোনও মানসিক রোগের সাথে আত্মহত্যা করার ইচ্ছা বা প্রচেষ্টা অন্যতম উপসর্গ রূপে দেখা দেয়। বিশেষ করে কোনও রোগের মধ্যে যদি বিমর্ষতার প্রাধান্য থাকে তাহলে আত্মহত্যার উপসর্গটিও দেখা দিতে পারে। হিস্টিরিয়ার সাথেও এরূপ প্রচেষ্টা দেখা যায়।

খবরের কাগজে আজকাল প্রায়ই কিশোর-কিশোরীদের আত্মহত্যার সংবাদ দেখা যায়। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে অথবা আশানুরূপ ফল না পেয়ে অনেক ছেলে-মেয়ে আত্মহত্যা করে। এর পিছনে নিজের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা, অতি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, নিজের মূল্য নষ্ট

হয়ে গেল—এরূপ ধারণা এবং অনেক সময় মা-বাবার বা পরিচিতদের প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারার ধারণা প্রভৃতি কাজ করে। একটি শিশুর ক্ষমতা কতটুকু, তার কাছ থেকে কতটা প্রত্যাশা করা যায় তা মা-বাবাকে বুঝতে হবে এবং তার সাথে অনুরূপ ব্যবহার করতে হবে। শিশুরা যে নিজের সম্বন্ধে ভুল ধারণা বা ভাব-মূর্ত্তি (image) গড়ে তোলে তার জন্য প্রধানতঃ বড়রাই দায়ী। লক্ষ্য রাখতে হবে শিশুরা যেন বাস্তব বোধ সম্পন্ন হয়।

কিশোর-কিশোরীরা স্বভাবতই ভাব প্রবণ হয়। তারা অনেক সময় অবাস্তব কল্পনার জগতে বাস করে। এই সময়ের অবাস্তব কাল্পনিক প্রেমে ব্যর্থতার জন্যও অনেক কিশোর-কিশোরী আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

হতাশাগ্রস্ত কিশোর-কিশোরীর মানসিক সমস্যায় মা-বাবাকে বাস্তবোচিত দৃষ্টি-ভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে। তাকে অযথা বকাঝকা করলে সে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং হতাশায় ডুবে যাবে। মা-বাবাকে তার সমস্যার অংশীদার হতে হবে ; তবেই সে তার হারান আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে। পড়াশুনা বা অন্য ব্যাপারে তার উপর যেন অহেতুক চাপ সৃষ্টি করা না হয়।

ঃ প্রধানতঃ জন্মগত অস্বভাবিতা ঃ

মানসিক মন্দন বা জড় বুদ্ধি (Mental Retardation) : অনেক সময় কোনও কোনও শিশুকে তার সমবয়সী অপরাপর শিশুদের থেকে বুদ্ধির ব্যাপারে এবং শারীরিক ক্ষমতায় পিছিয়ে রয়েছে দেখা যায়। এই সকল শিশুদের মধ্যে যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক বা আই. কিউ (I.Q. = Intelligent Quotient) ৬৮ থেকে ৮৩-এর মধ্যে তারা জড় বুদ্ধি ও স্বাভাবিক বুদ্ধির সীমা-রেখায় অবস্থান করছে। যাদেরআই. কিউ. ৫২ থেকে ৬৭-এর মধ্যে তারা অল্প জড় বুদ্ধি সম্পন্ন। যাদের ২৬ থেকে ৩৫-এর মধ্যে তারা অত্যধিক এবং যাদের আই. কিউ. ২০-এর নিচে তারা অতি-অত্যধিক জড় বুদ্ধি সম্পন্ন শিশু। এই জড়বুদ্ধি

সম্পন্নরা নিজের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলিও ঠিক ভাবে করতে পারে না। কাজেই এদের সব সময় অপরের উপর নির্ভরশীল হয়ে বাঁচতে হয়। মঙ্গোলত্ব সম্পন্ন (Mongolism) বা মঙ্গোল চেহারার শিশুরা অতি-অত্যধিক জড় বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

জড় বুদ্ধি সম্বন্ধে পূর্বে ধারণা ছিল যে সর্ব ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ ভাবে ভ্রূণের গঠনগত ত্রুটি বা ক্রোমোসোম্ (Chromosome) ঘটিত ত্রুটির জন্যই এরূপ ঘটে থাকে। কিন্তু পরবর্তী কালে অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে কোনও কোনও মস্তিষ্কের (Brain) রোগ ও জীবাণু ঘটিত রোগের জন্যও এরূপ হতে পারে। এ ছাড়া প্রসবের সময় কোনও ত্রুটি, যেমন শিশুর মস্তিষ্কে ফরসেপের (Forceps) আঘাত, গর্ভাবস্থায় মায়ের কঠিন রোগ বা অপুষ্টি, মাদক দ্রব্য সেবন, ভ্রূণের পক্ষে ক্ষতিকর ওষুধ সেবন (বিভিন্ন ঘুমের ওষুধ, মাথাধরার ওষুধ ইত্যাদি), অত্যধিক উত্তেজনা ও শরীরের আঘাত প্রভৃতিও জড় বুদ্ধির কারণ রূপে দেখা দিতে পারে। শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশের অভাবের জন্য ও শিশুর অপুষ্টির জন্যও শিশু জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হতে পারে। বর্তমান পৃথিবীতে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য পরীক্ষা মূলক ভাবে আণবিক অস্ত্র বিস্ফোরণের ফলে আবহাওয়ায় তেজস্ক্রিয়তা বৃদ্ধির ফলে গর্ভস্থ বা নবজাত শিশুর ক্ষতি হতে পারে এবং তার জন্য শিশুর মধ্যে বুদ্ধির জড়তা দেখা দিতে পারে। তাই বুদ্ধির জড়তা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য বিভিন্ন শারীরিক, সামাজিক ও মানসিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা দরকার। অল্প জড় বুদ্ধি সম্পন্নদের বুদ্ধির পরিমাণ বাড়ান না গেলেও নানা রকমের শিক্ষণের (Training) মধ্য দিয়ে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলা যেতে পারে। আজকাল এই সকল শিশুদের জন্য বিশেষ ধরণের বিদ্যালয় ও শিক্ষাদান পদ্ধতিরও প্রবর্তন হয়েছে।

প্রধানতঃ শারীরিক কারণজাত অস্বভাবিতা

সুস্থভাবে জন্মগ্রহণ করার পরেও নানা শারীরিক কারণে একটি

শিশু মানসিক দিক থেকে অস্বাভাবিক বা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। শিশু বয়সে অত্যধিক শারীরিক রোগে ভুগলে একটি শিশু স্বভাবতই খিট্‌খিটে মেজাজের হয়ে পড়বে। তা ছাড়া সে নানা ব্যাপারে সমবয়সীদের থেকে পিছিয়ে পড়ার জন্য তার মনে একটা হীনমন্যতা বোধ দেখা দিতে পারে; ফলে তার আচরণে বা ব্যক্তিত্বে নানা ত্রুটি ফুটে উঠতে পারে। এ ছাড়া শরীর গঠনের ত্রুটি, সুষ্ঠু শারীরিক বিকাশে বাধা, এবং বিশেষ বিশেষ শারীরিক রোগের জন্য গ্রন্থির (Gland), মস্তিষ্কের (Brain) ও স্নায়ু-তন্ত্রের (Nervous System) কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্যও একটি শিশুর মানসিক রোগ দেখা দিতে পারে। এই জাতীয় মানসিক অস্বভাবিতা প্রতিকারের জন্য শারীরিক ও মানসিক, উভয় প্রকার চিকিৎসাই পাশাপাশি চালাতে হবে।

চিকিৎসা বা প্রতিকার

আদিম কাল থেকেই মানুষ রোগ বা অসুস্থতার সাথে সংগ্রাম করে আসছে। তাই অসুস্থতার সাথে সাথে তার প্রতিকার বা চিকিৎসা ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছে। মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির ফলে ক্রমেই চিকিৎসা ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন ঘটেছে। মানসিক রোগের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। এক কালে যে চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল মন্ত্র-তন্ত্র ঝাড়-ফুঁক তাগা-তাবিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা এখন একটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবস্থার রূপ নিয়েছে।

মানসিক রোগের চিকিৎসা ও শারীরিক রোগের চিকিৎসার মধ্যে কিছুটা মৌলিক প্রভেদ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। রোগ যখন মানসিক তখন তার চিকিৎসা ব্যবস্থায় মানসিক পদ্ধতির (Psychological Methods) স্থান মুখ্য হবে এটাই বিজ্ঞান সম্মত। আবার দেহ ও মনে নিবিড় যোগাযোগ থাকায় চিকিৎসা ব্যবস্থায় ওষুধের স্থান রয়েছে। দেহে প্রযুক্ত ওষুধ দেহ-যন্ত্রের মধ্য দিয়ে মনের উপর কাজ করে। তাই মানসিক অস্বভাবিতার চিকিৎসা ব্যবস্থাকে প্রধানতঃ দু' ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) শরীরগত চিকিৎসা (Biological Treatment) ও (২) মানসিক চিকিৎসা (Psychological Treatment বা Psychotherapy)।

শরীরগত চিকিৎসা ঃ এই চিকিৎসা ব্যবস্থা ওষুধ এবং বিদ্যুৎ সহযোগে (Chemotherapy এবং Electrotherapy) করা হয়। আজকাল ভেষজ-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মনের অস্থিরতা উপশমকারী (Tranquilizer) এবং বিমর্ষতা দূরকারী (Antidepressant) অনেক ওষুধের আবিষ্কার হয়েছে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শমত কোনও কোনও রোগের ক্ষেত্রে এই সকল ওষুধ প্রয়োগে বিশেষ সুফল পাওয়া গেছে; যেমন শিশুদের অতি-চঞ্চলতা, অত্যধিক রাগ, বিমর্ষতা, হিস্টিরিয়া, নানাধরণের ফিট্ ইত্যাদি।

বিদ্যুৎ সহযোগে চিকিৎসায় বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎ প্রবাহের দ্বারা মস্তিষ্কের স্নায়ু-তন্ত্রে আঘাত করা হয়। একেই বিজলী চিকিৎসা বা Electric treatment বলে। প্রয়োগ অনুযায়ী একে ইংরেজীতে Electroshock Therapy (EST) এবং Electroconvulsive Therapy (ECT) বলা হয়। প্রথমটির সাহায্যে বিদ্যুৎ তরঙ্গের দ্বারা রোগীর শরীরে ব্যথার সঞ্চার করা হয়; এবং দ্বিতীয়টির সাহায্যে শরীরে কৃত্রিম ভাবে খিচুনির (convulsion) সৃষ্টি করা হয়। দ্বিতীয়টিতে রোগী অচৈতন্য হয়ে পড়ে। এর ফলে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। তবে চিকিৎসকগণ শিশুদের ক্ষেত্রে বিজলী চিকিৎসা যথাসম্ভব পরিহার করে থাকেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে বিশেষ প্রয়োজন না হলে এই চিকিৎসা শিশুদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিৎ নয়।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যুৎ তরঙ্গের সাহায্যে রোগীকে ঘুম পাড়িয়ে এক প্রকারের চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে। একে বিজলী-ঘুম চিকিৎসা বা Electrosleep Therapy বলে। এর ফলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে উপকার পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে। তবে এই চিকিৎসার এখনও তেমন প্রসার ঘটে নি।

পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, মনের বিভিন্ন অবস্থায় মস্তিষ্ক (Brain) থেকে নানা দৈর্ঘ্যের ও ছন্দের বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে রোগীকে তার মস্তিষ্কের বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের শিক্ষণ (training) দিয়ে মনের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়। এই ব্যবস্থাকে মস্তিষ্ক-তরঙ্গ চিকিৎসা (Brain-wave Therapy) বলা হয়। তবে বলাবাহুল্য এসকল চিকিৎসা ব্যবস্থা এখনও গবেষণাগারে পরীক্ষণ (Experiment) পর্যায়ে রয়েছে।

মানসিক চিকিৎসা বা সাইকোথেরাপি ঃ চল্‌তি কথা আছে—"শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না," কিন্তু দেখা গেছে কথায় মনের রোগ সারে। যে চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্যে চিকিৎসক রোগীর সাথে এক বিশেষ

ধররেন সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে তার মনের উপর প্রভাব বিস্তারের মারফত রোগ লক্ষণসমূহ দূর করতে সাহায্য করে তাকেই মানসিক চিকিৎসা বলা যেতে পারে। চিকিৎসক-রোগীর সম্পর্কই এই চিকিৎসার মূল ভিত্তি। এই সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম হ'লো একান্ত ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলা। কেবল মাত্র কথা বলার মধ্য দিয়েই রোগী তার জটিল মানসিক দ্বন্দ্ব সমূহ প্রকাশ করতে পেরে অনেক স্বস্তিবোধ করে। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের সহায়তায় বর্তমানে এই পদ্ধতি একটি সুসংবদ্ধ বিজ্ঞান রূপে গড়ে উঠেছে। এই কারণেই ফ্রয়েডের (Freud) নামের সাথে এই পদ্ধতির এত যোগাযোগ। এই পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য হ'লো রোগীর মনের দ্বন্দ্ব সমূহের উপশম ঘটিয়ে তার বাস্তববোধকে সুদৃঢ় করা। বাস্তব বোধ গড়ে ওঠার ফলে রোগীর মানসিক যন্ত্রণারও উপশম হয়।

এখানে একটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সোভিয়েট শরীরতত্ত্ববিদ্ ও মনোবিজ্ঞানী পাভ্‌লভ্ (I. P. Pavlov) মানসিক রোগের যে চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন তাতেও মানসিক চিকিৎসা বা সাইকোথেরাপির মুখ্য ভূমিকার কথা স্বীকার করা হয়েছে, বিশেষ করে শিশুদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে। সোভিয়েট চিকিৎসক পর্‌ট্‌নভ্ এবং ফেডোটভ্ (A. A. Portnov & D. D. Fedotov)-এর মতে "The psychic factor can be utilized both for treatment and for the prophylaxis of various illnesses."

"In the broad sense psychotherapy is a scientific system of doctor-patient relations. It consists of a complex of various measures, which include hypnotism, treatment by suggestion in a waking state, influencing the patient's personality, cultivating in him a sound attitude to his family and

to his social relations in general." বিজ্ঞানী পাভ্লভ্ সাইকোথেরাপির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "A word, because of the whole earlier life of an adult, is associated with all the external and internal stimuli reaching the cerebrum; it is a signal and a substitute for all of them, and therefore can evoke any action or reaction in the organism that is conditioned by these stimuli."

যাই হোক, মানসিক রোগে সাইকোথেরাপির উপযোগিতা সম্বন্ধে সকলেই একমত। তবে এর প্রয়োগ পদ্ধতি ও কার্যকারিতার যৌক্তিকতা (Rationale) বিচারে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বিজ্ঞানীরা এই বিচারে নিযুক্ত থাকুন এবং বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটান; রোগীর কাছে রোগ উপশমই বড় কথা, তা চিকিৎসা পদ্ধতির পেছনে যে যৌক্তিকতাই দাঁড় করান হোক না কেন।

এই মানসিক চিকিৎসা বা সাইকোথেরাপি অনেক রকমের হতে পারে। যেমন:

(১) শিশুর সচেতন মনকে আশ্বাস, উপদেশ, নির্দেশ, বাস্তব পরামর্শ প্রভৃতির দ্বারা সুদৃঢ় করা হয়। এই পদ্ধতিকে কিছু কিছু তারতম্য অনুযায়ী নির্দেশ (Guidance), পরামর্শ দান (Counselling) এবং অভিভাবন (Suggestion) বলা হয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞরা এই সকল পদ্ধতি বিজ্ঞান সম্মতভাবে প্রয়োগ করে থাকেন। ফলে দ্রুত ফল লাভ করা যায়।

(২) সংবেশন (Hypnotism) পদ্ধতির দ্বারাও অনেক সময় মানসিক অস্বভাবিতার চিকিৎসা করা হয়। তবে গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে এই পদ্ধতির দ্বারা রোগের সাময়িক উপশম হয়, স্থায়ী আরোগ্য হয় না। এবং এর আরও নানা ত্রুটি রয়েছে। উপরন্তু এই পদ্ধতি সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবং কার্যকরী হয় না। তাই বর্তমানে এই পদ্ধতি বিশেষ ব্যবহৃত হয় না।

(৩) খেলা-ধুলা, ছবি আঁকা, নাটক করা, গান প্রভৃতির মারফত শিশুর চিন্তা ও আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে অস্বভাবিতার উপশম ঘটান হয়। এই পদ্ধতিকে বহিঃপ্রকাশ মূলক চিকিৎসা (Expressive Therapy) বলা হয়।

(৪) মনঃসমীক্ষাই (Psychoanalysis) মানসিক রোগের বা অস্বভাবিতার যথাযথ চিকিৎসা। মনোবিজ্ঞানী, শরীরতত্ত্ববিদ্ ও চিকিৎসক সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud) এই পদ্ধতির আবিষ্কারক। এই পদ্ধতি সাধারণতঃ দীর্ঘমেয়াদী হয়ে থাকে। তবে এই পদ্ধতির মূল কাঠামো এবং সূত্রগুলির উপর ভিত্তি করে অনেকে স্বল্পকালীন মনঃসমীক্ষা মূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করছেন।

মনঃসমীক্ষার সাহায্যে রোগীর অবচেতন মনের অবদমিত স্মৃতি, ইচ্ছা, দ্বন্দ্ব এবং আবেগ সমূহের উদঘাটনের মধ্য দিয়ে মনের রাজ্যে মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলির একটা পুনর্বিন্যাস করা হয়। ফলে রোগীর বাস্তব বোধ ও অন্তর্দৃষ্টি গড়ে ওঠে ও রোগ লক্ষণ সমূহ দূর হয়। বহির্জগতের প্রতি রোগীর দৃষ্টি ভঙ্গীর একটা পরিবর্তন আসে। তাই বলা চলে এই চিকিৎসার ফলে রোগীর মানসিক অবক্ষয় রোধ হয় এবং তার ব্যক্তিত্ব নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সুসংহত রূপ ধারণ করে। আবার এই পদ্ধতির সাহায্যেই মানসিক অস্বভাবিতার প্রকৃত রূপটি ঠিক ভাবে বোঝা সম্ভব হয়। নানা গবেষণার ফলে মনঃসমীক্ষা পদ্ধতির ক্রমোন্নতি ঘটছে; ফলে এই পদ্ধতি ক্রমেই অধিকতর ফলপ্রসূ হয়ে উঠছে। মানসিক রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলার এটাই প্রকৃত পদ্ধতি। বিশেষ করে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা অতুলনীয়।

মনঃসমীক্ষার সাহায্যে রোগ প্রতিষেধও সম্ভব। শিশুদের মধ্যে ব্যবহারে সামান্য অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করলেই এই চিকিৎসার সাহায্যে বড় রকমের বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব। এমন কি যে-কোনও স্বাভাবিক শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য মনঃসমীক্ষার সাহায্যে আরও উন্নত করে

তোলা সম্ভব। নানা রকমের শারীরিক ব্যায়ামের মত এটি একটি মানসিক ব্যায়াম যার সাহায্যে মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত করা যায়। তাই আজকাল এটিকে সুস্থ মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের কাজেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে মনে রাখতে হবে এই পদ্ধতির প্রয়োগ এই বিজ্ঞানে শিক্ষণ প্রাপ্ত (Trained) চিকিৎসকের দ্বারাই সম্ভব। অনেক চিকিৎসক উপযুক্ত শিক্ষণ ব্যতীতই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকেন। এর অনেক কুফল দেখা গেছে।

ভারতবর্ষে ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি (Indian Psychoanalytical Society) এই পদ্ধতি ও বিজ্ঞানের শিক্ষা দান কাজে নিযুক্ত আছে। এই সংস্থাটি আন্তর্জাতিক মনঃসমীক্ষা সংঘের (International Psychoanalytical Association) সাথে সংযুক্ত।

(৫) আচরণ বা চেষ্টিত চিকিৎসা (Behaviour Therapy) পদ্ধতির দ্বারাও মানসিক অস্বভাবিতার কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভাল ফল পাওয়া গেছে। এই পদ্ধতির সাহায্যে কৃত্রিম ভাবে সৃষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার মধ্য দিয়ে রোগীর মনোবল ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়।

উপরের এই সকল চিকিৎসা পদ্ধতি সমূহ ছাড়া আজকাল আমাদের দেশেও পাভ্‌লভীয় (Pavlovian) এবং গেস্টলট্ (Gestalt) সাইকোথেরাপি নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

মানসিক চিকিৎসা বা সাইকোথেরাপি আজকাল দলগত ভাবেও, অর্থাৎ একসঙ্গে কয়েকজন রোগীকে, প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এর প্রচলন দেখা যায়। একে দলগত মানসিক চিকিৎসা বা Group Psychotherapy বলা হয়। সাধারণ অস্বভাবিতায় এতেও ভাল ফল পাওয়া গেছে।

তবে মনে রাখতে হবে, মানসিক রোগের উপযুক্ত এবং প্রকৃত চিকিৎসা মনঃসমীক্ষা (Psychoanalysis)। সময় সাপেক্ষ হলেও এই পদ্ধতির সাহায্যেই রোগীকে সম্পূর্ণ রোগ মুক্ত করা যায়।

শিশু পরিচর্যার দৃষ্টিভঙ্গী

এই সৃষ্ট জগৎ পরম সত্তারই বিকাশমাত্র। তাই আমাদের অভিজ্ঞতার জগতের প্রতিটি বস্তু ও জীবই সেই পরম ব্রহ্মের অংশ-স্বরূপ। বিভিন্ন যুগের ভারতীয় ঋষিগণ এই সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার জগতের মধ্যে পরম সত্যের আস্বাদ করেছেন; খণ্ড সৃষ্টির মধ্যে অখণ্ড ও সীমাহীন সত্যকে অনুভব করেছেন। তাই তাঁরা মানুষের মধ্যে দেখেছেন চিরন্তন সত্যের প্রতিচ্ছবি। ভারতের একদল সাধক মানুষের জীবনের দৈনন্দিন প্রেম-ভালবাসার মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতিই অনুভব করেছেন। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর ভালবাসা, প্রেমিক-প্রেমিকার ভালবাসা, প্রভু-ভৃত্যের ভালবাসা বা সন্তানের প্রতি মাতাপিতার ভালবাসা যাই হোক না কেন, ভালবাসার প্রতিটি রূপের মধ্যেই তাঁরা দেবতাকে আরোপ করেছেন। অথবা বলা যায় যে তাঁরা প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে, সখা বা সখীর মধ্যে, শিশু সন্তানের মধ্যে দেবতাকে দেখেছেন। এই যে ভালবাসার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে জগৎকে দেখা, যে ভালবাসা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গীভূত, তা ভারতীয় সাধনার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বর দূরের বস্তু নয়। সাধারণ পার্থিব ভালবাসা দিয়েই তাঁকে অনুভব করা যায়। কারণ এ ভালবাসা তো দৈব ভালবাসারই প্রতিচ্ছবি।

মা-বাবা তাঁদের শিশুসন্তানকে ভালবেসে আত্মহারা হন। শিশুও মা-বাবার স্নেহের জন্য লালায়িত। এই ভালবাসাও পরম প্রেমিকেরই এক অভিব্যক্তি। তাই ব্রজের এক শিশুর প্রতি এক মাতাপিতার ভালবাসা বৈষ্ণব কবিদের কবিতার বিষয়বস্তু হয়েছিল। ঈশ্বরের প্রতি বাৎসল্যরতির প্রবাহের যে চিত্র বৈষ্ণব-কবিদের গানে ফুটে উঠেছে তার মধ্যে আমরা শিশুর প্রতি একটি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই। স্বয়ং ঈশ্বর মানবশিশুরূপে সাধারণ মানুষের গৃহে অবতীর্ণ। মানবশিশু ঈশ্বরেরই অংশস্বরূপ। কিন্তু তার প্রতি ঈশ্বরত্ব আরোপের

মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব কবিগণ তাকে দূরের বা সম্ভ্রমের বস্তু করে রাখেন নি। এই দেবশিশু বাৎসল্যরতির সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত। সে একান্তই নিজের। তার সাথে কোন মানসিক ব্যবধান নেই। কিন্তু এই বাৎসল্যরতি, দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্যের জন্য আবার দুটি ধারায় প্রবাহিত হতে পারে। বৈষ্ণব কবিগণ ব্রজে বালক-কৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্যরতির দুটি ধারার পাশাপাশি প্রকাশভঙ্গীর মধ্য দিয়ে তাঁদের বক্তব্যটি পরিস্ফুট করেছেন।

বাৎসল্যরতির দুটি ধারা। একটি ভয় ভাবনা ও ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মিশ্রিত এবং অপরটি অবিমিশ্র। বালক কৃষ্ণকে দেবকী ও বসুদেব ভালবাসেন ; কিন্তু এই ভালবাসার মধ্যে সংকোচ, ভয়, সম্ভ্রম, মহত্বজ্ঞান, ঐশ্বর্য্যবোধ প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করছে। কৃষ্ণের প্রতি বসুদেব ও দেবকীর ঈশ্বরজ্ঞান বাৎসল্যরতির স্নেহরস দ্বারা সম্পূর্ণ সহজ হয়ে ওঠে নি। কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে তাঁরা বিমোহিত। এইজন্য তাঁদের হৃদয়ে অবিমিশ্র বা কেবল বাৎসল্যরতির উন্মেষ সম্ভব হয় নি। কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতে এই অবস্থাটি একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন। কংসবধের পর কৃষ্ণ দেবকী ও বসুদেবের সাথে সাক্ষাৎ করলে তাঁদের মনে একটি ভয়মিশ্রিত ভালবাসার ভাবের আবির্ভাব ঘটেছিল।—

বসুদেব দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে দুয়ের মনে ভয় হৈল ॥

কিন্তু অপর দিকে কৃষ্ণের প্রতি নন্দ ও যশোদার ভাব অবিমিশ্র বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ। কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে তাঁদের কোন সংকোচ বোধ হয় নি। কথিত আছে যশোমতী কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি তাতে বিমোহিত হন নি। তিনি তখনও কৃষ্ণকে "আমার দুধের ছেলে" বলেই ভেবেছেন। যশোদা ভেবেছিলেন, "এ আবার কি ভেল্কি? এতে আমার গোপালের কিছু অকল্যাণ হবে না তো?" তাই কৃষ্ণও যশোদার আদরের ভিখারী। অন্যদিকে দেবকী এই

বিশ্বরূপ দর্শনে বিমোহিত হয়েছিলেন, বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। কংসবধকারী শৌর্য্য-বীর্য্যের প্রতীক কৃষ্ণকে কিন্তু যশোদা বরাবরই তাঁর আদরের গোপাল হিসাবেই দেখেছেন। বৈষ্ণব কবির ভাষায় এই ভাবটির অপূর্ব অভিব্যক্তি দেখতে পাই—

কোলেতে করিয়া নয়নজলে।
সেচন করিয়া কাঁদিয়া বলে॥
আর দূরদেশে না যাবে তুমি।
মরিব তবে এবারে আমি।

ভালবাসার মধ্যে যতক্ষণ অন্য কোন বিবেচনা থাকে, ততক্ষণ সে ভালবাসা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। তখন সেই ভালবাসা স্বার্থপরতা বা আত্মপ্রেমেরই নামান্তরমাত্র। শিশু-সন্তানকে ভাল-বাসতে গিয়ে যদি মা-বাবা মনে করেন আমার ছেলে বা মেয়ে বড় হয়ে বিদ্বান হবে, ডাক্তার হবে, বড় চাকুরে হবে, বড় নেতা হবে, আমাদের দেখবে ইত্যাদি, তাহলে সেই ভালবাসার মধ্যে অন্য বিবেচনা এসে গেল। তা আর অবিমিশ্র বাৎসল্যরতি রইল না। শিশু-সন্তান সেখানে মা-বাবার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায়মাত্র হয়ে দাঁড়াল। এবং কালক্রমে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধিটাই মুখ্য হয়ে দেখা দেয়, শিশুর মঙ্গলামঙ্গল, তার প্রতি ভালবাসা গৌণ হয়ে যায়। এইজন্য অনেক সময় দেখা যায় শিশুর কাজের মধ্য দিয়ে মা-বাবার মনোবাঞ্ছা পূরণ না হলেই তাঁরা ক্রোধে, হতাশায় ভেঙ্গে পড়েন, অপমানিত বোধ করেন। এসব ক্ষেত্রে তাঁরা শিশুকে ব্যবহার করেন তাঁদের ইচ্ছা-পূরণের যন্ত্র হিসাবে। যেমন, শিশু লেখাপড়ায় ভাল হলে মা-বাবার সম্মান বাড়বে। সকলে বলবে, অমুকের ছেলে পড়াশোনায় ভাল। এটা ঠিকই, সকলেই চাইবেন যে তাঁদের শিশুসন্তানটি ভবিষ্যতে ভাল হোক, লেখাপড়ায়, কাজে-কর্মে ভাল হোক। কিন্তু ভাল হওয়ার আশা নিয়ে তাকে ভালবাসব, ভাল না হলে, অক্ষম হলে তাকে ভালবাসব না, এটা ঠিক নয়। শিশুর ক্ষমতা-অক্ষমতার

কথা এসব ক্ষেত্রে বিবেচনাই করা হয় না। এরূপ ভালবাসা মোটেই কেবল বাৎসল্যরতি নয়। এরূপ ভালবাসার মধ্যে ভয় আছে, অপমান বোধ আছে, অহংকার ও সংকোচ আছে। এরূপ ভালবাসা স্বার্থ-পরতারই নামান্তর। এরূপ ভালবাসার দৃষ্টিভঙ্গী শিশুর পক্ষে একেবারেই হিতকর নয় এবং এরূপ ভালবাসার আবহাওয়ায় শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশও সম্ভব নয়। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে শিশুও বুঝে নেয় মা-বাবার সাথে তার সম্পর্কের ব্যবধান। সে সহজ ভাবটি হারিয়ে ফেলে। তাই যশোদার সাথে বালক কৃষ্ণের যে সহজ সম্পর্ক, দেবকীর সাথে তা নেই। এক বৈষ্ণব কবি তাঁর কবিতায় যশোদার এই স্নেহময় সহজ ভাবটি সরসভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—

নব ঘন রূপ তাহাতে স্বরূপ
আঙ্গিনা করিয়া আলা।
কর পদ নাড়ি গোলক ঈশ্বর
করেন আনন্দে খেলা॥
খেনে গৃহকর্ম্ম করে নন্দরাণী
খেনেক দেখয়ে মুখ।
পুত্রমুখ হেরি যশোদা সুন্দরী
বাড়য়ে মনের সুখ॥ (দীন চণ্ডীদাস)।

কিন্তু জন্মের পরে তার শরীর-লক্ষণ দেখে তাকে ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে তার প্রতি দেবকীর যে ভয় মিশ্রিত ভালবাসা, তার মধ্যে আমরা অবিমিশ্র বাৎসল্যরস দেখতে পাই না। বৈষ্ণব কবি বলেছেন—

মধুর মূরতি দেখিঞা দৈবকী
তটস্থ হইয়ে রয়।
এ জন না হয় মানুষের কায়া
আপনি হিয়াতে কয়।

*　　*　　*

দৈবকী দেখিয়া বসুদেব কহে
শুন্যাহি পুরাণ কথা।
যেই নারায়ণ পরম কারণ
তেঁহো সে দেবের ধাতা॥

(দীন চণ্ডীদাস)

যশোদা কৃষ্ণকে ভালবাসেন তাঁর আদরের শিশুরূপেই। তাকে সোহাগ করেন, তাড়না করেন। কৃষ্ণও তাই তাঁর সোহাগের কাঙ্গাল, তাঁর তাড়না সহ্য করেন ও মায়ের উপর আবদার-অত্যাচার করেন। গোপাল যশোদার চিরকালের দুধের ছেলে। তাই তিনি গোপালকে শাসন করেন, আবদার সহ্য করেন। গোপাল ঈশ্বরের অবতার, এ বোধ যশোদার নেই। "যশোমতী যেমন গোপালকে খাওয়াইয়া, পরাইয়া, নাচাইয়া, খেলাইয়া সুখিনী—গোপালও তেমনি খাইয়া, পরিয়া, নাচিয়া, খেলিয়া মায়ের আনন্দবর্ধনে তৎপর" (জিতেন্দ্রলাল বসু ; সমালোচনা-সংগ্রহ ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; ১৯৬০)। বৈষ্ণব কবিগণ মাতৃহৃদয়ের এই সহজ ভাবটি তাঁদের বিভিন্ন কবিতায় সহজ-ভাবে ব্যক্ত করেছেন। আমার শিশুকে, শিশু বলেই ভালবাসি। সে ভবিষ্যতে বড় হবে, বৈজ্ঞানিক হবে, নেতা হবে—এ সকলের কল্পনায় তার প্রতি ভালবাসা উদ্দীপিত নয়। তাকে ভালবেসেই আনন্দ। তার সুখেই সুখ, তার মঙ্গলেই মঙ্গল। যশোদার ভালবাসার মধ্যে এই ভাবটিই ফুটে উঠেছে। সন্তানের প্রতি মায়ের এরূপ ভালবাসার মধ্যেই বোধহয় ভগবানের প্রেমময়রূপটি সম্পূর্ণভাবে বিকশিত। তাই বৈষ্ণব কবিগণ এই বাৎসল্যরতিকেই ঈশ্বর সাধনার একটি উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

আধুনিক জগতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উন্নতির সাথে সাথে মনোবিজ্ঞানেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। মনোবিজ্ঞান আজ অতি সুনির্দিষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছে যে শিশুর জীবনে মা ও বাবার অনাবিল

ভালবাসা কত প্রয়োজন। কিন্তু এই ভালবাসা দিতে গেলে প্রতিটি মানুষেরই একটি দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠা দরকার। কারণ এরূপ ভালবাসা দেওয়ার কাজটি বড় সহজ নয়। শিশুর প্রতি বড়দের দৃষ্টিভঙ্গীর উপরই নির্ভর করছে শিশুর ভবিষ্যৎ। জীবই শিব, তাই শিশুও পরম সত্তার অংশস্বরূপ। তাই শিশুর মধ্যে যেমন একদিকে পরম প্রেমিকের বিকাশ অনুভব করতে হবে, তেমনি অপর দিকে শিশুর ভালবাসাটি হওয়া চাই সহজ ও অনাবিল। এটি হবে বাৎসল্যরতি। শিশুর মধ্যে দেবত্বের বিকাশ দেখে তার দ্বারা বিমোহিত ও সংকুচিত হলে এই সহজ ভাবটি আসবে না। তাই যশোদার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই যদি আমরা প্রতিটি শিশুকে দেখতে পারি, তবেই শিশুর প্রতি আমাদের ভালবাসা সার্থক হবে। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে বিস্তর বৈষয়িক উন্নতি সাধিত হয়েছে। শিশুর বিকাশধারা সম্বন্ধেও আমরা যথেষ্ট জ্ঞান আহরণ করেছি। কিন্তু শিশুর উন্নতি-সাধনের সকল পরিকল্পনাই ব্যর্থ হবে, যদি না আমরা একটি সার্থক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে পারি। তাই কেবল বাৎসল্যরতির বা যশোদার দৃষ্টিভঙ্গীর অন্তর্নিহিত ভাবটিই হোক শিশুদের প্রতি আমাদের অন্তরের ভাব।

ঃ সহায়ক পুস্তক সমূহ ঃ

1. Sigmund Freud : The Ego and the Id.
2. " " : Introductory Lectures on Psychoanalysis
3. " " : New Introductory Lectures on Psychoanalysis.
4. Dictionary of Philosophy and Psychology, vol. I Ed. : James Mark Baldwin.
5. A Dictionary of Psychology : James Drever
6. Encyclopedia of Psychoanalysis-Pub : The Free press.
7. Margaret Mead : Anthropology—A Human Science.
8. Susan Isaacs : Intellectual Growth In young children.
9. John Bowlby : WHO : Deprivation of Maternal care
10. " " : Maternal care and Mental Health.
11. " " : Child care and the Growth of Love
12. Burlingham and A. Freud : Infants without Families
13. A. T. Jersild : Child Psychology
14. Comprehensive Text Book of Psychiatry ; Ed. : Freedman and Kaplan,
15. Lowie : Primitive Society.

16. Malinowaski : Sex and Repression in Savage Society.
17. Hadfield : Psychology and Mental Health.
18. Susan Isaacs ; Fatherless Children.
19. Akhilananda : Mental Health and Hindu Psychology.
20. M. B. Hall : Psychiatric Examination of the School Children.
21. Manual of Child Psychology— Ed : L. Carmichael
22. Abnormal Psychology and Modern Life— Ed : Coleman and Broen (Jr.)
23. Portnov and Fedotov : Psychiatry
24. Batchelor : Handerson and Gillespie's Text Book of Psychiatry.
25. Bowlby : Attachment and Loss, Vol. I
26. Platonov : The Word as a Physiological and Therapeutic.
27. Human Development : Ed. ; Ira J. Gordon
28. Ruch : Psychology and Life.
29 Lewis : Deprived Children.
30. Pavlov : Selected Works.
31. Otto Feniehel : The Psychoanalytic Theory of Neurosis.

———

ঃ সংশোধন পত্র ঃ

অসাবধানতা বশতঃ এই পুস্তকের বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটি ভুল বানান মুদ্রিত হয়েছে। নিচে এগুলির শুদ্ধ রূপ দেওয়া হল।

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ শব্দ	সংশোধিত শব্দ
৩	মানুষ্যেতর	মনুষ্যেতর
৪	পারিপার্শিক	পারিপার্শ্বিক
১০	মূহুর্ত	মুহূর্ত
৩১	সাস্থনা	সান্ত্বনা
৫২, ৯১, ৯২, ৯৭	শরীরিক	শারীরিক
৬৩	অবিভূত	অভিভূত
৬৩	Truama	Trauma
৬৯	ঘূম	ঘুম
৭১	নিরবিচ্ছিন্ন	নিরবচ্ছিন্ন
৭৬	লক্ষ্মণগুলি	লক্ষণগুলি
৯০	স্বাস্থ্যহানী	স্বাস্থ্যহানি
৯৪	ওতোপ্রতো	ওতপ্রোত
৯৫	পরিমানে	পরিমাণে
৯৬	Authropology	Anthropology
১০৪, ১৪১	উদ্ভুত	উদ্ভূত
১০৫	স্বাস	শ্বাস
১১০	মল-মুত্র, নল-মুত্র	মল-মূত্র
১১৩	পরিস্থিগুতিলিতে	পরিস্থিতিগুলিতে
১১৫	বাড়র	বাড়ীর
১৩৬	অস্ফূট	অস্ফুট
১৪৬	নিস্বার্থ	নিঃস্বার্থ

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ শব্দ	সংশোধিত শব্দ
১৪৮	বাঞ্চনা	বঞ্চনা
১৬১	নিলিপ্ততার	নির্লিপ্ততার
১৬৬	Paugh	Praugh
১৭৬	শৈশবকা	শৈশবকাল
১৮৬	অস্বাবিক	অস্বাভাবিক
২০৩	পরিপক্কতার	পরিপক্কতার
৯৫, ২১৫	পদ্ধতি, পদ্বতি	পদ্ধতি
২১৫	চিবিৎসক	চিকিৎসক
২২৪	Feniehel	Fenichel

এ ছাড়াও কিছু মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে। এজন্য বিশেষ দুঃখিত।

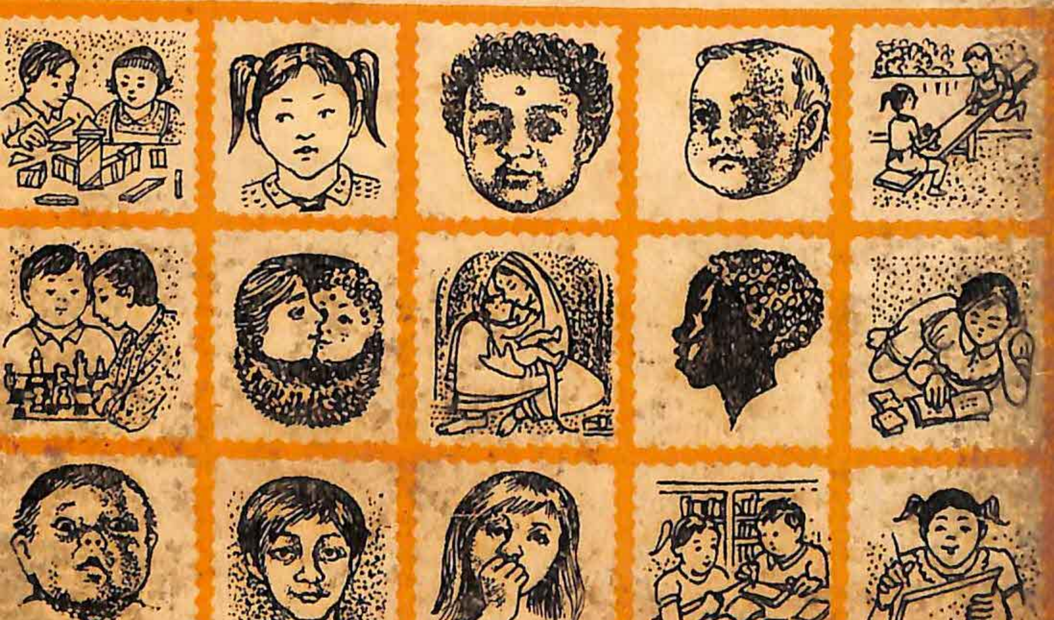
— লেখক।

—০—

আলক্ষ্যদন্তমুকুলাননিমিত্তহাসৈ—
রব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃ প্রবৃত্তীন।
অঙ্কাশ্রয়প্রণয়িন স্তনয়ান্ বহন্তো ধন্যা
স্তদঙ্গরজসা মলিনী ভবন্তি ॥

—কালিদাস ঃঃ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্; ৭।১৭

যাদের দন্তমুকুল অল্প অল্প দেখা যায়, অকারণেই যারা হাসে, অস্পষ্ট বর্ণ উচ্চারণে যারা মধুর কথা বর্ষণ করে, যারা কোলে উঠতে পারলে খুশি হয়, এমন সন্তানদের বহন করে তাদের অঙ্গের ধুলোতে যারা মলিন হয় তারাই ধন্য।



মূল্য কুড়ি টাকা মাত্র।